ক্রান্তদর্শী

ক্রান্তদর্শী

প্রথম পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়

কলকাতা

প্রকাশক :
শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৩৯

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
রুমা প্রিণ্টার্স
৬৩এ/৩, হরিঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

শতরূপা রায়
স্মরণে

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

যার যেথা দেশ

অজ্ঞাতবাস

কলঙ্কবতী

দুঃখমোচন

মর্ত্যের স্বর্গ

অপসরণ

রত্ন ও শ্রীমতী ১/২/৩

বিশল্যকরণী

তৃষ্ণার জল

আগুন নিয়ে খেলা

পুতুল নিয়ে খেলা

না

কন্যা

সুখ

রাজ অতিথি

পাহাড়ী

অসমাপিকা

(ছাপা নেই)

ক্রান্তদর্শী

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়ে মধুমালতীর সঙ্গে আলাপ। সে-ই গাইড হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। মানসকে।

একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে, "বাবা আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আর ফিরে যেতে দেবেন না বলে নতুন এক বন্দিশালা বানিয়েছেন। এখানে আমার মতো আরো কয়েকজন রাজবন্দিনীকে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছেন। আমরা খাটি, খাই, খেলি, গান গাই, সেবা করি। কিন্তু রাজনীতি একদম বারণ। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। কিন্তু কী করি? পাঁচবছর ডেটিনিউ হয়ে থাকার পর এমনিতেই ক্লান্তি এসেছে। তবে যক্ষ্মা নয়। ওটা বাবার ডাক্তার বন্ধুদের ছল।"

ওদিকে ক্যাপটেন মুস্তাফী বলছিলেন যুথিকাকে, "অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! অদৃষ্টের পরিহাস। মেসোপোটেমিয়ায় তুর্কদের হাতে বন্দী হই আমি। আর বাংলাদেশে ইংরেজদের হাতে বন্দী হয় আমার মেয়ে। কৌতুকটা হোম মেম্বরকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি বলেন, আপনি যদি ওর বিয়ে দেন আমরা ওকে বিনা শর্তে মুক্তি দেব। তা শুনে আমার মেয়ে বলে, ওইটেই তো শর্ত। শর্তাধীন মুক্তি আমি চাইনে। ইংরেজকে ও মেয়ে জ্বালিয়েছে, মিসেস মল্লিক। শেষে ওরাই মরীয়া হয়ে ওঠে ওকে ছাড়তে। কিন্তু বিনা শর্তে ছাড়তে ওদেরও তো প্রেস্টিজে বাধে। তা ছাড়া আবার যে ও-রকম কাজ করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এমন সময় একটা সমাধান পাওয়া গেল। যক্ষ্মা। না, সীরিয়াস কিছু নয়। তবু রোগটা ছোঁয়াচে। মেডিকাল বোর্ড সুপারিশ করতে না করতেই বেকসুর খালাস। তার পর আমি ওকে ভাওয়ালিতে পাঠাই। বছর খানেক বাদে এখানে নিয়ে এসে সেবাপ্রতিষ্ঠানের

ভার দিই। একে একে ওর সাথীরাও এসে যোগ দিয়েছে। সরকার আমাকে বিশ্বাস করে। আমিও বিশ্বাস রক্ষা করি।"

"এখন মুশকিলে পড়েছি জুলিকে নিয়ে।" মধুমালতী বলে মানসকে। "ওর ভালো নাম মঞ্জুলিকা সোম। বিয়ের আগে সিন্‌হা। চেনেন বোধ হয়।"

"চিনতুম। দশবছর আগে বিলেতে শেষ দেখা। ওর বর দুলাল ছিল আমার বন্ধু। আহা, বেচারা হঠাৎ মারা যায়। তা জুলি এখন কোথায়? অনেকদিন খোঁজ খবর রাখিনি।" মানস বলে।

"জুলি এখন ওর মায়ের কাছে কলকাতায়। ডেটিনিউ ছিল আমার সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ছাড়া পায় লেডী হ্যারিংটন না কার সুপারিশে। বিলেতে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা করার শর্ত ছিল। বম্বে অবধি গিয়ে থেমে যায়। আপনি কি সৌম্য চৌধুরীকেও চিনতেন?" মধুমালতী সুধায়।

"চিনব না? ও যে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়। ও তো এখন এই শহরেই থাকে।" মানস উত্তর দেয়।

"থাকেন আর কোথায়? মাসের মধ্যে চব্বিশ পঁচিশ দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। চরকা কাটতে দিয়ে কাটুনিদের মজুরি দেন, সুতো থেকে কাপড় বুনিয়ে তাঁতীদের মজুরি দেন, গ্রামে তো কেউ কিনবে না, শহরে এনে ভাণ্ডারে জমা দেন। দেশ সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত কি না তার মাপকাঠি নাকি খদ্দরের চাহিদা। পড়েছেন গান্ধীর পাল্লায়।" মধুমালতী আফসোস করে।

"সেটা তো আজকে নয়। সেই অসহযোগের আমল থেকে। বিলেতেও ওকে খাদি পরতে দেখেছি। তা খাদির চাহিদা কেমন দেখছেন?" প্রশ্ন করে মানস।

"মন্দ নয়। বাবা পরেন, মা পরেন, আমরা সবাই পরি। কিন্তু এই হারে প্রগতি হলে দেশকে স্বাধীন করতে আরো পঞ্চাশ বছর লাগবে।" মধুমালতী হাসে।

"যা বলেছেন।" মানস স্বীকার করে। "কিন্তু জুলির কথা হচ্ছিল।"

"জুলি বম্বে অবধি গিয়েও জাহাজ ধরে না, সৌম্যদার সঙ্গে পুণা যায় ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। উনি তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজীর নির্দেশে হরিজন সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ওঁর প্রভাবে পড়ে জুলি সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে। অথচ গান্ধীবাদ গ্রহণ করে না। ও এখন ওর মায়ের সঙ্গে একটা নার্সারী স্কুল চালায়। এখনো একটা বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্য। ওরা চায় গণ অভ্যুত্থান। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছে। আমার অত বুদ্ধি নেই, মিস্টার মল্লিক, আমি বুঝতে পারিনে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের নৌকায় এক পা রেখে

কেমন করে মার্কস কথিত বিপ্লবের নৌকায় আরেক পা রাখা যায়।" মধুমালতী চিবুকে হাত দেয়।

"ওঃ এই নিয়ে মুশকিল! এটা শুধু জুলিকে নিয়ে কেন, শত শত কর্মীকে নিয়ে। কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বাধীনতা, বিপ্লব নয়। ওদের লক্ষ্য বিপ্লব, ওটাই ওদের মতে স্বাধীনতা। লক্ষ্যে পৌছবার পন্থা নিয়েও তেমনি গভীর মতভেদ। গান্ধীকে ছেড়ে কংগ্রেস একাই একটা কিছু করতে পারে না, অথচ এরা কিনা গান্ধীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসে বিপরীত নেতৃত্ব খাড়া করবে।" মানস বিস্ময়ের সঙ্গে বলে।

"কিন্তু মুশকিলটা তা নিয়ে নয়।" মধুমালতী বলে, "জুলি এখানে আসছে ওদের গোষ্ঠীর বৈঠকে উপস্থিত হতে। উঠতে চায় আমাদের বাড়ীতে। কী করি, বলুন দেখি! ওর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। দু'জনেই যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার ও পরে সিভিল সার্জন। জুলি আর আমি দু'জনেই এক শিবিরে বন্দী হয়েছি। আমি থাকতে ও কি আর কারো বাড়ী উঠতে পারে? ভাবা যায় না, মিস্টার মল্লিক। কিন্তু বাড়ীটা তো আমার নয়, আমার বাবার। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তিনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন, পেনসনের জন্য কেয়ার করেন না। বার বার বদলীর পর আর বদলী হতে চান না, এক জায়গায় বসতে চান বলে তিনি অকালে অবসর নিয়েছেন। এই জায়গাটার উপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে, নইলে তাঁর মতো ডাক্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র তো কলকাতা। সরকারকে যদিও তিনি কথা দেননি তবু সরকার আশা করে যে তিনি তাঁর মেয়েকে সেবাকর্মেই ব্যাপৃত রাখবেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না। আর আমি নিজেও তো ওদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিনে। যতদিন ওরা জাতীয়তাবাদী ছিল ততদিন আমিও ওদের একজন ছিলুম, কিন্তু ওদের বেশির ভাগই এখন সমাজতন্ত্রবাদী, জাতির একটা অঙ্গকেও ওরা উৎখাত করবে, শুধু ইংরেজদের নয়। এমন অবস্থায় জুলিকে আমি ঘরে ঠাঁই দিই কী করে?" মধুমালতী চিন্তাক্লিষ্ট।

মানস এর উত্তর খুঁজে পায় না। বলে, "তা হলে ওকে আমার ওখানেই চালান দিন। তবে তার আগে একবার ওর বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। উনি তো ওকে চোখেও দেখেননি। শুধু নাম শুনেছেন। আর ও-ই বা ওঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানে! জুলি এলে পরে আপনি ওকে আমাদের কথা বলবেন। ও বিপ্লবী নায়িকা। আমাদের ওখানে উঠলে ওর হয়তো জাত যাবে তা সত্ত্বে যদি ও রাজী হয় তবে আমি ওর বৌদিকে বোঝাব।"

"কিন্তু আপনি না উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী?" মধুমালতী অবাক হন। "জুলির জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না?"

"চাকরি আর আমার ভালো লাগছে না, মিস মুস্তাফী। যত বড়োই হোক না কেন, চাকর তো! কিন্তু আমার তো আপনার বাবার মতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস জুটবে না। দোটানায় পড়েছি। তা বলে আমি ভয়ে জড়সড় নই। আমার বন্ধুপত্নী আমার বাড়ীতে উঠলে আমার জাত যাবে না। তবে এটাও ঠিক যে ও তো এখানে বেড়াতে আসছে না, আসছে একটা বৈঠকে অংশ নিতে, তাতে গরম গরম বক্তৃতাও শোনা যাবে। বক্তৃতা যদি রাজদ্রোহের পর্যায়ে পৌছয় মামলা মোকদ্দমাও রুজু হতে পারে। আমিই হতে পারি তার বিচারক। জুলিকে আমি জেলেও পাঠাতে পারি।" মানস বলে শুষ্ক কণ্ঠে।

মধুমালতী চমকে উঠে বলেন, "তাহলে কাজ নেই ওকে আপনার ওখানে চালান দিয়ে। বাবাকে বুঝিয়ে বলব, মাকে বুঝিয়ে বলব। আর ওকেও সচেতন করব। আমি যতদূর জানি ওরা একত্র হচ্ছে যুদ্ধকালে ওদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে যারা চায় তারা কি হিটলারকে জিতিয়ে দিতে চায়? স্টালিনের সঙ্গে হিটলারের একটা চুক্তি হয়েছে বলে হিটলারকে জিতিয়ে দিতে হবে, এটা কি একটা সুযুক্তি? জুলি যেন কখনো অমন কথা মুখে না আনে। শুনলে যেন তীব্র প্রতিবাদ করে।"

মানস জানতে চায় জুলি কি একলা আসছে না তার সঙ্গে কেউ আসছে। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর স্টীমারযাত্রা, স্টীমারে ওঠা নামা কি ও একা ম্যানেজ করতে পারবে? যদি সঙ্গে মালপত্র থাকে।

"ওঃ আপনাকে বলিনি বুঝি!" মধুমালতী এক গাল হাসে। "সহযাত্রী হবেন সুকুমার দত্তবিশ্বাস। উনিই ওর মুশকিল আসান। বিলেতে লেডী হ্যারিংটনের কাছে ধর্না দিয়ে সুপারিশ আদায় করেছিলেন। বিলেতেই বসবাস করেন। মাঝে মাঝে দেশে এসে জুলির আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ান। চেনেন নাকি!"

"বিলক্ষণ। বিলেতে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। দশ বছর দেখা হয়নি। তবে ওর বইয়ের দোকান থেকে বই আনিয়েছি।" মানস স্মরণ করে।

"আমার সঙ্গে আলাপ নেই। তাই ওঁকে আমি বাড়ীতে থাকার আমন্ত্রণ জানাতে পারব না। ওঁকে সৌম্যদার আশ্রমে পাঠাব। কিন্তু তিনি তো বিলিতী খাবারে অভ্যস্ত। পারবেন কি আশ্রমিকদের মতো আকাঁড়া চালের ভাত খেতে? তার সঙ্গে অড়হরের ডাল, খোসাসুদ্ধ আলু সিদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ আর শশার সালাড। নাঃ

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। তিনি আসছেন আমার বান্ধবীর রক্ষী হয়ে। আচ্ছা, সারকিট হাউসে কি কর্তারা অনুমতি দেবেন?" মধুমালতী সুধায়।

"জায়গা থাকলে দিতে পারেন। আমি সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু আমারই তো উচিত দত্তবিশ্বাসকে আমার হাউস গেস্ট করা। মিসেস মল্লিকের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব। কই, উনি গেলেন কোথায়?"

সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে যূথিকা ততক্ষণে ক্যাপ্টেন মুস্তাফীর বাসভবনে মিসেস মুস্তাফীর সঙ্গে চায়ের পেয়ালা হাতে গল্প করছে। মেয়ের জন্যে একটি পাত্র ছাড়া বিধাতার কাছে তাঁর আর কোনো প্রার্থনা নেই। রাজবন্দিনী বলে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বিয়ে করতে কেউ সাহস পায় না। পুলিশ লাগবে পেছনে অথচ সরকার থেকেই বিবাহের প্রস্তাব উঠেছিল।

"বিয়ে করতে কেউ সাহস পায় না? বিপ্লবীরাও না?" অবাক হয় যূথিকা।

"ওমা! তা কখন বললুম! বিপ্লবীদের সাহস আছে বইকি, কিন্তু কোনো মা বাপ কি তাদের একমাত্র মেয়েকে প্রাণ ধরে বিপ্লবীর হাতে তুলে দিতে পারে? কবে কী করে বসবে! ফলে ফাঁসী কি আন্দামান! না, আমিই সাহস পাইনে।" ভদ্রমহিলা কথা ঘুরিয়ে নেন। ভীতির লক্ষণ তাঁর চোখে মুখে।

বলতে বলতে মধুমালতী এসে পড়ে। পিছু পিছু মানস।

"এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, মা? মিস্টার এম. এম. মল্লিক আই. সি. এস।" মধুমালতী পরিচয় করিয়ে দেন।

"বোসো, বাবা। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। এতক্ষণ বৌমার সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করছিলুম। কেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো বৌ পেয়েছ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মিলি, তোর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই, আয়। ওর ভালো নাম মধুমালতী, তা তো দেশের বেবাক লোক জানে। কিন্তু ওর ডাক নাম মিলি। মিলি আর জুলি। ওরা দুই বন্ধু। জুলিকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি। জুলিকে কোথায় রাখি সেই হয়েছে সমস্যা। জুলি আমাদের পর নয়, ওর বাবা ক্যাপ্টেন সিন্হা মিলির বাবার বন্ধু ছিলেন। অকালে মনের দুঃখে মারা যান। যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সে স্বামী নয়, স্বামীজী। সেও মারা যায় অকালে। নিয়তি! নিয়তি! একেই বলে নিয়তি।" ভদ্রমহিলা চা তৈরি করে মানসের দিকে বাড়িয়ে দেন।

ক্যাপ্টেন মুস্তাফী কোথায় ছিলেন, চায়ের আসরে জাঁকিয়ে বসলেন।

"সমস্যা না কী যেন বলছিলে। ওঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলুম। কিসের সমস্যা? মিলি, তোমার মুখেই শুনতে চাই।" তিনি আদেশ করেন।

"শোন, বাবা। জুলি আমার বন্ধু, ও চায় আমার সঙ্গে দু'দিন কাটাতে। আমি যদি কলকাতা যাই আমিও তো চাইব ওর সঙ্গে দু'দিন কাটাতে। কিন্তু ও তো এমনি বেড়াতে আসছে না। আসছে বিপ্লবী গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দিতে। ওদের সঙ্গে আমার মনের মিল নেই। তবু আমাকেও সন্দেহ করা হবে। তার জন্যে তুমিও বিব্রত হবে। মিস্টার মল্লিক নাকি জুলির স্বামীর বন্ধু। তিনি তাঁর স্ত্রীর সম্মতি পেলে জুলিকে তাঁদের ওখানে রাখার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। জুলি তো বিলেতের সেই জুলি নয় যাকে তিনি চিনতেন। সে বন্দীশিরিরে থেকেছে। ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের মুখের উপর বলেছে, তোমরা একদিন আমাদের হৃদয় জয় করেছিলে, তাই তোমাদের জন্য মেসোপোটেমিয়ায় আমাদের ছেলেরা রক্ত দান করেছে। তার পুরস্কার হলো কিনা জালিয়ানওয়ালা বাগ। তোমরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছ। শরীরটা দখল করে কদ্দিন রাখতে পারবে! আবার যদি যুদ্ধ বাধে কেউ কি তোমাদের জন্যে লড়তে যাবে? না একও জওয়ান, না একও রুপেয়া। এইসব কথা উচ্চারণ করেছিল কতকাল আগে। আবার হয়তো করবে তার গোষ্ঠীর বৈঠকে। তখন মল্লিকরা পড়বেন অথৈ জলে।" মধুমালতী বলে যায়।

"কাজ কী ওঁদের ঘাঁটিয়ে। জুলি এই বাড়ীতেই উঠবে। আমি ওর পিতৃবন্ধু। আমিই ওকে শাসিয়ে দেব ওসব যেন মুখে না আনে। যদিও তা আমারও মনের কথা। মা বদ সত্যমপ্রিয়ম্।" ক্যাপ্টেন সমস্যার সমাধান করেন।

"বাবা, তুমি বাঁচালে। নইলে হয়তো বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে যেত। কিন্তু এতই যখন করলে তো বাকীটুকুও করবে কি?" মধুমালতী দত্তবিশ্বাসের জন্য আশ্রয় চায়।

"দত্তবিশ্বাস! কে তিনি। কী তাঁর অভিপ্রায়।" ক্যাপ্টেন সন্দিগ্ধ হন।

"জুলির স্বামীর বন্ধু। জুলিকে বন্দীশিবির থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। লেডী হ্যারিংটনের সেই চিঠি তিনিই বহন করে নিয়ে আসেন।" মধুমালতী মনে করিয়ে দেয়।

"ওঃ! তা হলে তো আমরাও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? দত্তবিশ্বাসও আমাদের এখানেই উঠবেন।" ক্যাপ্টেন স্ত্রীর দিকে তাকান।

মিসেস মুস্তাফী সায় দেন। মধুমালতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"আমি তো ভেবেছিলুম আমার পুরাতন বন্ধুকে আমাদের ওখানেই রাখব।" মানস যূথিকার দিকে তাকায়। "অবশ্য তোমার মত নিয়ে।"

"তা আপনারা ওঁকে সাহেবী খানা খাওয়াবার দায় নিতে পারেন। অন্তত রাতের ডিনারটা।" মধুমালতী অনুরোধ করে।

'খুশি হয়ে।" মানস বলে, "কী বলো, জুঁই ?"

"রাজী। কিন্তু আপনাদেরকেও ডিনারে আসতে হবে।" যুথিকা প্রস্তাব করে।

"আমার ওসব সহ্য হয় না, বাছা।" মিসেস মুস্তাফী বলেন।

"আমি ডায়েটে আছি।" ক্যাপ্টেন ওজর দেখান।

শেষপর্যন্ত এই স্থির হয় যে মধুমালতী তাঁর দুই অতিথিকে নিয়ে মল্লিকদের ওখানে ডিনারে আসবে। যতদিন ওঁরা থাকবেন।

যুথিকা বলে, "আমাদের ডিনার টেবিলে আরো একজনের ঠাঁই হবে। আরো একজন পুরুষের। কাকে ডাকব ?"

মানস উত্তর দেয়, "সৌম্যদাকে। ও যদি শহরে থাকে। দশবছর বাদে আমরা চারজন একত্র হব। সৌম্যদা আর আমি, জুলি আর দত্তবিশ্বাস।"

"মিসেস মল্লিক," মধুমালতী বলে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে, "পারেন তো কিছু আঁকাড়া চাল, অড়হর ডাল, পালং শাক আর রসুন জোগাড় করে রাখুন। একজনকে সাহেবী খানা খাওয়াতে গিয়ে আরেকজনকে অভুক্ত রাখবেন না। আমার কথা যদি বলেন, আপনারা যা খান আমিও তাই খাব।"

"আমরা আজকাল নিরামিষ খাই, মিস মুস্তাফী। মাছমাংস ছেড়ে দিয়েছি। তবে রান্নাটা হয় ইউরোপীয় ধরনে। রাঁধে মগ বাবুর্চি। আর সার্ভ করে মুসলমান খানসামা। আপত্তি নেই তো ?" যুথিকা প্রশ্ন করে।

"আপত্তি ? কিসের আপত্তি ? ওরাও তো মানুষ। ওরাও তো ভারতীয়। আমার অত শুচিবাই নেই। যেটুকু ছিল ডিটেনশন ক্যাম্পে সেটুকুও গেছে। মগের রান্নার কি তুলনা আছে ? মগের মুলুক যদিও কাম্য নয়। আর মুসলমান বাবুর্চিরাই তো আমাদের কোর্মা কালিয়া কোপ্তা কাবাব রেঁধে খাওয়াত। হিন্দু মুসলিম একতা কি নিরামিষ খেয়ে হয় ?" মধুমালতী সহাস্যে বলে।

"আচ্ছা, জেনে নিলুম আপনি কী খেতে ভালবাসেন। তবে আমরা নিরামিষ ধরলেও ডিমটা ছাড়িনি। বাচ্চারা পুডিং খেতে ভালোবাসে। আমরাও। আশা করি আপনিও।" যুথিকা আশ্বাস দেয়।

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমিও মাঝে মাঝে মুখ বদল করতে ভালোবাসি, কিন্তু আমার জন্যে মাছমাংস রাঁধতে হবে না। শুধু মিস্টার দত্তবিশ্বাসের জন্যেই রাঁধতে বলবেন।" মধুমালতী চিন্তা দূর করে।

"কেন জুলি আমিষ খাবে না ?" মানস আশ্চর্য হয়।

"মল্লিক সাহেব, আপনি কি ভুলে গেছেন যে জুলি বিধবা ?" মধুমালতী বলে।

"জুলি কোনোকালেই সধবা ছিল না। ওটা একরাতের ব্যাপার। পরের দিনই ওর স্বামী বিলেত চলে যায়। স্বামীর সন্ধানে জুলিও অবশেষে বিলেতে হাজির হয়। কিন্তু ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগে না। না, জুলি সধবাও নয়, বিধবাও নয়। সে কুমারী।" মানস জোর দিয়ে বলে।

"তা কি আমি জানিনে?" মধুমালতী দৃঢ়স্বরে বলে, "তবু এটাও জানি যে ওর মনের ভিতর বৈধব্যের সংস্কার নিহিত রয়েছে। সেইজন্যেই ওর মা ওর বিয়ে দিতে পারছেন না।"

"মেয়েদের বিয়ে ক'বার হয়!" ফোঁস করে ওঠেন মিসেস মুস্তাফী। "আবার বিয়ে দিলে সেই পাপে আবার বিধবা হতেও পারে। কাজ কী ওকে আবার দুঃখ দিয়ে?"

ক্যাপ্টেন মুস্তাফী এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন। বলেন, "সুখেরও তো অন্য পথ নেই। মেয়েটা সারাজীবন দুঃখ পাবে এই বা কেমন কথা! যেক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক পাকা হয়নি সেক্ষেত্রে বিবাহটা এমনিতে অসিদ্ধ। জুলিকে অভয় দিয়ে বলিস, মিলি, যে বয়স থাকতে ও যেন আবার বিয়ে করে ও মা হয়। নয়তো পরে পশতাবে।"

"আচ্ছা, বাবা, তোমার মনের কথাটা তো এই যে, বিপ্লব মেয়েদের দিয়ে হবার নয়। শ্বশুরবাড়ীর ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক থাকাই ওদের ভাগ্য। অথবা বাপের বাড়ীর।" মধুমালতীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রোহ।

"মল্লিক সাহেব, আমি আপনার কোর্টে আপীল করছি," ক্যাপ্টেন মুস্তাফী করযোড়ে বলেন, "আপনি অনেক পড়াশুনা করেছেন, অনেক দেশবিদেশেও ঘুরেছেন, আপনি এই অবুঝ মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিন দেখি যে, যাদের দেশে রুশো জন্মাননি, ভলতেয়ার জন্মাননি, বিপ্লবের জন্যে মাটি তৈরি হয়নি, বীজ বোনা হয়নি সেদেশে বিপ্লবের ফল ফলতে পারে না। তরুণ প্রাণের অপচয় দেখে কষ্ট হয়।"

মানস কী বলতে যাচ্ছিল, মধুমালতীর মুখের ভাব লক্ষ করে থেমে যায়। ওরও কষ্ট হয় তরুণীর জীবনের অপচয় দেখে।

"কেন, বাবা, রুশো ভলতেয়ার যেদেশে জন্মাননি সেদেশেও কি বিপ্লব হয়নি? রাশিয়ার দিকে তাকাও।" মধুমালতী উত্তাপের সঙ্গে বলে।

"সেদেশেও শতাব্দীকাল ধরে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল মার্কসবাদী চিন্তাধারা। ওরাও কর্ষণ করেছিল ইনটেলেকটের। তোদের মতো খালি ইমোশনের নয়। শুধু রক্ত দিলেই বিপ্লব হয় না। দিতে হয় কঠোর মানসিক শ্রম। মার্কস বলো, লেনিন বলো, কী প্রচণ্ড এঁদের মানসিক সাধনা!" ক্যাপ্টেন মুস্তাফী ও ঘরে যান।

"বাবার কথা সত্য হলে আরো একশো বছর। আমরা কেউ দেখে যেতে পারব না ভারতের বিপ্লব।" মধুমালতী হতাশায় ভেঙে পড়ে।

ওর মা অত শত বোঝেন না। বলেন, "একশো বছর লাগে লাগবে। বিপ্লব তো পালিয়ে যাচ্ছে না ভারতও পালিয়ে যাচ্ছে না। পালিয়ে যাচ্ছে তোর আর তোর বান্ধবীদের জীবন যৌবন। বিয়ে থা কর, ঘরসংসার কর, আমরা আর ক'টা দিন আছি, আমাদের শেষবয়সে একটু শান্তি দে। জুলির মার জন্যে অবশ্য তেমন কোনো সান্ত্বনা নেই। ও মেয়ের বিয়ে আর হবার নয়।"

মানস ও যূথিকা বিদায় নেয়। মধুমালতী এগিয়ে দেয়।

বাড়ী ফেরার পর যূথিকা মন খোলে। "তুমি যাঁদের ডিনারে ডেকেছ তাঁদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রাক্তন বন্দিনী। আরেকজন গান্ধীজীর সঙ্গে য়েরওয়াদা জেলের প্রাক্তন বন্দী। এর জন্যে তোমাকে সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?"

"হতে পারে। তা বলে আমি আমার যৌবনের বন্ধুদের সঙ্গে সেকালের মতো মিশতে পারব না? হারানো যৌবনকে একদিন কি দু'দিনের জন্যে ফিরে পাব না? চাকরি করছি বলে কি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি।" মানস ফেটে পড়ে।

"আহা, অত বিরক্ত হচ্ছ কেন? পুলিশের সঙ্গে তোমার যেমন মধুর সম্পর্ক মধুমালতীর জন্যে সেটা মধুরতর হবে না তো?" কটাক্ষ করে যূথিকা।

জুলিকে নিমন্ত্রণ করলে মধুমালতীকেও নিমন্ত্রণ করতে হয়। জুলি হচ্ছে মধুমালতীর অতিথি। খুবই খারাপ দেখাত যদি মধুমালতীকে বাদ দিতুম। তুমি নিজেই তো ওঁদের সবাইকে ডাকছিলে।" মানস তর্ক করে।

"সবাইকে ডাকলে কথা ওঠে না। ক্যাপ্টেন মুস্তাফী এখানকার সেরা ডাক্তার। পুলিশ সাহেবের কুঠিতেও তাঁর ডাক পড়ে।" যূথিকাও যুক্তি দেখায়।

"তা হলে দেখো, পুলিশ থেকে কেউ আমার নামে লাগাবে না। লাগালে লাগাবে বিপ্লবীরাই। কেন মধুমালতীর এত খাতির? কিন্তু জুলিকে ডাকলে ওর বান্ধবী মিলিকেও ডাকতে হয়? আরে, জুলি হলো আমার বন্ধুজায়া। জুলি বিপ্লবী হবে আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি। ওর নিজের মুখেই জানতে ইচ্ছে করে কেন ওর এই পরিবর্তন হলো।" মানস কৌতূহল প্রকাশ করে।

"ওর শুভানুধ্যায়ী নাকি ইংরেজদের মধ্যেও ছিলেন। লেডী হ্যারিংটন না থাকলে ও ছাড়া পেত না বোধহয়।" যূথিকা বলে।

"লেডী হ্যারিংটন ভারতীয়দের সকলের বন্ধু। লণ্ডনে ওঁদের একটা সমিতি

ছিল। তার কাজ ছিল ভারতীয়দের বিপথে যেতে দেখলে সুপথে ফিরিয়ে আনা। বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের। আমিও ওঁর সঙ্গে চা খেয়েছি। জুলিকে উনি স্নেহের চোখে দেখতেন। জুলির মা ওঁরই পরামর্শে বিধবা মেয়েকে নিয়ে বিলেতেই থেকে যান ও নিজে মন্টেসরি ট্রেনিং নেন। মেয়েকেও কোথায় যেন ভর্তি করে দেন। আমার ফিরে আসার বছর দুই বাদে ওঁরাও ফেরেন। কলকাতায় মন্টেসরি স্কুল স্থাপন করেন। এমন সময় হঠাৎ খবর পাই জুলিকে ধরে নিয়ে গেছে। ওর ঘরে নাকি চোরাই রিভলভার পাওয়া যায়। জুলির বক্তব্য হলো ওর ঘর সব সময় তালাবন্ধ থাকে না। নিচের তলায় স্কুল। কে কখন জল খেতে উপরে উঠে আসে। ঘরে ঢোকে। বাথরুমে যায়। জুলি কি পাহারা দিচ্ছে নাকি? রিভলভারটা বাইরের কেউ এসে লুকিয়ে রেখে গেছে। সন্দেহের অবকাশ থাকলে মামলা আইনের ধোপে টেকে না। তাই ওকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক করা হয়।" মানস যতটুকু জানে জানায়।

"কিন্তু বিলেত ফিরে না গিয়ে ও বম্বেতে যাত্রাভঙ্গ করে কেন? সরকার টের পেলে আবার ধরে এনে ডিটেন করত না?" যুথিকা প্রশ্ন করে।

"যাত্রাভঙ্গ করে সৌম্যদার সঙ্গে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। সৌম্যদাকে ও ভক্তি করত। স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে ওকেই ও মানত। সৌম্যদা ওকে বোঝায় যে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য ওকে বাংলাদেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় পুণাতে থাকলেও। পরে ওর মা সরকারকে লিখে অনুমতি আনিয়ে নেন। পুণায় সৌম্যদা য়েরওয়াদা জেলে বন্দী থাকতেই হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ছাড়া পেয়ে বম্বে গিয়ে কিছু রসদও জোগাড় করে। মাহাত্মার একজন কাছের মানুষ সৌম্যদা পরে মহাত্মার আহ্বানে সেগাঁওতেও যায়। জুলিকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে থাকতেই ও সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করে। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মপন্থা ওর মনে ধরে না। সৌম্যদা সেগাঁওতে যেতেই জুলি ওর মায়ের কাছে ফিরে আসে। ততদিনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেমেছে। জুলি স্কুল চালানোর কাজে মাকে সাহায্য করে।" মানস বলে যায়।

"তা হলে ও আর বিপ্লবী নয়?" যুথিকা আশ্বস্ত হয়।

"সন্ত্রাসবাদী নয়। কিন্তু বিপ্লবী কথাটার অর্থ আরো ব্যাপক। যারা সরকার ওলটপালট করে তারাও বিপ্লবী, যারা সমাজ ওলটপালট করে তারাও বিপ্লবী। যারা বোমা রিভালভার দিয়ে খুন খারাপী করে তারাও বিপ্লবী। যারা বিদ্রোহী জনতাকে দিয়ে জেলখানা উড়িয়ে দেয় তারাও বিপ্লবী। জুলি শুনছি একটা বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে

সংযুক্ত রয়েছে। জানিনে ওরা কী রকম বিপ্লবী। সৌম্যদাকে ও মানে। ভক্তি করে। নতুন করে যোগাযোগ হলে সৌম্যদার প্রভাবে জুলি বিপ্লবী মতবাদ ত্যাগ করতেও পারে।" মানস আশা প্রকাশ করে।

"সৌম্যদার উপরে তোমার অগাধ বিশ্বাস। এটা কি সেই বিলেত প্রবাসের সময় থেকে?" যূথিকা বলে পরিহাসের স্বরে।

"আরো আগে থেকে। তুমি বোধহয় জানো না যে আমিও একদা অসহযোগী ছিলুম। সৌম্যদা আমাদের ফ্রেণ্ড, ফিলসফার, গাইড। ও জেলে যায়, আমি যাইনে। তার থেকে ছাড়াছাড়ি। বিলেতে আবার বন্ধুমিলন। দেশে ফিরে ও এবার জেলে যায়, আমি ওর মতো সত্যাগ্রহীদের জেলে দিই। কী করি, বলো? অপ্রিয় কর্তব্য। এমন চাকরি কি কারো ভালো লাগে? একদিন হয়তো জুলিকেও জেলে পাঠাতে হবে। সৌম্যদাকেও।" মানস করুণ স্বরে জানায়।

"এড়াবার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়তে চাও। এই তো?" যূথিকা গম্ভীর।

"যা বলেছ। কিন্তু এখনো মনঃস্থির করতে পারিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের বোঝাপড়ার সম্ভাবনা আছে। যুদ্ধকালে সত্যাগ্রহ নাও হতে পারে। কংগ্রেস নেতারাই দিল্লীর মসনদে বসতে পারেন।" মানস দোদুল্যমান।

"যাক, এখন সৌম্যদাকে নিমন্ত্রণ কর। উনি এই শহরে থাকেন, অথচ একদিনও আসেন না। সেই যে কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল সেই শেষ দেখা। আমার সঙ্গে প্রথম দেখাও বটে। আশা করি নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন এই বন্ধুজায়ার খাতিরে নয়, আরেক বন্ধুজায়ার খাতিরে।" যূথিকার কণ্ঠে অভিমান।

"সৌম্যদাও তো বলতে পারে, ছ'মাস হলো বদলী হয়ে এসেছি, ওর সঙ্গে দেখা করতে ওর আশ্রমে যাইনি। আমার দিক থেকে গাফিলতি হয়নি তা নয়।" মানস দোষী বোধ করে। বন্ধুকে বাঁচায়। চিঠি লিখে মাফ চায়।

ওদিকে মধুমালতীও ওকে খবর পাঠিয়েছিল। সৌম্য শহরের বাইরে ছিল। ফিরে এসে খবর পায়। সঙ্গে সঙ্গে মানসকে চিঠি লেখে। দু'জনের দুই চিঠি দু'জনের হাতে একই সময়ে পৌঁছয়। সৌম্যও মাফ চেয়েছে। আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না। হাতে এনতার কাজ। যূথিকাকে ও বাচ্চাদেরকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল। জুলির সঙ্গে দেখা হবে শুনে খুশি। দত্তবিশ্বাসের কথাও ওর মনে আছে।

॥ দুই ॥

ডিনার তো রাত আটটায়। তার তিন ঘণ্টা আগেই ছিমছাম বিলিতী পোশাকপরা একজন সমুপস্থিত। চাপরাশি তাঁকে সেলাম করে বলে, "সাহেব গেছেন ক্লাবে টেনিস খেলতে। ফিরতে দেরি হবে। মেমসাহেব আছেন।"

"তাঁকে সেলাম দিয়ে বল মিস্টার দত্তবিশ্বাস।" আগন্তুক ড্রইং রুমে বসেন।

"স্বাগতম্। স্বাগতম্।" বলে ছুটে বেরিয়ে আসে যূথিকা। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কই, আর দু'জনা কোথায় ?"

"ওরা আসবেন যখন ডিনারের সময় হবে। ওঁদের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি চলে এসেছি মল্লিকের সঙ্গে আমার পুরনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে। আপনি তখন ছিলেন না। আপনার সঙ্গেও আলাপ জমাতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে আমি সামনের মাসের গোড়ার দিকেই বিলেত ফিরে যাচ্ছি। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, কনভয়ের অভাবে আর যাত্রী জাহাজ চলাচল করবে না। আমারটাই শেষ যাত্রী জাহাজ। বেঁচে থাকলে ফের দেখা হবে, কিন্তু সে যে কবে তা কেউ ভবিষ্যদ্ বাণী করতে পারে না। যুদ্ধ যদি ছড়ায় তবে হার জিৎ হয়তো সাত বছর বাদে। আমার তো এদেশে কাজ নেই, কর্ম নেই, বৌ নেই, বাচ্চা নেই। আমার প্রাণটার এমন কী দাম যে সেটাকে বাঁচানোর জন্যে এদেশে পড়ে থাকতে হবে! যখন জানি যে কেউ আমাকে চিনবে না, কেউ আমাকে পুছবে না। আমার পক্ষে ওদেশই ভালো। আমার নিজের একটা আস্তানা আছে। আর আছে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বুকশপ। তবে ভাবনার কথা এই যে, আমার খদ্দেররা বেশীর ভাগ ভারতে থাকে। যুদ্ধের হিড়িকে তাদের মেল অর্ডার সরবরাহ করা সম্ভব হবে না।" দত্তবিশ্বাসকে উদ্বিগ্ন দেখায়।

"তা হলে ফিরে গিয়ে কাজ কী? তার চেয়ে এইখানেই একটা দোকান টোকান দিয়ে বসে যান।" যূথিকা পরামর্শ দেয়।

"না, মিসেস মল্লিক। এখানে আমার তেমন কন্‌টাক্‌টস নেই। ওখানে যেমন আছে। লর্ড ও লেডীদের থেকে শুরু করে কে না চেনে আমাকে! কন্টিনেন্টের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে। তবে তাতে ছেদ পড়বে হিটলার যদি পোলাণ্ড থেকে ঘুরে হলাণ্ড আক্রমণ করে। যুদ্ধে এবার সব যুবককে কন্‌স্ক্রিপট করে ইংরেজরাও নানান কাজে লাগিয়ে দেবে। আমাকেও যদি ধরে নিয়ে যায় তো আমিও একটা কাজ পেয়ে যাব। হতে পারে দমকল বাহিনীর কি হোম গার্ডের কাজ। বড়ো বড়ো বইয়ের দোকানের কর্মচারীরা যুদ্ধে চালান গেলে তাদের পদও তো খালি হবে। আমি বারো বছর ওদেশের বাসিন্দা হয়ে ওদেশের পাশপোর্ট পেয়ে গেছি। কিছু না হোক বেকার ভাতা তো আমি পাবই। প্রাণের ভয় আছে, জীবিকার ভয় নেই। এদেশে ঠিক বিপরীত। কেন থাকব? কার আকর্ষণে থাকব?" দত্তবিশ্বাস বিলাপ করে।

"বুঝেছি। যাকে বিয়ে করতে চান তিনি রাজী নন। আমি কি তাঁকে চিনি? চিনলে ঘটকালি করতে পারি।" যূথিকা সকৌতুকে বলে।

"চেনেন বইকি। আজকেই তো ডিনারে ডেকেছেন।" দত্তবিশ্বাস আভাস দেয়।

"কোন্‌জন বলুন তো! মধুমালতী?" যূথিকা একটু খেলায়।

"বলেন কী! মধুমালতী! দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। ওঁর উপযুক্ত বর কোনো এক মহান নেতা। আমি অতি সামান্য মানুষ।" দত্তবিশ্বাসের চোখে ভীতি।

"তাহলে কি মঞ্জুলিকা? সেও তো বিপ্লবী নায়িকা।" যূথিকা বলে।

"ওর জননীর ইচ্ছা আমি ওকে বিপ্লবের বিপথ থেকে নিবৃত্ত করি। ওঁর কথাতেই দু' দু'বার প্রস্তাব করেছি, দু' দু'বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। কাল স্টীমারেও আরো একবার প্রস্তাব করেছি। এবার প্রত্যাখ্যাত হলে চিরবিদায়।" গোপন কথাটি ফাঁস করে দেয় দত্তবিশ্বাস।

যূথিকা অনুমান করেছিল যে দত্তবিশ্বাসের আকর্ষণের চুম্বক আর কেউ নয়, জুলি। ওই চুম্বকই ওকে বিলেত থেকে দেশে টেনে নিয়ে এসেছে। কলকাতা থেকে সুদূর পূর্ববঙ্গে। যেখানে তেমন কোনো দ্রষ্টব্য নেই সেখানে শুধু শুধু এস্‌কর্ট হতে কে রাজী হয়। স্টীমারই বিবাহপ্রস্তাবের মনের মতো স্থান।

য থিকা একটু ভেবে নিয়ে বলে, "আমার সহযোগিতা স্বচ্ছন্দেই প্রত্যাশা করতে পারেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস। ফল কী হবে জানিনে, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে, মিস্টার দত্তবিশ্বাস।"

"অতবার মিস্টার দত্তবিশ্বাস বলে লজ্জা দেন কেন? আমি মানসের পুরনো বন্ধু, সেই সূত্রে আপনারও। সুকুমার বলতে কি বাধবে? যদি বাধে তবে সুকুমারদা বলবেন।" দত্তবিশ্বাস অনুরোধ জানায়।

"তা হলে আপনিও আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না।" যূথিকা অনুনয় করে।

"অল রাইট। যূথি, তুমি কী শর্ত আরোপ করতে চাও?" দত্তবিশ্বাস জানতে চায় বিশেষ আগ্রহভরে।

"শর্তটা—" যূথিকা ইতস্তত করে।

"বলো, বলো, বলেই ফ্যালো।" দত্তবিশ্বাস পীড়াপীড়ি করে।

"জুলি যদি তার বৈধব্যের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পারে তা হলে আপনি ওকে আরো সময় দেবেন। চাইকি আরো সাতবছর। সেটা যদি আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়—পুরুষমানুষের পক্ষে হবেই তো—তা হলে আমার দ্বিতীয় শর্ত আপনি আর কালবিলম্ব না করে মধুমালতীর কাছে প্রস্তাব পেশ করুন। মনে করুন এটা একটা জুয়ার দান। লেগে যায় তো ভালো, না লাগে তো উত্তম। আর ওই যে আপনার মহাবিপ্লবভীতি ওটা অমূলক। মধুমালতী কবে বিপ্লবী ছিলেন, এখন অন্য মানুষ। আপনার ও ধারণা এককালে ঠিক ছিল, এখন ভুল।" যূথিকা ঘটকালি করে।

শক কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগে। "বৈধব্যের সংস্কার। ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে। বিলেতে পড়াশুনা করেছে। বিপ্লবী নায়িকা। তারও কিনা শুনি বৈধব্যের সংস্কার! হ্যাট বীটস মী! আমি হেরে গেছি। দাও, দাও, বোন, একটু বিষ টিষ থাকলে দাও। এ প্রাণ আমি আর রাখব না।" দত্তবিশ্বাস কাতরোক্তি করে।

"অ্যালকোহল বলছেন? না, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন ইত্যাদি এ বাড়ীতে পাবেন না। লেমন স্কোয়াশ, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, জিঞ্জার এল দিতে পারি। লেমন বার্লি খাবেন?" যূথিকা খানসামাকে ডাকে।

"না, না, ওসব কিছু না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। ওঃ আমার মাথা ঘুরছে বৈধব্যের সংস্কার! জানো, যূথি? ওর জন্যেই আমি এতদিন বিয়ে করিনি। নইলে ওদেশেই আমার বিয়ে হয়ে যেত। গার্ল ফ্রেণ্ডদের একজনের না একজনের সঙ্গে দেখতে আমি বোধহয় কুপুরুষ নই?" দত্তবিশ্বাস একটু গর্বের সঙ্গে বলে।

'কে বলে কুপুরুষ? দস্তুরমতো সুপুরুষ।" যূথিকা মনে মনে হাসে।

"বৈধব্যের সংস্কার মুছে যেতে আরো সাতবছর লাগবে! ততদিনে বানপ্রস্থের বয়স হয়ে থাকবে। আমি আর অপেক্ষা করব না, যূথি। কিন্তু যাঁকে বিয়ে করতে বলছ তিনি কি আমার মতো একটা নগণ্য পুরুষকে বরণ করতে ঘৃণা বোধ করবে

না? তিনি কি আমার সঙ্গে বিলেতে গিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হবেন? সামনের মাসেই আমার শেষ জাহাজ। তিনি কি সেই জাহাজে আমার সহযাত্রিণী হতে প্রস্তুত হবেন? কী দরকার এ জুয়াখেলার? হার যেখানে ধ্রুব।" দত্তবিশ্বাস গ্লাসে চুমুক দেয়।

যুথিকা অভয় দিয়ে বলে, "ওসব আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন, দাদা। আপনি শুধু একটিবার জানতে দিন যে মধুমালতীকে আপনার পছন্দ হয়েছে।"

"তার আগে আমি একবার জুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাই। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে জুলির ওটা বৈধব্যের সংস্কার। পুত্রশোকে কাতর হয়ে ওর শ্বশুর মশায় লম্বা ছুটি নেন ও অকালে রিটায়ার করেন। তার পরে সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে বৃন্দাবনবাসী হন। জুলির নামে তাঁর এস্টেট থেকে মোটা মাসোহারা আসে। সেটা কিন্তু ততদিন ওর পাওনা যতদিন ও তাঁর পুত্রবধূ। জুলির বাবাও ওর নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ওর কিসের অভাব! অভাবটা ওর বিপ্লবী গোষ্ঠীর। ওর মাসোহারার টাকা ওদেরই ব্যবহারে লাগে। ওরাই বোধহয় ওকে আবার বিয়ে করতে দিচ্ছে না।" দত্তবিশ্বাসের অনুমান।

"বেশ তো। জুলির সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্যে সময় নিন। কলকাতা ফিরে যাবার আগে আমাকে কিন্তু জানিয়ে যাবেন কী স্থির হলো।" যুথিকা বলে।

"না, না, ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে না দিয়ে চূড়ান্ত বোঝাপড়া নয়। আমি এসেছি ওর এস্কর্ট হয়ে। ফিরে যাব এসকর্ট হয়ে। কলকাতা থেকে মানসকে আমি টেলিগ্রাম করে জানাব জুলি না মিলি কাকে আমি বিয়ে করতে চাই। তার আগে কাউকেই কোনো আভাস দিয়ো না। খাবার টেবিলে আজ আমাকে বসাবে দু'জনের মাঝখানে?" দত্তবিশ্বাস অনুরোধ জানায়।

"তা কী করে সম্ভব, সুকুমারদা? ছ'জনের টেবিল ওভাবে সাজানো যায় না। আমি মনে মনে ঠিক করেছি মানস আর আমি বসব মুখোমুখি দুই প্রান্তে। মানসের ডান দিকে জুলি, বাঁ দিকে মধুমালতী। আমার ডান দিকে আপনি, বাঁ দিকে সৌম্যদা। আপনার বাঁ দিকে জুলিকে বসালে আমি বসব কোথায়? মানসের ডান দিকে? স্বামী আর স্ত্রী পাশাপাশি বসে না। সেটা বিয়ের বেদীতে মানায়, কিন্তু খাবার টেবিলে বেমানান।" যুথিকা হেসে উড়িয়ে দেয়।

"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে। আমি বসব মানসের জায়গায়, মানস বসবে আমার জায়গায়।" বিকল্প প্রস্তাব করে দত্তবিশ্বাস।

"একই কথা। স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি। আপনি বিলেতে বসবাস করেন। আপনাকে এটিকেট শেখাতে যাব আমি! আমি তো ওদেশে যাইনি।" যুথিকা হাসে।

"না, ওটাও বেমানান। আমার মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। আচ্ছা, যূথিকা, মানসদের ক্লাবে বিষ টিষ রাখে?" দত্তবিশ্বাস প্রশ্ন করে।

"রাখে বই কি। ওটা ইউরোপীয়ান ক্লাব।" উত্তর দেয় যূথিকা।

"তা হলে আমাকে অনুমতি দাও, আমি মানসের সন্ধানে যাই। ও নিজে না খাক, আমাকে খাওয়াবে। ওটাই এটিকেট।" দত্তবিশ্বাস ছুটি নেয়।

যূথিকা চাপরাশিকে বলে সাহেবকে ক্লাবে পৌঁছে দিতে।

বাচ্চা দুটি বাইরে খেলা করছিল। ওদের সঙ্গে ছিল বেয়ারা আর আয়া। দূর থেকে দেখা গেল পায়ে হেঁটে আসছেন কম্পাউণ্ডের ভিতরকার রাস্তা দিয়ে এক সাদা খদ্দরের ধুতী ও হাতকাটা জামা পরা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। কাঁধ থেকে নেমেছে পাট দিয়ে তৈরি এক ঝোলা। মাথায় গান্ধী টুপী।

খবর পেয়ে যূথিকা বেরিয়ে আসে। "সৌম্যদা নাকি? এতদিন পরে মনে পড়ল। সেটা কি জুলির গুণে না আমাদের গুণে?"

"জুলি না এলেও আমি আসতুম। কই, তোমার বাচ্চারা কোথায়? আয়, দ্যাখ, কী এনেছি তোদের জন্যে। বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ, বাজপাখী।" সৌম্য তার ঝোলা উজাড় করে দেয়। সব গ্রাম্য কারিগরের তৈরি কাঠের খেলনা। দেশী রঙে ছোপানো।

"সাপ! সাপ নেই কেন?" জিজ্ঞাসা করে সাতবছরের ছেলে দীপক।

"তাই তো। আনতে ভুলে গেছি। আবার যখন আসব সাপ নিয়ে আসব। সাপ খেলাবার বাঁশিও আনব তার সঙ্গে।" সৌম্য তাকে কাছে টেনে নেয়। আর তার বোন মণিকাকে তুলে নিয়ে কাঁধে বসায়।

"এই! তোমরা প্রণাম করলে না কেন! করো, করো। ইনি কে জানো? জ্যাঠামশায়। গান্ধী মহারাজের শিষ্য।" যূথিকা ওদের প্রণাম করায়।

"এসব ফিউডাল প্রথা তুলে দেওয়াই ভালো। ছোট বড়ো সবাই সবাইকে প্রণাম করতে পারে না। যেটা সবাই সবাইকে করতে পারে সেটা ওদের ওই গুড মর্নিং বা গুড ইভনিং। কিন্তু ওর বাংলা করতে গেলে কৃত্রিম শোনায়। এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।" সৌম্য তার সঙ্গে জুড়ে দেয়, "মেয়েদেরও।"

"শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম না করে 'সুপ্রভাত' বলে অভিবাদন করবে কোন্ বৌমা! দেখবে, তোমার স্বরাজের পরেও কারো সাহসে কুলোবে না। এমন কি, ওদের বিপ্লবের পরেও না।" যূথিকার ইঙ্গিতটা জুলি ও মধুমালতীর প্রতি।

"না, ওদেরও অত সাহস হবে না। সব চেয়ে কঠিন প্রাত্যহিক ব্যবহারে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফরাসীরা চাকরকে বলে, 'মঁসিয়ে', ঝিকে বলে, 'মাদাম', তাদের তুই তোকারি করে না। বলে, 'আপনি'। ফরাসী বিপ্লব অনেক দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে নয়। জুলিকে দিয়ে তুমি তোমার বেয়ারাকে 'মশাই' বলিয়ে নিতে পারবে? আর মধুমালতীকে দিয়ে তোমার আয়াকে 'ঠাকরুণ'? দাঁড়াও, আমিই ওটা শুদ্ধ করে দেব।" সৌম্য মজা দেখতে চায়।

"এখন নয়। এই মুহূর্তে নয়।" যূথিকা শশব্যস্ত হয়ে বলে। "ওরা হয়তো ঠাওরাবে আস্ত পাগল। এমনিতেই তো দাড়িগোঁফে ঢাকা পড়েছে মুখ। দেখলে মনে হয় আদিম গুহামানব।"

"আমি বিলিতী ক্ষুর বর্জন করেছি। দেশী ক্ষুর দিয়ে কামালে ছালশুদ্ধ উঠে আসে। তা ছাড়া এতে কতকটা মুনি ঋষির মতো দেখায়। গ্রামের লোক কথা শোনে। মৌলানা মৌলবীর সঙ্গেও মিল আছে। মুসলমানদের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। আমার তো পূর্ববঙ্গে আসার কথা ছিল না। আমার স্থান বিহারে। গান্ধীজী আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস উজ্জীবিত করতে। দুই পক্ষেই সাম্প্রদায়িক শক্তি অবিশ্বাসের বীজ বুনে চলেছে। আমি যেখানেই যাই হিন্দুদের বলি মুসলমানরা তোমাদের শত্রু নয়। মুসলমানদের বলি হিন্দুরা তোমাদের শত্রু নয়।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে তার মৈত্রীতত্ত্বের।

"ওতে কিছু হবে না, সৌম্যদা। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। কেউ কারো হাতে জল খাবে না। ছোঁওয়া লাগলে স্নান করবে। মানুষকে যতরকমে পারে অপমান করবে। এ কি আজকের সমস্যা না সাত শতকের? এ ভেদবুদ্ধি ইংরেজের সৃষ্টি নয়। এর সুযোগ নিচ্ছে ইংরেজ। তোমরা ইংরেজকে তাড়াতে পারো, কিন্তু নিজেদের অতীতের ভূতকে তাড়াতে পারবে না। সে তার ভুতুড়ে কাণ্ড করে যাবেই। আমরাও চেষ্টা করছি মেলাতে মিলতে। আজকের ডিনারেই দেখবে বৌদ্ধ বাবুর্চি ও মুসলমান খানসামা হিন্দু ও ব্রাহ্মর আহার জোগাচ্ছে।" যূথিকা নিবেদন করে।

"আমার কথা যদি বলো আমি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান ব্রাহ্মণ হরিজন ইতর ভদ্র সকলের হাতেই খাই। কিন্তু সব কিছু খাইনে। আমিষ চলে, কিন্তু তেল ঘি চলে না, ময়দা চলে না।" সৌম্য তার খাদ্যের কথা বলে।

"মধুমালতীর কাছে শুনেছি। তবে আমার ধারণা ছিল আপনি যখন গান্ধীজীর শিষ্য তখন মাছমাংস খান না। আমরাও খাইনে, তবে তার কারণ অন্য।" যূথিকার চোখ ছলছল করে।

"আগে তো খেতে।" সৌম্যর মনে পড়ে।

"আপনি জানেন না বুঝি ?" যুথিকা ধরা গলায় বলে, "এখানে বদলী হয়ে আসার মুখেই একজনকে হারাই। জীবনযাত্রাকে শুদ্ধ করতে হবে, সরল করতে হবে, সেকথা ভেবে আমিষ ত্যাগ করি। তবে প্রোটিনের জন্যে ডিমটা ছাড়া হয় না। সুরা ও সিগারেট বর্জন করেছি, কিন্তু চা কফির নেশা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কমিয়ে দিয়েছি।"

সৌম্য সমবেদনা জানায়। তার পরে বলে, "মাছমাংস ছাড়লেই যে জীবনযাত্রা শুদ্ধ হয় এটা কেমন করে বিশ্বাস করব, যখন দেখি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাও আমিষ খান ? এক্ষেত্রে আমি বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। গান্ধীজীও অনুমতি দিয়েছেন। তবে সুরা ও সিগারেট ছেড়ে ভালোই করেছ। চা কফি তত খারাপ নয়। কিন্তু নেশা হলে খারাপ।"

মণিকাকে নিয়ে ওর মা অন্য ঘরে যান। সে সকাল সকাল খেয়ে শুতে যাবে। দীপকের সঙ্গে গল্প করতে থাকে সৌম্য। সাপ থেকে ওরা যখন শজারুতে পৌঁছেছে তখন বাইরে থেকে শোনা যায় হৈ হল্লা। ঝড়ের মতো ভিতরে ঢোকে জুলি। মন্থর গতিতে মধুমালতী। স্টীমার আর গাধাবোট।

"হ্যালো, মাস্টার মাল্লিক। হাউ ডু ইউ ডু ?" বলে জুলি দীপকের কবজিতে এমন চাপ দেয় যে বেচারা ত্রাহি ত্রাহি করে। কিন্তু ওকে ছাড়ছে কে ? দুই গালে সশব্দে চুম্ খেয়ে জুলি ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। "ওয়েল, সানি, আই অ্যাম ইয়োর আন্টি জুলি।"

মানস আর যুথিকা ওদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শেখায়নি। সাতবছর বয়স হলো দীপকের। কিন্তু ও ছেলে ইংরেজী না পারে পড়তে না পারে বুঝতে, না পারে বলতে। জুলির সেটা জানবার কথা নয়। সে মহা বিরক্ত হয়ে সৌম্যদাকে বলে, "রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।"

আওয়াজ শুনে যুথিকা বেরিয়ে আসে। তার সঙ্গে মণিকা। আড়াই বছরের সেই বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয় জুলি। তারপর আকাশে ছুঁড়ে লোফালুফি করে। যেন রবারের বল। তা দেখে ওর মা তটস্থ। এখনো আলাপ হয়নি। তবে ও যে জুলি ছাড়া আর কেউ নয় এটা অনুমান করতে সময় লাগে না যুথির।

"এ বেবীর ইংরেজী শেখার বয়স হয়নি। এই খুকু, আমি তোর মাসী। জুলি মাসী।" যুথিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, "মিসেস মাল্লিক, আই প্রিজিউম।"

আফ্রিকার অরণ্যে একমাত্র শ্বেতাঙ্গকে আবিষ্কার করে স্ট্যানলি যেমন বলেছিলেন "ডক্টর লিভিংস্টোন, আই প্রিজিউম ?"

যুথিকা ওর হাতে হাত রেখে বলে, "আসুন, মিসেস সোম, মণিকে ঘুম পাড়াবেন। ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যা।"

মধুমালতীকে অভ্যর্থনা করে যুথিকা সৌম্যদাকে বলে ওর ভার নিতে। দীপকও প্রণাম করে ওর পড়ার ঘরে চলে যায়। তার গৃহশিক্ষক অপেক্ষারত। পড়া সেরে ও সাতটার সময় খাবে।

"জুলির কাণ্ডকারখানা দেখলেন, সৌম্যদা?" মধুমালতী বলে, "বাচ্চারা যেন ওর খেলার পুতুল। ওর স্বামী বেঁচে থাকলে এতদিনে ওরও দু'তিনটি খোকাখুকু হতো। যে মা হওয়ার জন্যে জন্মেছে সে কেন যে বিধবা হয়? বিধাতার কী অন্যায়!"

"কথাটা কিন্তু বিপ্লবীর মুখে শোভা পায় না, মিলি। যে বিপ্লবী হওয়ার জন্যে জন্মেছে সে কেমন করে মা হয়?" সৌম্য পরিহাস করে।

"জুলিকে আমি বিপ্লবীর মধ্যে গণ্য করিনে। ওর এক বান্ধবী ওর ঘরে একটা রিভলবার রেখে যায়। ও তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে। জানত না যে রিভলবার রাখাটা মস্ত বড়ো একটা অপরাধ। পুলিশ এসে হানা দেয়। বান্ধবীর নাম জানতে চাইলে ও নীরব থাকে। এর জন্যে ওকে ঢের নির্যাতন সইতে হয়। শেষে ওকে ওরা বন্দী শিবিরে পাঠায়। সেইখানেই ওর বিপ্লবের দীক্ষা। ওকে না ধরলে ও কোনোদিন বিপ্লবী হতো না। মণ্টেসরি ক্লাস নিয়েই আনন্দ পেতো আর দিত।" মধুমালতী জুলির পূর্বকথা বলে।

"শুনেছি ওর মুখে। কিন্তু বন্দী শিবিরে বাস করার সময় সন্ত্রাসের তপ্ত হাওয়া ওর গায়ে লাগে। ইংরেজরাই ওকে সন্ত্রাসবাদী বানায়। অনেক কষ্টে আমি ওকে সন্ত্রাসবাদ ছাড়াই। কিন্তু বীরত্বের যেসব দৃষ্টান্ত ও দেখেছিল সেসব ওর অন্তরে দেগে গেছে। ও বিশ্বাসই করতে পারে না যে বীরত্বের আরো একটা আদর্শ আছে, আরো সব দৃষ্টান্ত আছে। ধরাস্নায় তো যায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া সে দেখেনি। গুলীর সামনে বুক পেতে দেওয়া ও কল্পনা করতে পারে না। মরব, তবু মারব না, এই হচ্ছে আমাদের মতে বীরত্ব। ওদের মতে কাপুরুষতা। ওকে আমি দোষ দিইনে। আমরা একটা নতুন পথের পথিক। আমরা নিজেরাই নিজেদের আদর্শে স্থির থাকতে পারছিনে। তবে জুলি ঘুরে ফিরে আমাদের পথেই আসবে। যদি না আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হই।" সৌম্যের কণ্ঠে গভীর প্রত্যয়।

মধুমালতী বলে, "কেন আপনি ওকে বীরাঙ্গনা করতে চান, সৌম্যদা? দেখছেন না সাত সমুদ্র পার হয়ে এক রাজপুত্র এসেছে ওর সন্ধানে? বৈধব্যের সংস্কার না থাকলে এখনি ওর বিয়ে হয়ে যেত। ওই যুথিকার মতো ওরও সুখের সংসার হতো।"

"যূথিকার সংসার নিছক সুখের নয়, মিলি। দীপক আর মণিকার মাঝখানে বয়সের ব্যবধান লক্ষ করেছ? আরো একজন ছিল মাঝখানে। সে আর নেই। আমি ওকে দেখেছি। কী সুন্দর ছেলে!" সৌম্য ওকে দেখেছিল বছর তিনেক আগে।

"আহা রে!" মধুমালতী ব্যথিত হয়।

ওদিকে মাতে আর মাসীতে মিলে মণিকাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নাজেহাল। ও মেয়ে কেমন করে টের পেয়েছে যে বাড়ীতে আজ পার্টি আছে। তাতে ওরও পার্ট আছে। যতরকমের রঙ্গ ওর জানা সব একে একে দেখাবে।

"ওর উপরে জোর জবরদস্তি করতে যেয়ো না, বৌদি। ওর যখন খিদে পাবে তখন ও খাবে। ওর যখন ঘুম পাবে তখন ঘুমোবে। ওটাই ওর পক্ষে সুসময়। আর তুমি যে ওকে ঘড়ির কাঁটা ধরে খাওয়াতে আর শোওয়াতে চাও সেটাই ওর পক্ষে অসময়। আয়, মণি, আমরা বাজনা বাজাই।" এই বলে জুলি ওকে নিয়ে গিয়ে পিয়ানো বাজাতে বসে। মণিকাও ওর কচি আঙুল নিয়ে টুং টাং করে।

"ওর নিজের ছেলেমেয়ে না হলে ওর শিক্ষা হবে না।" যূথিকা বলে মধুমালতীর পাশে আসন নিয়ে।

"বৈধব্যের সংস্কার না কাটলে এ জন্মে নয়।" মিলি মন্তব্য করে।

"সৌম্যদা, তুমি অমন চুপ করে বসে কেন? কী ভাবছ? সত্যাগ্রহ কবে শুরু হবে।" যূথিকা ওর মনের কথা আঁচ করে বলে।

"ওটা তো আমার চিরদিনের ভাবনা। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে যেমন কোলের মেয়েকে ঘুম পাড়ানো যায় না তেমনি দেশের জনগণের ঘুম ভাঙানো যায় না। তারও সময় অসময় আছে। আমরা চেষ্টা করতে পারি, ব্যর্থ হয়ে পিয়ানো বাজাতে পারি, কিন্তু সময়কে এগিয়ে আনতে পারিনে।" সৌম্য মৌনভঙ্গ করে।

জুলি হঠাৎ পিয়ানো থামিয়ে উল্টো দিকে ফিরে তর্ক জুড়ে দেয়। "সময় আসবে কী? সময় এসে গেছে। তাকে বয়ে যেতে দিলে চিরতরে হারাবে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না।"

"তুমি কী বলতে চাও খোলসা করে বল, জুলি।" মিলি উস্কে দেয়।

"সরকারী আমলার বাংলোয় বসে আর কত খোলসা করব, মিলি? কেউ আড়ি পেতে শুনছে কি না কে জানে!" জুলি যূথিকার দিকে তাকায়।

দীপকের গৃহশিক্ষক ছিল পড়ার ঘরে। যূথিকা উঠে গিয়ে দেখে সে যুবকটি কখন একসময় চলে গেছে। বুঝতে পেরেছে যে ছাত্রের মন উড়ু উড়ু। বাড়ীতে লোকজন আসছেন। পার্টি হবে।

"তুমি অসঙ্কোচে বলতে পারো, জুলি।" যূথিকা ইতিমধ্যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমেছে। আর 'মিসেস সোম' থেকে 'জুলি'তে।

জুলি এবার নির্ভয়ে বলে, "ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। দেশ প্রস্তুত, নেতারা প্রস্তুত নন।"

"ওঃ! তোমাদের গোষ্ঠীর বৈঠকে গিয়ে এইসব শুনেছ বুঝি! যা শুনেছ তারই প্রতিধ্বনি করছ।" সৌম্য মুখ টিপে হাসে।

"কেন? আমার কি স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই?" জুলি রেগে বায়। "কার না বুঝতে বাকী আছে যে হিটলারের আক্রমণে ইংরেজ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকবে, সাম্রাজ্য সামলাবার অবকাশ পাবে না?"

"জুলি, তুমি তো ইংলণ্ডে বাস করেছ, ওদের খুব কাছে থেকে দেখেছ। তোমার কি বিশ্বাস যে ইংরেজরা সহজে কাৎ হবে? কাৎ যদি না হয় তো আবার সাম্রাজ্য ফিরে পেতে কতক্ষণ! যদি না আমরা ওদের চেয়ে আরো বলবান হতে পারি।" সৌম্য ওকে শান্ত করে।

এমন সময় মণিকা বলে ওঠে, "বাবার কাছে যাব।" ও কান পেতে শুনতে পেয়েছে বাবার পায়ের শব্দ।

"ও কে? সৌম্যদা নাকি? ডুমুরের ফুল। আর উনি? মধুমালতী দেবী! যাঁর এত মধুর নাম তিনি সাক্ষাৎ রণচণ্ডী।" মানস ঘরে ঢুকে সবাইকে বাউ করে। "আর এই সেই আগুনের ফুলকি! জুলি নয়, জুলকি। তোমরা যে সময়ের আগেই আসবে তা জানলে আমি দত্তবিশ্বাসকে ড্রিঙ্কস অফার করতুম না। আর সেও আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাত না"

মানসের পেছনে দাঁড়িয়ে দত্তবিশ্বাসও সবাইকে বাউ করে।

মণিকা এর মধ্যেই বাবার কোলে উঠেছিল। মানস ওকে কৌতুক করে কোলান্তরিত করতে গেলে দত্তবিশ্বাস এক কদম পেছিয়ে যায়। পোশাকের ভাঁজ নিয়ে ও বিষম খুতখুতে। ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়।

"দত্তবিশ্বাস," মানস বলে সৌম্যকে, "সেইরকমই আছে। শরীরের চেয়ে পোশাক ওর কাছে প্রিয়। ইংরেজরা মানুষ চেনে কী দেখে? মুখ দেখে নয়, স্যুট দেখে। ওটা যদি হয় সাভিল রোর স্যুট বা বণ্ড স্ট্রীটের স্যুট তা হলে তুমি অভিজাত কুলের। ওর মাথায় চাঁটি মারলে ও ততটা ব্যথা পাবে না যতটা পাবে ওর কোট বা ট্রাউজার্স কুঁচকে গেলে। এত বয়স হলো, এখনো ঘর বাঁধল না। তার মূলে ওই একই ভয়।"

"চৌধুরী," দত্তবিশ্বাস বলে, "তুমি সাধুসন্ত মানুষ তখনো ছিলে, এখনো আছো। কিন্তু মল্লিকের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন দেখছি। ও এখন অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব। আমাকে এক পেগ হুইস্কি ধরিয়ে দিয়ে নিজে খায় পাইনেপল জুস।"

মণি ততক্ষণে কোল থেকে কোলে বিহার করছে। অবশেষে উঠেছে মধুমালতীর কোলে। আর দীপক এক কোণে লাজুক ছেলের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে। এগোবে না পেছোবে বুঝতে পারছে না।

সৌম্য বলে, "ওহে মানস, তোমার আসার আগে আমাদের কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, শুনবে? ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। বৈঠকে গিয়ে জুলি এই সূত্র শিখে আসুক বা নিজেই উদ্‌ভাবন করুক আমরা এ নিয়ে তর্কবত।"

"এমন সুযোগে পঁচিশ বছর পরে আরো একবার এসেছে। সেবার আমরা ট্রেন ফেল করেছি। এবারেও যদি করি তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এই হলো বৈঠকের আলাপ আলোচনার সারমর্ম।" জুলি ঘুরিয়ে বলে।

"ট্রেন ফেল করেছি বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও, জুলি?" দত্তবিশ্বাস উত্তেজিত হয়। "সুযোগই বা কিসের? ইংলণ্ডের দুর্যোগ ভারতেরও দুর্যোগ। ইংরেজ যদি সাম্রাজ্য হারায় তো সে সাম্রাজ্য জার্মানরাই সন্ধিসূত্রে পাবে। নাৎসীদের হাতে পড়োনি তো কখনো। পড়লে টের পেতে কী নৃশংস। এটা অবশ্য রাম রাবণের যুদ্ধ নয়, ইংরেজেরও দোষ আছে, তবু দুটো মন্দের মধ্যে ইংরেজরাই কম মন্দ। ওদের হটালে বেশী মন্দের কবলে পড়বে।"

"আমি গভীরভাবে চিন্তিত।" মানস বলে। "এই সুযোগে স্বাধীন হয়েই বা আমরা করব কী? একপক্ষ না একপক্ষের শিবিরে যোগ দিয়ে লড়ব। নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। কোন্ পক্ষে যোগ দেব? জার্মান পক্ষে যোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যোগ দিতে হলে ইংরেজ পক্ষেই যোগ দিতে হয়। কিন্তু দাসহিসাবে নয়, মিত্র হিসাবে। ওরা যদি আমাদের দাসত্বের শিকল খুলে দেয় আমরা ওদের দিকেই ঝুঁকব? যদি না দেয়—যদি না দেয়—"

"তা হলে আমরা কোনো দিকেই ঝুঁকব না। সত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করব। উপযুক্ত লগ্নের জন্যে অপেক্ষা করব।" সৌম্য তার বন্ধুর বাক্য পুরণ করে।

যূথিকার মনে পড়ে দীপকের খাবার সময় হয়েছে। সে সাতটার সময় খায়। আটটার সময় শুতে যায়। তাই যূথিকা উঠে যায়। তর্ক চলতে থাকে।

মণি হঠাৎ বলে, "মার কাছে যাব।" তার ঘুম পেয়েছে।

॥ তিন ॥

জুলি এবার মণির সঙ্গে যায় না। পিয়ানোর টুল থেকে নেমে এসে সোফায় বসে। মিলির পাশে। বলে, "সৌম্যদা, তোমরা গান্ধীপন্থীরা কি বুঝতে পারছ না যে এবার ট্রেন ফেল করলে তোমরা বরাবরের জন্যে ফেল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাধবে তখন দেখবে তোমাদের দিন গেছে। তোমাদের গুরু তার আগেই দেহত্যাগ করে থাকবেন। সত্তর বছর বয়স হলো। আর কদ্দিন বাঁচবেন!"

"এমনও তো হতে পারে যে ট্রেন আমাদের জন্যে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছি ততক্ষণ ছাড়বে না।" সৌম্য হেঁয়ালীর ভাষায় বলে।

"মিলি, তুমি কি এর মর্ম কিছু বুঝলে?" জুলি মিলির মুখের দিকে তাকায়।

"এর মর্ম যুদ্ধ একদিনে খতম হচ্ছে না। গোড়ার দিকে সত্যাগ্রহ না করে পরে একসময় করলেও চলবে। সেবারকার যুদ্ধ চারবছর ধরে চলেছিল। এবারকার যুদ্ধ কদ্দিন চলবে বলতে পারেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস?" মিলি সুকুমারের হাতে খেই ধরিয়ে দেয়। সে সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে।

"সেবারকার যুদ্ধে," দত্তবিশ্বাস বলে, "রাশিয়া ঝাঁপ দিয়েছিল, আমেরিকা ঝাঁপ দিয়েছিল। এবার ওরা এখনো ঝাঁপ দেয়নি, পরে দেবে কি না বলা যায় না। রাশিয়া তো জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করে সরে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র যদি এর চেয়ে বিস্তৃত না হয় তবে যুদ্ধকালও বিস্তৃত হবে না। কাজেই চৌধুরীর ওই ওয়েট অ্যাণ্ড সী পলিসি খুব একটা ভুল নয়। যুদ্ধ যদি সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে বছর দুই ওর স্থিতিকাল। যদি রাশিয়া আমেরিকা জাপান জড়িয়ে পড়ে তবে চার বছর তো মিনিমাম।"

"পাঁচবছরও লাগতে পারে।" মানস মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ, কিন্তু জানবে কী করে যে পরে ওই সব শক্তি জড়িয়ে পড়বে? রাশিয়ার গরজটা কিসের? বিনা যুদ্ধেই কেমন অর্ধেক পোলাণ্ড হাতিয়ে নিয়েছে। হিটলার হেরে গেলে অর্ধেক জার্মানীও দখল করতে পারে। বাধা দেবে কে? আর হিটলার যদি জেতে তবে লড়তে লড়তে বলক্ষয় করে থাকবে। রাশিয়া যা চাইবে তাই পাবে। বলকান কী বলটিক রাজ্য। আমার মনে হয় না রাশিয়া এবার নামবে। আর আমেরিকা? হ্যাঁ, আমেরিকা নামতে পাবে, ইংলণ্ড ফ্রান্সকে রক্ষা করতে। তা হলে ওই চারবছরই আমার এস্টিমেট।" দত্তবিশ্বাস মিলির দিকে চেয়ে বলে।

"হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্টালিন যে অপকর্ম করেছেন তাতে আমার বিশ্বাস টলে গেছে কমিউনিস্টদের উপর। গত বছর যেমন টলেছিল ইংলণ্ডের রক্ষণশীলদের উপর। ওরা করেছিল মিউনিক চুক্তি। এরা করেছে অনাক্রমণ চুক্তি। কার্যত পোলাণ্ড ভাগ করার ফন্দী। আর আমি মরছি পোলাণ্ডকে বাঁচানোর কথা ভেবে। গতবছর যেমন পীড়িত হয়েছিলুম চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাঁচানো গেল না দেখে। মনে মনে শাপান্ত করেছিলুম ইংরেজ ফরাসীদের। কী কাপুরুষ ওরা। চেকদের বলি দিয়ে নিরাপদ হলো! এবার ওরা পোলাণ্ডের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই আমি ওদের সাধুবাদ দিচ্ছি। আমার মতে ওরা যাতে জয়ী হয় তার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্য জোগানো উচিত আমাদের। এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য।" মানস বলে যায় আবেগের সঙ্গে।

জুলি তেড়ে আসে। "কী বললে! সর্বপ্রকার সাহায্য। না একো জওয়ান, না একো রুপেয়া। সেবার দিয়েছি, দিয়ে ঠকেছি। এবার দেব না, ঠকব না। ওরা আগে তো আমাদের স্বাধীনতা আমাদের ফিরিয়ে দিক। তারপর আমরা ভেবে দেখব ওদের সাহায্য করব কি করব না।"

"তা হলে পোলাণ্ড ডুববে, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।" মানস আকুল হয়।

"আমি মানসের সঙ্গে একমত।" দত্তবিশ্বাস বলে। "মিউনিক চুক্তির সময় আমি বিলেতের জনমতের বিস্ফোরণ দেখেছি। ইংরেজরা কেউ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল না। সকলেই চেয়েছিল শান্তিতে বাস করতে। কিন্তু হিটলারের দিগ্বিজয় অব্যাহত চলতে থাকলে ওরাই বা কদ্দিন নীরব সাক্ষী হয়ে শান্তিতে বাস করতে পারবে? ইংলণ্ড ফ্রান্সের পর আসবে ভারতেরও পালা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা দিন দিন দুষ্কর হবে। মানস ঘরে বসে মন খারাপ করবে। আমি কিন্তু চললুম লণ্ডনে ফিরে। ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও লড়ব।"

মধুমালতী শিউরে ওঠে। "সে কী! আপনি এই সেদিন বিলেত থেকে ফিরলেন! আবার যাবেন ওদেশে! যুদ্ধের মাঝখানে। আপনার কি প্রাণের মায়া নেই?"

"প্রাণের চাইতেও মূল্যবান জিনিস আছে, মিস মুস্তাফী। তা নইলে আপনিই বা আগুন নিয়ে খেলতে গেলেন কেন? ইংরেজরা নাৎসী নয় বলেই আপনি বেঁচে গেলেন। নইলে আপনার চিতাভস্ম একটি বোতলে পুরে আপনার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দিত। দেশ আপনার কাছে প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। তেমনি আমার কাছে মূল্যবান ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক জীবনধারা। আমি নির্ভয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারি। কথা বলতে পারি। চিন্তা করতে পারি। বিশ্বাস করতে পারি। চলুন না একবার ওদেশে। দেখবেন গণতান্ত্রিক জীবনধারা কত মূল্যবান।" দত্তবিশ্বাস মধুমালতীকে প্রবর্তনা দেয়।

"বলেন কী! আমি যাব আমার প্রভুদের দেশে গণতান্ত্রিক জীবনধারা দেখতে! সে কী রকম গণতন্ত্র যার জন্য অপর একটি জাতির পিঠে সিন্ধুবাদের বুড়োর মতো চেপে থাকতে হয়? একটি দাসজাতি না থাকলে তাদের মতো প্রভুজাতির সে রকম গণতন্ত্র সম্ভব হতো না। আপনি প্রাণ দিতে যাচ্ছেন আপনার প্রভুজাতির প্রভুত্বের জন্য। আমি যদি প্রাণ দিই তো দেব আমার দাসজাতির মুক্তির জন্যে।" মধুমালতী বলে।

দত্তবিশ্বাস আর তিনজন বিলেতফের্তার কাছে আপীল করে। "চৌধুরী, মল্লিক, জুলি, তোমরাও তো ওদেশে বাস করেছ। ওদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা কেমন মূল্যবান তোমরাও কি উপলব্ধি করোনি? সাম্রাজ্য থাকা না থাকার উপরেই কি কি নির্ভর করে ওদের গণতান্ত্রিক জীবনধারা?"

"গণতান্ত্রিক বিবর্তন এখনো পূর্ণতা পায় নি। পাবে যখন শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসবে ও তাদের দুর্গতি দূর হবে।" মানস বলে, "তা হলেও ইংলণ্ডে যা আছে তা অপূর্ণতা সত্ত্বেও মহামূল্য। রাজনৈতিক শরণার্থীদের আর কোন্ দেশ অমন অবাধে শরণ দেয়? মার্কস তো ইংলণ্ডে বসেই বিপ্লবের শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। শাস্ত্র না হলে শুধু কি শস্ত্রের দ্বারাই বিপ্লব হয়? লেনিনও তো ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশুনা করে বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি পাকা করেছিলেন। গণতন্ত্রের দেশ না হলে আর কোথায় আশ্রয় নিয়ে এঁরা ধনতন্ত্রের মৃত্যুবাণ নির্মাণ করতেন?"

"গণতন্ত্রের মাপকাঠি যদি এই হয় যে সাধারণ লোক পুলিশের ভয়ে ভীত নয় তবে ইংলণ্ডে গণতন্ত্র আছে। কিন্তু ওটা হলো একটা নেতিবাচক সংজ্ঞা। সাধারণ

লোকের ক্ষমতা তো ওই ভোট দেওয়া পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মন্ত্রীর হাতে। তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাজনৈতিক ক্ষমতার মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত। মুষ্টিমেয় ধনপতিই পলিসি পরিচালনা করেন। তাঁদের পরিচালনায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়। বেকারদের সৈনিকে পরিণত করলে সমস্যার একপ্রকার সমাধান হয় বটে, কিন্তু তার জন্যে চাই বিশ পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধে বহু লোক মরবে, সেটাও একপ্রকার সমাধান। আমি তো মনে করি না যে যুদ্ধ বিনা ওদের গণতন্ত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।" সৌম্য অভিমত দেয়।

এর পরে জুলির পালা। "ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন সে চাইবে সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা, তার সঙ্গে যতটা খাপ খায় ততটা গণতান্ত্রিক জীবনধারা। সেদিক থেকে ব্রিটেন আমাদের আদর্শ নয়। ব্রিটেনের ওই পার্লামেনটারি ডেমোক্রাসীর জীবনমরণ সমস্যা আমাদের জীবনমরণ সমস্যা নয়। ইংলণ্ডের এই দুর্যোগে আমরা দুঃখিত কিন্তু আমরা কেন আমাদের এই সুযোগ হেলায় হারাব?"

দশবছর আগে ওরা চারজনেই লণ্ডনে ছিল। দশবছর পরে আবার মিলিত হয়েছে। এ মিলন কি তর্ক বিতর্কেই কণ্টকিত হবে? দীপকের আহার সারা হলে যুথিকা ফিরে এসে বলে, "চার বন্ধুর এই সম্মিলন বার বার ঘুরে আসুক এটাই আমার অন্তরের কামনা।"

"আমাদের চারজনেরই।" মানস স্বর মেলায়।

"আমার কথা যদি বলো, আমি বোধহয় আর এদেশে ফিরব না। বেঁচে থাকলে ওই দেশেই ঘর বাঁধব।" দত্তবিশ্বাসের কণ্ঠে বিষাদ।

"সে কী হে।" সৌম্য বিস্মিত হয়। "এদেশ কী অপরাধ করল?"

"না, দেশের কোনো অপরাধ নেই। আমারই নিয়তি। এমন কেউ নেই যে এদেশে আমাকে টেনে রাখতে পারে বা চায়।" দত্তবিশ্বাস কৈফিয়ৎ দেয়।

"কেন, আপনার মা বাবা ভাই বোন?" মধুমালতী সুধায়।

"মা অনেকদিন আগে দেহরক্ষা করেছেন। বাবা দ্বিতীয় সংসার নিয়ে সুখে আছেন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। সোদর ভাই যেটি ছিল সেটি নিরুদ্দেশ। আমার তেমন কোনো বন্ধন নেই এদেশে। ওদেশেই আমার দানাপানি। তা ছাড়া এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বেঁচে থাকার যে উন্মাদনা সে তো ওই দেশেই। ওখানে আমি একজন দর্শক নই, আমি একজন অভিনেতা।" দত্তবিশ্বাস বুক ফুলিয়ে বলে।

"কেন, সুকুমারদা, তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে এই যুদ্ধের কল্যাণেই ভারতের মাটিতেও একটা বিপ্লব ঘটবে? যেমন ঘটেছিল সেবার রাশিয়ায়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে স্বদেশে উপস্থিত থাকাই তো সুবুদ্ধি।" জুলি হাসিমুখে বলে।

"আমিও তাই মনে করি।" জুলির সমর্থক মিলি। "তবে সেটা বিপ্লব না গণসত্যাগ্রহ না সিপাইবিদ্রোহ তা কেমন করে বলব?"

"অমন একটা অনিশ্চিত অঘটনের জন্যে পায়চারি করতে আমি নারাজ। হতাশ হয়ে জাহাজ ধরতে চাইলেও আর জাহাজ পাব না। শেষ যাত্রীজাহাজ ছাড়ছে অক্টোবরের গোড়ার দিকে।" দত্তবিশ্বাস ঘোষণা করে।

মানস চমকে ওঠে। "তুমি তা হলে দেশ ছেড়ে চিরকালের মতো চললে আর তিন সপ্তাহের মধ্যে।"

"চললুম ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টে। সেবারেও তো বাঙালী সৈনিকরা গেছল ওয়েস্ট এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। বাঙালীরা যদি ঘরে বসেই বিপ্লব ইত্যাদি করে তবে তাদের ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতা মহাজীবনের অভিজ্ঞতা হবে না। কী করে ওরা কেউ লিখবে টলস্টয়ের মতো 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'? একা নজরুল বাঙালীর মান রেখেছেন কয়েকটি কবিতা লিখে। তাও করাচীর ওধারে না গিয়ে।" দত্তবিশ্বাস বলে।

"আমার তো খুবই ইচ্ছে করে ফ্রণ্টে যেতে, বন্দুক হাতে নয়, কলম হাতে। কিন্তু যেতে দিচ্ছে কে? সেবারকার মতো এবারেও সিভিলিয়ানদের অনেকে সরকারের অনুমতি চেয়েছিলেন ফ্রণ্টে যেতে। বড়লাট সবাইকে জানিয়ে দিয়েচেন যে এবার কাউকেই অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এ পত্র পাঠিয়েছেন। মনে হয় তিনি অনুমান করছেন যে এই দেশটাই ফ্রণ্ট হবে। কিংবা তিনিও প্রতীক্ষা করেছেন বিপ্লবের বা গণসত্যাগ্রহের বা সিপাইবিদ্রোহের। কাজেই আমার ইচ্ছে থাকলেও তোমার সঙ্গে একই জাহাজে পশ্চিমযাত্রা হয়ে উঠছে না, ভাই দত্তবিশ্বাস। না হতে পারছি টলস্টয়, না নজরুল।" আক্ষেপ করে মানস।

যূথিকা তার স্বামীকে শাসায়। "তোমার মনে মনে এই মতলব! তুমি যুদ্ধ দেখতে ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টে যেতে। পারলে না বলে আফসোস করছ।"

"আমার একটুও ভালো লাগছে না ইতিহাসের এই ক্রান্তিকারী লগ্নে নীরব দর্শক হতে। এত বড়ো একটা ঘনঘটা হবে তাতে আমি থাকব না। ভাই দত্তবিশ্বাস, তোমার মতো আমি স্বাধীন নই। একে চাকুরে তার উপর সংসারী। তাই আমি বোট মিস করছি। ঘটনাস্রোতের পোত।" মানসের খেদোক্তি।

"তোমাকে তো আমি আমার জাহাজের সহযাত্রী হতে বলিনি। আমার আশা ছিল একজন সাহসিকা আমার সহযাত্রিণী হবেন। সেই আশায় এদেশে আসা। 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায়, মা।'। তোমার মতো নীরব দর্শক আমি হব না, তা ঠিক। কিন্তু বোমা যখন বর্ষণ হবে তখন দর্শনেরও সুযোগ পাবে না, আমাকে গর্তে ঢুকে গা বাঁচাতে হবে। না, কাউকে সহযাত্রিণী হতে না বলাই ভালো। জাহাজটাই না টর্পেডোর ঘা লেগে ঘায়েল হয়। তখন হয়তো লাইফবোয় ধরে ভাসতে হবে। আমার ধারণা ছিল না যে লড়াইটা এত তাড়াতাড়ি বাধবে। যেদিন বাধে তার দু'দিন আগেও সার হীরেন তাঁর স্ত্রী লেডী মিটারকে বলেছিলেন যে সবাই মিলে শান্তির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ যদি একটা মাসও পেছিয়ে যায় তবে শীত এসে পড়বে, তখন কেউ যুদ্ধে নামবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হিটলার ঘটায় আরেক।" দত্তবিশ্বাস একটু রসিকতার চেষ্টা করে।

বসবার ঘরেই স্যুপ পরিবেশন করা হলো। যে যার নিজের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারিফ করে খেতে লাগল। তারপর গেল খাবার ঘরে ও যে যার নির্দিষ্ট স্থানে।

যূথিকার ডান পাশে দত্তবিশ্বাস ও বাঁ পাশে সৌম্য। মানসের ডান পাশে মঞ্জুলিকা ও বাঁ পাশে মধুমালতী। আপাতত বন্দুক বেয়োনেট নিয়ে লড়াই নয়, কাঁটা চামচ নিয়ে লড়াই। সৌম্যর মতো গান্ধীপন্থীও তাতে অনভ্যস্ত নয়। মগ বাবুর্চি ওর জন্যে আরো অনেক রকম পদ রেঁধেছিল, যা যূথিকার দেওয়া ফর্দের বাইরে। দেখা গেল তাতেই ওর তৃপ্তি।

এই নিয়ে মধুমালতী কটাক্ষ করলে সৌম্য বলে, "তোমার জানা উচিত মিলি, যে আমরা গান্ধীপন্থীরা কেউ হঠযোগী নই। আমরা কর্মযোগী। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কারাগার। সেইজন্যে আমরা প্রিজন ডায়েট খেতে অভ্যাস করি। বন্দী হলে আমরা আহার নিয়ে খুঁতখুঁত করব না। তা যদি করি তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

"কিন্তু এ যে অতি পরিপাটী আহার।" মধুমালতী মন্তব্য করে।

"হ্যাঁ। অনেকদিন পরে এর আস্বাদন নিচ্ছি। কিন্তু এতে আসক্ত হচ্ছিনে। আমাদের যোগ অনসক্তি যোগ।" সৌম্য হাসে।

"আচ্ছা, হিটলার তো নিরামিষভোজী?" জানতে চায় মধুমালতী।

"হ্যাঁ, হিটলারও সেদিক থেকে অহিংসাবাদী। মদও স্পর্শ করেন না। শোনা যায় উর্বশী মেনকারাও তাঁকে ভোলাতে পারে না। অর্জুনের মতো ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। অথচ হিংসার অবতার। কী করে এই প্যারাডক্স সম্ভব হলো?" সৌম্যই জিজ্ঞাসু।

কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। মধুমালতী বলে, "হিটলারকে রাক্ষস বলে

চিত্রণ করে কোনো ফল হবে না এদেশে। রাক্ষসরা কেউ নিরামিষভোজী সুরাত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিল না। দেবতারাও না। পুরাণে ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব চরিত্র। জার্মানরা যে ওকে এত মানে তার মূল কারণ রাজনৈতিক নয়, নৈতিক।"

"এদেশে দেখছি হিটলারের অগণ্য ভক্ত। অনেকের বিশ্বাস হিটলার আসলে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার প্রমাণ হিন্দুদের স্বস্তিক হিটলার তাঁর বাহুতে ধারণ করেন। স্বস্তিক তাঁর নাৎসী দলেরও প্রতীক। ওরাও নাকি আসলে হিন্দু। এমন কথাও শুনতে পাই যে হিন্দু আর জার্মান এরাই আসলে আর্য। আর্যত্বের উপর জার্মানরা তাই এত জোর দেয়। জার্মানরা জিতলে আর্যরা আবার ভারতে আসবে। এদেশের আর্যদের সঙ্গে হাত মেলাবে। যখন জানতে চাই, কী করে বুঝলে যে ওরা জিতবে তখন উত্তর পাই, যে-মানুষ কামরিপুকে জয় করতে পাবে সে-মানুষ জগৎ জয় করতে পারে। হিটলার নাকি সেই মানুষ। 'হাইল হিটলার' বলে জয়ধ্বনি করার জন্যে এদেশের বহু লোক উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এদের যা কিছু আক্রোশ তা ইংরেজের বিরুদ্ধে।" দত্তবিশ্বাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

"সেই যে একটা কথা আছে, আমার শত্রুর যে শত্রু সে আমার মিত্র। ইংরেজ যদি আমাদের শত্রু না হতো হিটলারকে বা তার নাৎসীদের কেউ মিত্র ভাবত না। ইংরেজ যদি আমাদের মিত্রতা চায় তো আমাদের স্বাধীনতার দাবী মিটিয়ে দিক। তা হলে আমরাও ইংরেজের দাসহিসাবে নয় মিত্রহিসাবে লড়ব।" মধুমালতী বলে।

জুলি তার উক্তির সংশোধন করে। "ওটা কিন্তু আমাদের পার্টির লাইন নয়, মিলি। আমরা বলি, আগে তো ইংরেজ আমাদের ঘাড় থেকে নামুক। তারপরে আমরা ভেবে দেখব এ যুদ্ধে আমরা আদৌ পক্ষ নেব কি নেব না। নিলে কাদের পক্ষ নেব। কার্যত ইংরেজ ফরাসীর পক্ষই নেব। ফাসিস্টদের পক্ষ নয়।"

"কিন্তু কারো কারো কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে তারা ফাসিস্টদের পক্ষও নিতে পারে, যদি সেই উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হয়।" মিলিও সংশোধন করে।

"উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয়, তাই যদি হয় তবে এটাও তো একটা উপায়। গোঁড়া কমিউনিস্ট স্টালিন যদি গোঁড়া ফাসিস্ট হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন তবে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধীরা কেন গোঁড়া গণতন্ত্রবিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পারবে না? উদ্দেশ্যটাই সব, উপায়টা কিছু নয়।" জুলির বক্তব্য। অর্থাৎ তার গোষ্ঠীর।

"জুলি, তুমি ওদের সংসর্গ ত্যাগ করো। ওরা কোনোদিনই সফল হবে না।

মাঝখান থেকে বিপদ ডেকে আনবে তোমার মতো সরলা বালিকাদের উপরে। হ্যাঁ, তুমিও একটি সরলা বালিকা।" মানস ওকে হুঁশিয়ারি দেয়।

"আমি কি এখনো তেমনি বালিকা আছি? লণ্ডনে যেমনটি দেখেছিলে, মানসদা। এই দশ বছরে আমি কত দেখেছি, কত শিখেছি।" জুলি আত্মসমর্থন করে।

"এই তো মিস মুস্তাফী এখানে রয়েছেন। তিনি তো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বিশ্বের গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিত্রয়ের সঙ্গে সমঝোতা করবেন না।" মানস আন্দাজ করে।

"কী, মিলি? এটাই কি তোমাদের পার্টি লাইন?" জুলি বাজিয়ে দেখে।

"আমি এখন কোন পার্টিতেই নেই। বাবার বারণ। দেশকে ভালোবাসি। তার মুক্তি চাই। এই পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু যে-কোনো উপায় অবলম্বনীয় এতদূর যেতে আমি অনিচ্ছুক। স্বচক্ষে দেখলুম তো সন্ত্রাসবাদী উপায়ের পরিণাম। ইংরেজ এখন বসিয়ে দিয়েছে মুসলমানকে তার পুরনো মসনদে। লড়তে হলে লড়তে হবে মুসলমানের সঙ্গে। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ খাটবে না। বিপ্লববাদও খাটবে কি? আমি এখন অতটা নিশ্চিত নই, জুলি। আমি সেবা দিয়ে চিত্তজয়ের পথ অবলম্বন করেছি। দেখা যাক এ পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যায়। কয়েকটি বান্ধবীকে পেয়েছি আমার সহকর্মীরূপে। আমরা এখন আমাদের নিজেদের জীবনকে পুনর্গঠিত করার কাজে মন দিচ্ছি। তবে দেশের সামনে যদি ঘোরতর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে কোনো দিন, আমরাও সেদিন প্রাণ দিতে এগিয়ে যাব।" মধুমালতী অঙ্গীকার করে।

মানস বলে, "দুটো আলাদা আলাদা ইস্যুকে আমরা একাকার করে ফেলছি। একটা হলো ভারতের স্বাধীনতা। আর একটা ইউরোপের যুদ্ধ। স্বাধীনতা আজও হতে পারে, একযুগ পরেও হতে পারে, আমাদের জীবনে নাও হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, দাবানলের মতো এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে ছড়াতে পারে, ছড়াতে ছড়াতে আমাদের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছতে পারে। ভারতও নিরাপদ নয়। এ দুর্যোগ ভারতেরও দুর্যোগ। সুতরাং কে কার দুর্যোগের সুযোগ নেবে? সেইজন্যে আমি গভীরভাবে চিন্তিত। ইংরেজকে বেকাদায় পড়তে দেখে তার কাছ থেকে যারা স্বাধীনতা আদায় করে নেবার কথা ভাবছে তাদের কাছ থেকেও ইংরেজ কিছু আদায় করে নেবে। সেটা কখনো নিঃশর্ত স্বাধীনতা হতে পারে না। শর্তটা এই যে, সৈন্য জোগাতে হবে, অর্থ জোগাতে হবে, উপকরণ জোগাতে হবে। যত লাগে, যতদিন লাগে। স্বাধীনতার জন্যে দেশটাই বিকিয়ে যেতে পারে।"

"সেইজন্যেই আমরা চাই নিঃশর্ত স্বাধীনতা।" জুলি বলে।

"সেটা শুধু ইংরেজকে বেকায়দায় পড়তে দেখে। কিন্তু ধরো যদি ওরা আমেরিকার কাছে ভারতকে বন্ধক রাখে?" মানস সুধায়।

"তা হলে অর্থ পাবে, মালমশলা পাবে, কিন্তু গুর্খা, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমানদের মতো সৈনিক পাবে কোথায়! এদের না পেলে যুদ্ধে হারবে। হারজিৎ নির্ভর ভারতের সহযোগিতার উপর। ঠিক বলেছি কি না!" জুলি তাকায় মিলির দিকে।

"ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। ওরা হলো পেশাদার সৈনিক। যার নিমক খাবে তার জন্যে জান দেবে। নিমক এতকাল ইংরেজ দিয়ে এসেছে, দিতে পারে, দিতে রাজী। কেন তবে ওরা যুদ্ধে যাবে না? ওদের উপর তোমাদের এমন কী প্রভাব আছে যে ওরা বেঁকে দাঁড়াবে? সৌম্যদা, তোমাদেরই বা কতটুকু প্রভাব?" মিলি প্রশ্ন করে।

"আমাদের প্রভাব আরো কম। আমরা তো সৈনিকের জীবিকা দিতে পারব না। কৃষকের জীবিকা দিতে পারি। তলোয়ারকে ভেঙে আমরা লাঙল বানাব। আমরা শান্তিবাদী।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলেও ইংরেজরা ভারত থেকে সৈনিক পাবেই। উপকরণও পাবে। তাতে ব্যবসাদার শ্রেণীর লাভ। বাকী থাকে অর্থ। সেইখানেই টান পড়বে। জোর করে আদায় করতে গেলে দেশসুদ্ধ লোক রুখে দাঁড়াবে। এইটেই কংগ্রেসের একমাত্র তুরুপের তাস। কংগ্রেসের মানে গান্ধীজীর।" মানস বলে।

"কংগ্রেস আর গান্ধীজী অভিন্ন এটা তোমার ভুল ধারণা, মানস। ক গ্রেস যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী হবে, যদি যোগ দেওয়া না দেওয়ার স্বাধীনতা ভারতকে দেওয়া হয়। যে-কোনো দেশের পক্ষে যুদ্ধ ও শান্তির সিদ্ধান্তই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর গান্ধীজী হলেন শান্তিবাদী। যোদ্ধাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের শান্ত করাই তাঁর মিশন। গতবারে তাঁর মিশন সম্বন্ধে তিনি তেমন সচেতন হননি। মানবজাতি তাঁর কাছে যা প্রত্যাশা করে তা যুদ্ধে যোগদান নয়, শান্তির খাতিরে অসহযোগ। স্বাধীনতা বলতে যদি রাজক্ষমতা বোঝায় তবে সেটা আপাতত না হলেও চলে। যদি বোঝায় শান্তিস্থাপনের অধিকার তবে তিনি পরীক্ষা করতে রাজী।" সৌম্য বিশদ করে।

"গান্ধীজী তো দক্ষিণপন্থীদের দিকে। নইলে সুভাষদাকে সরাতেন কেন? তুমি দেখবে উনি দক্ষিণপন্থীদের রাজক্ষমতালাভ সমর্থন করবেন, যদি বড়লাটের সঙ্গে কথাবার্তা সফল হয়। সফল হবেই। কারণ ওরাও বুর্জোয়া, এরাও 'বুর্জোয়া।' জু যেন সব জানে।

"আর বামপন্থীরা বুর্জোয়া নয়? ক'জন তারা কাস্তে বা হাতুড়ি ধরে? দক্ষিণ পন্থীরাই বরং চক্রধর।" মানস বক্রোক্তি করে।

"বামপন্থীরা চায় সমাজের ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন। দক্ষিণপন্থীরা চা শুধুমাত্র সরকার বদল। সেইসঙ্গে ছোটখাটো রিফর্ম। ওরা রিফর্মিস্ট। বামপন্থীর রেভোলিউশনারী।" জুলি ব্যাখ্যা করে।

"বেশ তো।" মানস বলে, "আগে তো রিফর্মিস্টদের একটা সুযোগ দাও। দেখাই যাক না কতদূর ওদের দৌড়। ওরা বৃদ্ধ হয়েছে। এখন না পেলে কখন আ সুযোগ পাবে?"

"না, না, ওরা যদি একবার চেপে বসে তো ছলে বলে কৌশলে আর সবাইকে তাড়াবে। যেমন করে তাড়িয়েছে সুভাষদাকে। ওদের বিশ্বাস নেই। কেন্দ্রী সরকার যদি ওদের হাতে পড়ে তবে ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে সব ক'ট বিপ্লবীকে ধরবে। কোনো তফাৎ থাকবে না ইংরেজে কংগ্রেসে।" জুলি ঘা নাড়ে।

"কিন্তু, জুলি," সৌম্য এতক্ষণ পরে মুখ খোলে, "তুমি কি জানো না যে যুদ্ধনীতি নির্ধারণের জন্যে সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন? কংগ্রেসের পলিসি যদি হয় ব্রিটেনকে আলটিমেটাম দেওয়া ও মেয়াদ পার হয়ে গেলে স্বাধীনতার দাবীতে আপসহীন বিরামবিহীন সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া তা হলে তিনি সব অপমান ভুলে গিয়ে আবার কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবেন। একথ শুনে বল্লভভাই বলেন, সুভাষ একটি কচি খোকা। এটা একটা পলিসিই নয় বল্লভভাইদের পলিসি হলো সরকারের সঙ্গে মীমাংসার পথ সব সময় খোলা রাখা সংগ্রাম যদি অনিবার্য হয় তবে না হয় সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া যাবে, কিন্তু ন্যূনতম দাবী মিটিয়ে দিলে আর ইংরেজের সঙ্গে নয় হিটলারের সঙ্গেই সংগ্রাম। কংগ্রেস হিটলার বিরোধী এটা প্রমাণ করতে হবে। নয়তো ইংরেজের বিপক্ষে সংগ্রামকারীদের হিটলারের পক্ষে সংগ্রামকারী বলে অপবাদ দেওয়া হবে ও কোর্টমার্শাল করে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধকালে সরকারমাত্রেই নির্মম। সংগ্রাম অনিবার্য হলে গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত হবে। তিনিই স্থির করবেন সংগ্রাম বলতে কী বোঝাবে। নিছক অসহযোগ না সক্রিয় প্রতিরোধ। যিনি সব চেয়ে অভিজ্ঞ তিনিই সর্বাধিনায়ক। সুভাষচন্দ্রকেও মানতে হবে তাঁর নির্দেশ। নয়তো তাঁকে কংগ্রেসের বাইরে গি পৃথক নীতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা দেওয়া যাবে। সে পন্থা কি বামপন্থীরা সব সমর্থন করবেন?"

"বলা শক্ত। জবাহরলাল আবার দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ভিড়েছেন। উনি কি সত্যিকার বিপ্লবী? না উনি শুধুমাত্র অ্যান্টিফাসিস্ট? তাই যদি হয়ে থাকেন তবে উনিও অবিলম্বে সরকারের সঙ্গে ভিড়ে যাবেন।" জুলি বিমর্ষভাবে বলে।

"তা হলে বামপন্থী বলে আর বাকী রইল কে?" মানস বলে, "যারা অ্যান্টি-ফাসিস্ট নয় তারাই? কার এত সাহস হবে যে বলবে আমি অ্যান্টিফাসিস্ট নই, আমি অ্যান্টিইম্পীরিয়ালিস্ট?"

"সৌম্যদা," জিজ্ঞাসা করে জুলি, "তোমরাও কি অ্যান্টিফাসিস্ট? মানে তোমরা গান্ধীপন্থীরা।"

"আমরা অ্যান্টিওয়ার।" সৌম্য উত্তর দেয়, "ওয়ার যদি হয়ে থাকে ফাসিস্টদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিফাসিস্ট। যদি হয়ে থাকে ইম্পীরিয়ালিস্টদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিইম্পীরিয়ালিস্ট। যদি হয়ে থাকে বুর্জোয়াদের স্বার্থে তবে আমরা অ্যান্টিবুর্জোয়া। আমরা চাই যে এ যুদ্ধ আজ এখনি থেমে যাক। মানুষ মেরে, তার দেশ দখল করে, তার ঘরবাড়ী ধ্বংস করে, তার সম্পদ লুট করে কোনো সত্যিকার বিরোধ মিটবে না। বিরোধ মেটাবার অন্য উপায় আছে। যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প হচ্ছে সত্যাগ্রহ। আমরা তারই সাধনায় আত্মনিবেদন করেছি।"

"আমাদেব এখানে দু'জন ইংরেজ অফিসার রয়েছেন।" মানস বলে, "যুদ্ধ বেধে গেছে শুনে আমি গেলুম ওঁদের সহানুভূতি জানাতে। ইংলণ্ডের দুর্যোগে আমি আন্তরিক দুঃখিত। দু'বছর ছিলুম ওদেশে। কত আনন্দ পেয়েছি! কত ভালোবাসা! তা মিস্টার শেফার্ড কী বললেন, জানো? বললেন, গান্ধী কি হিটলারকে নন্-ভায়োলেণ্ট হতে পরামর্শ দিতে পারেন না? ইংরেজদেরকেই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন বিনা যুদ্ধে দেশ ছেড়ে দিতে ও তারপরে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ করতে। আমি চুপ করে শুনলুম। গান্ধীজীব ওই পরামর্শ কেউ কানে তুলবে না, ভারতীয়রাও না, যদি ভারত আক্রান্ত হয়।"

"তা কি আমরা জানিনে, মানস?" সৌম্য বলে, "যতক্ষণ না আমরা কাজে প্রমাণ করেছি যে ভারতের জনগণ বিনা অস্ত্রে ব্রিটিশ শাসকদের হারিয়ে দিয়েছে, তোমার ওই শেফার্ড সাহেবকেও, ততক্ষণ কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করবে না। এমন কি কংগ্রেসের নেতারাও না। ওদের চালনা করতে হলে কিছুদূর ওদের সঙ্গে চলতে হয়। গান্ধীজী ওদের বেশ খানিকটে রাশ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে আমাদের উপর নির্দেশ আছে আমরা যেন যুদ্ধে সহযোগিতা না করি। লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণাক্ত করবে কে?"

"ওঃ তোমরাই হলে ধরিত্রীর লবণ!" পরিহাস করে দত্তবিশ্বাস।

"হাসতে পারো, কিন্তু এটা তো মানবে যে আজকের এই বিশ্বব্যাপী হিংসার বিরোধী শক্তি বলতে ওই ক'জন গান্ধীপন্থী কর্মীই সক্রিয়। ওদের কাছে সর্বপ্রধান সমস্যা ভারতের পরাধীনতা নয়, যদিও তার জন্যে তারা সর্বক্ষণ ব্যথিত। সর্বপ্রধান সমস্যা হিংসার উত্তরে হিংসার উপরে অত্যধিক বিশ্বাস। মানুষ কি বুঝতে পারে না যে হিংসার সঙ্গে হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় পক্ষই চূড়ান্ত হিংসায় পৌছবে? শেষে একপক্ষ হেরে যাবে। তখন তার গৌরব করবার মতো কী থাকবে? জিতবে যারা তারা অবশ্য গৌরবে মশগুল হবে, কিন্তু সে আর ক'টা দিন? লুটের মালের বখরা নিয়ে ঝগড়া বেধে যাবে মিতায় মিতায়।" সৌম্য ভবিষ্যদ্বাণী করে।

"আপাতত হিটলারকে রুখতে হবে, এ ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই বিশ্বমানবের। তোমরা যদি তোমাদের অহিংস উপায়ে তা পারতে তা হলে তোমাদের পরামর্শই শোনা যেত। কিন্তু হিটলার না শোনে অহিংসার কাহিনী।" মানস টিপ্পনী কাটে।

"তারপর, মানসদা, আপনার অপর ইংরেজ অফিসার কী বললেন?" জুলি সুধায়।

"তিনি যা বললেন তা আরো চমৎকার। বললেন, আমার ছেলের বয়স এখন চোদ্দ। আরো চার বছর বাদে যুদ্ধ বাধলে ওকে ধরে নিয়ে যেত। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে। যুদ্ধ যখন বাধতই একদিন না একদিন। হিটলার থাকতে যুদ্ধ না বেধে পারে? বললেন মিস্টার বার্লো। ওঁর ওই একটিমাত্র সন্তান। স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ছেলে থাকে ইংলণ্ডে। কিন্তু বোমাকে তিনি ভয় করেন না। কর্তারা নিশ্চয়ই অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করবেন। শেলটারও খোঁড়া হবে। ছেলেমেয়েদের শহর থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন। বলতে ভুলে গেছি যে শেফার্ড আর বার্লো দু'জনেই গত মহাযুদ্ধে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছেন। শেফার্ড ছিলেন গোলন্দাজ। আর বার্লো পদাতিক বাহিনীর অফিসার। তাঁরা কেউ দ্বিতীয়বার যুদ্ধ বাধুক এটা চাননি। অনুমতি পেলে আবার যোগ দিতেন। দেশ আগে। মাই কান্ট্রি রাইট অর রং।" মানস তাঁদের মনোভাব জানায়।

"মাই কান্ট্রি রাইট অর রং, এটাই ঠিক। কিন্তু কার কাছে বড়ো তার কান্ট্রি?" বিলাপ করে মধুমালতী। "কংগ্রেসের ভিতরেই দ্বন্দ্ব। বাইরে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি। যে যার নিজের তালে আছে। দেশের হয়ে কথা বলবে কে? গান্ধীজী? দশবছর আগে হলে পারতেন। এখন আর নয়।"

॥ চার ॥

যূথিকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার মুখ খোলে। "আচ্ছা, তোমার ওই বার্লো সাহেবের ছেলেকে কি চারবছর আগে যুদ্ধ না থামলে ধরে নিয়ে যাবে? যখন তার বয়স আঠারো।"

"যুদ্ধের জন্যে লোক কম পড়লে আরো আগেও ধরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য আইন বদলে দিয়ে।" মানস বলে।

"সে কী!" যূথিকা চমকে ওঠে। "ছেলের নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠবে না? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। একেই তোমরা বলবে গণতান্ত্রিক জীবনধারা? কেউ যদি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে যায় সে স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ধরে নিয়ে গেলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়।"

"ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যদি আইন পাশ করে কনস্ক্রিপশন চালায় তবে সেটা জনপ্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোটেই সম্ভব। জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের অধি-কাংশের ভোটেই নির্বাচিত।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"তোমার ও যুক্তি আমি শুনব না। দরকার হলে ষোল বছরের ছেলেকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে যাবে, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখবে না, এটা অন্যায়। তা সে নাৎসীদের দেশেই হোক আর ডেমোক্রাটদের দেশেই হোক। তা হলে তো একদিন মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যেতে পারে।" যূথিকা আঁতকে ওঠে।

"সে গুজবও শোনা যাচ্ছে," দত্তবিশ্বাস তার বিলেতের অভিজ্ঞতা থেকে বলে। "ভয় পেয়ো না। মেয়েদের ওরা লড়তে পাঠাবে না, পুরুষের অভাবে যেসব কাজ অচল সেইসব কাজে লাগিয়ে দেবে। যেমন অ্যাম্বুলান্স চালানো, টেলিফোন অপারেট করা, সৈনিকদের জন্যে রান্না। অমনি করেই হবে মেয়েদের মুক্তি। ওরাও বলবে, 'সব

কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই। বাধাবাঁধন নেই গো নেই।' কেরানীগিরির দরজা আগেই খুলে গেছে, এবার আরো দরজা খুলবে। ওরাও কনস্ক্রিপশনে আপত্তি করবে না, যদি বিবাহিতা না হয়ে থাকে। এই যেমন এদেশে যুদ্ধের সময় মেয়েদের ডাক দিলে তুমি আপত্তি করতে পারো, মিস মুস্তাফী করবেন না।"

মধুমালতী খুশি হয়ে বলে, "তা হলে তো বেঁচে যাই। বাবা তো বলেন, যুদ্ধ জিনিসটাকে দূর থেকে যত ভয়ঙ্কর মনে হয় নিকট থেকে সেটা তত ভয়ঙ্কর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে তাঁরও মৃত্যুভয় ছিল। গিয়ে দেখেন ভয় ভেঙে গেছে। আমাকে বন্দুক ধরতে ডাকলেও আমি আপত্তি করব নাকি? আমি শুধু জানতে চাই যে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক। কারো তাঁবেদার নই। বাবা তো বলেন, ইংরেজ এতকাল বাঙালীকে বন্দুক ধরার সুযোগ দেয়নি। এবার দেবে। দিতে বাধ্য হবে। তা হলে এ সুযোগ দেশকে স্বাধীন করারও সুযোগ।"

"তা বলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে কনস্ক্রিপট করলে তুমি বিদ্রোহ করবে না?" যূথিকা উত্তেজিত হয়ে 'তুমি' বলতে শুরু করে।

"আগে বন্দুকটা তো হাতে পাই, মিলিটারি ট্রেনিংটা তো নিই, সবাই মিলে দলবদ্ধ তো হই, তার পরে ওই বন্দুক দিয়েই দেশ স্বাধীন করা।" মধুমালতী নিশ্চিত।

"কিন্তু বন্দুকটা ধরিয়ে দেবে কে? ইংরেজেই তো। ট্রেনিংটাও দেবে ইংরেজ। সে কি বুঝবে না যে এর শেষপর্ব তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?" যূথিকা সুধায়।

"এর উত্তর আমিই দিচ্ছি।" মানস বলে, "সে ভালো করেই বোঝে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা পর মুহূর্তেই পাত্রান্তরিত হবে। হিন্দু আক্রমণ করবে মুসলমানকে। মুসলমান হিন্দুকে। রক্ষা করবে কে? ওই ইংরেজ।"

"তোমার ও থীসিস বিলকুল ঝুটা। না একো জওয়ান, না একো রুপেয়া। এইটেই সাচ্চা।" জুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

"কিন্তু আমি ভেবে মরছি এ যুদ্ধ যদি পাঁচবছর গড়ায় তবে বার্লোর ছেলেটার কী গতি হবে। বার্লো বেচারার তো আর একটিও ছেলে কি মেয়ে নেই। তাঁরই বা কী দশা হবে?" যূথিকা সমবেদনায় গলে যায়।

"আহা, এটা তো একজন ব্যক্তির সুখদুঃখের ব্যাপার নয়। একটা জাতির জীবনমরণের প্রশ্ন।" দত্তবিশ্বাস বলে। "জার্মান জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজয় ঘটলে বার্লোই বা কোথায় আর তাঁর পুত্রই বা কোথায়! পরাজিত জাতির পতনের দৃশ্য দেখবার জন্যে বেশীদূর যেতে হবে না। পালযুগের বাঙালী কী ছিল আর লক্ষ্মণসেনের

পরবর্তী যুগের বাঙালী কী হলো। কোথায় তার সেই সব সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজ? বণিকরা যা চড়ে জাভায় সুমাত্রায় যেত। বৌদ্ধ শ্রমণরাও। ইংরেজরা যুদ্ধে হেরে গেলে নৌশক্তি হারাবে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ও বহির্বাণিজ্য। ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান নেমে যাবে। বেকারসংখ্যা আরো বাড়বে। ওদের ভবিষ্যৎ ভেবে ওরা শিউরে উঠেছে বলেই না সময় থাকতে কনস্ক্রিপশন জারি করেছে। গত যুদ্ধেও করেছিল। দেরিতে। সেবার ছিল মাস হিস্টিরিয়া। সবাই ছুটে যায় যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে। তাই গোড়ার দিকে স্বেচ্ছাসৈনিকদের অভাব হয়নি। শেষের দিকে হয়। ততদিনে মাস হিস্টিরিয়া থেমে গেছে। এবার একটি অনিচ্ছুক জাতিকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। নইলে আবার মিউনিকের মতো আত্মসমর্পণ। সেইজন্যেই প্রথম থেকেই কনস্ক্রিপশন। বার্লোর বরাত ভালো। তাঁর ছেলের যুদ্ধে যেতে আরো চারবছর বাকী। ততদিনে হিটলার হেরে গিয়ে থাকবে।"

"কী করে এতটা নিশ্চিত হলে, সুকুমারদা?" জুলি জেরা করে।

'দ্যাখ, জুলি। জার্মানীকে কেউ জিততে দেবে না। না রাশিয়া। না আমেরিকা। অত বড়ো শক্তিশালী এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওরা আরো শক্তিশালী হতে দেবে কেন? ব্রিটিশ নৌবহর যদি জার্মানদের হাতে পড়ে ওদের হাত থেকে আমেরিকার পরিত্রাণ নেই। পেছন থেকে আক্রমণ করবে জাপান। আর অর্ধেক ইউরোপের যুদ্ধোপকরণ যদি জার্মানীর এখতিয়ারে আসে তা হলে তার দাপট থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করবে কে? ওই দুই শক্তি নেপথ্যে অপেক্ষা করছে। মঞ্চে প্রবেশ করবে যথাকালে। হিটলার আখেরে হারবেই, জুলি।" দত্তবিশ্বাস নিশ্চয়তা দেয়।

"তা হলে তো আমাদের এ সুযোগ ব্যর্থ হবে।" জুলি মুষড়ে পড়ে।

"তুমি দেখছি জার্মানদের ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলছ, জুলি। জার্মানদের হারজিৎ জার্মানদের। আমাদের হারজিৎ আমাদের। ইংলণ্ডের দুর্যোগ আমাদের সুযোগ নয়। আমাদের অস্ত্রও অন্যরকম, রণকৌশলও অন্যরূপ। জনতা উদ্বেল হয়েছে বলে নেতাদেরও উদ্দাম হতে হবে এর কোন অর্থ নেই। কিছু না করাও শ্রেয় হতে পারে। পরিস্থিতিকে পাকতে দাও।" সৌম্য পরামর্শ দেয়।

"অমন করলে জোয়ার চলে যাবে। দেয়ার ইজ আ টাইড ইন দি অ্যাফেয়ার্স অভ মেন।" জুলি উদ্ধৃতি দেয়। "টাইম অ্যাণ্ড টাইড ওয়েটস ফর নো ম্যান।'

"একটি বিরাট দেশ তার যুদ্ধনীতি স্থির করবে এইসব প্রবাদ প্রবচন মেনে! এ যেন পাঁজি দেখে যুদ্ধযাত্রা!" মানস উপহাস করে। "দেশে কি কেবল

বিপ্লবীরাই আছে আর আছে উদ্বেল জনতা? রাইটস অ্যাণ্ড রংস্ নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে কেউ নেই? নেই রবীন্দ্রনাথ, নেই অরবিন্দ, নেই গান্ধী? গোটা সভ্যতারই আজ সঙ্কট। শুধু ইংলণ্ডের দুর্যোগ নয়। এতদিন ছিল নেশনে নেশনে যুদ্ধ। এবার তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মতবাদের সঙ্গে মতবাদের। ইডিওলজির সঙ্গে ইডিওলজির। আমি গভীরভাবে চিন্তিত।"

জুলি বলে, "মানসদা, দশবছর আগেও তোমার মুখে শুনেছি তুমি গভীরভাবে চিন্তিত। চিন্তা করতে করতেই তোমার জীবন ভোর হবে। তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। তুমি যদি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও তো যুদ্ধে ঝাঁপ দাও। আর যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চাও বিপ্লবে ঝাঁপ দাও। কূলে বসে ঢেউ গোণার চেয়ে স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়াই প্রাণবন্ত পুরুষের কাজ।"

"ঝাঁপ! ওই একটা কথাই তুমি শিখেছ। যুদ্ধে ঝাঁপ দেবার অর্থ তবু বুঝি, কারণ যুদ্ধ সত্যি সত্যি বেধে গেছে। কিন্তু বিপ্লব। সে তো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।" মানস বলে।

"ও কী বলছ, দাদা! দেশের চারদিকে কত বড় বড় সভা হচ্ছে। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বুদ্ধুর মতো একঠাঁই বসে আছেন শুধু গান্ধীজী। বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে। তুমি তোমার গজদন্তের গম্বুজ থেকে নেমে এলে সারা অঙ্গে আগুনের আঁচ অনুভব করতে পারবে।" জুলি বলে।

"আপনিও অনুভব করতে পারছেন নাকি?" মধুমালতীকে সুধায় দত্তবিশ্বাস।

"কই, না। আমাদের এদিকে ছিল কৃষকপ্রজা আন্দোলন। সেটাও মিইয়ে গেছে। দিন দিন বাড়ছে মুসলমানদের গোঁড়ামি। ব্যারিস্টাররাও আচকান পায়জামা আর ফেজ পরে ঘুরছেন। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে হিন্দুদেরও গোঁড়ামি। বাবা সেদিন বলছিলেন, এতদিন কেবল একপক্ষই কমিউনাল ছিল, এখন আরেকপক্ষও সমান কমিউনাল হয়ে উঠেছে। পরিণাম ভেবে আমি তো ভয়ে শিউরে উঠছি। বিপ্লব যারা করে তারা সামনের দিকে তাকায়। এদের দৃষ্টি পেছনের দিকে। এরা ফিরে যাবে মধ্যযুগে। না, মিস্টার দত্তবিশ্বাস, আমি জুলির সঙ্গে একমত নই।" মিলি বলে।

"আমি লক্ষ করছি যে আপনারা দু'জনেই একসঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী থাকলেও আপনাদের পন্থা এক নয়।" দত্তবিশ্বাস বলে।

"মাঝখানে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে যে! আপনার উপরে আমার অভিমান আছে, আপনি বিলেত থেকে চিঠি নিয়ে এসে জুলিকে ছাড়িয়ে নিয়ে

গেলেন। যদিও পারলেন না বিলেত অবধি নিয়ে যেতে। ও বম্বে থেকে পুণা চলে গেল। আর আমি ওর বন্ধু হয়েও আটকা পড়ে থাকলুম। যতদিন না রোগে ধরে।” মিলির কণ্ঠে তিরস্কার।

“আপনার কথা কেউ আমাকে বললে তো চেষ্টা করতুম, মিস মুস্তাফী। তা ছাড়া আমার কেরামত তো মিস হ্যারিংটনের কাছ থেকে জুলির জন্যে সুপারিশপত্র জোগাড় করা। আর জুলির মায়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি যে জুলি বিলেত ফিরে যাবে। এসব তো আপনার বেলা খাটত না। তবে আরো একটা কথা ছিল, সেটা সকলের সামনে খুলে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আমার প্রত্যাশা ছিল জুলি আমার জীবনসঙ্গিনী হবে। সেটা তো আপনার বেলা ছিল না।” দত্তবিশ্বাস সসঙ্কোচে বলে।

“স্বার্থ! স্বার্থ!” মধুমালতী হেসে বলে, “নইলে কেউ বিলেত থেকে ছুটে আসে বন্দিনীকে মুক্ত করতে? এবারকার অভিযানটাও কি স্বার্থমূলক?” মিলি প্রশ্ন করে।

“খুলে যদি বলতেই হয় তবে আর ঢাকাঢাকি কেন? বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো নয়, দেশের উপরেও তেমন নাড়ীর টান নেই। আমি যতদিন বিলেতে থাকি ততদিন আপ-টু-ডেট থাকি। দেশে ফিরে এলে আউট-অভ-ডেট হয়ে যাই। তা হলে আসি কেন? আসি জুলিকে নিয়ে যেতে। সেটা ওর মায়ের চিঠি পেয়ে। সেবারেও পেয়েছিলুম। এবারেও পেয়েছি। মাসিমার ধারণা সরকার আবার বন্দীশিবির খুলতে যাচ্ছে। পুরনো বন্দিনীদের একে একে ধরবে। এখন তো লেডী হ্যারিংটন নেই। কে সুপারিশ করবে? আর কেনই বা করবে? যার জন্যে লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজে সীট রিজার্ভ করতে আমি হিমশিম খেয়ে গেলুম, অবশ্য খরচ জোগাতেন ওর মা, আমার মাসিমা, সে কিনা পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হলো। এর জন্যে, চৌধুরী, তুমিই দায়ী। তোমার উপরে আমার রাগ আছে। যাক, এবারেও আমি এসেছি জুলিকে বন্দীশিবির থেকে অগ্রিম উদ্ধার করতে। এবারেও আমার সেই একই প্রত্যাশা। কিন্তু যা শুনছি তাতে আমার আশাভরসা প্রায় নিঃশেষ। ও ঝাঁপ দেবার জন্যে তুই বাহু তুলে দাঁড়িয়েছে। ও যদি ঝাঁপ দেয় তো নির্ঘাত ডুববে। আমি কী করতে পারি! আমার জাহাজ এবারেও আমাকে একলা নিয়ে যাবে।” কম্পিত কণ্ঠে বলে দত্তবিশ্বাস।

“জুলি, এখনো সময় আছে।” মধুমালতী বলে।

“কিসের সময়? জাহাজের? তার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। ওরা

আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। বিপ্লবী জনতা আমাকে পাঁচিল ভেঙে উদ্ধার করবে। জীবনসঙ্গিনী হওয়া না হওয়া তার পরের কথা। বিলেত যাওয়ার কথাই ওঠে না। মা আমাকে ভালোবাসেন। সুকুমারদাও। কিন্তু আমি যে বিপ্লবের পথে অনেকদূর এগিয়েছি। সুকুমারদাকে আশা দিতে অক্ষম। "জুলি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে।

"সুকুমারদা," যুথিকা বলে, "আপনার উপরে মিস মুস্তাফীর অভিমান আছে, সেবার আপনি তাঁকেও জুলির সঙ্গে মুক্ত করেননি। এবারেও পুরনো বন্দীদের একে একে ধরবে শুনেছেন। তা হলে তাঁদের একজনকে শুধু কেন, আরেকজনকেও অগ্রিম উদ্ধার করতে হয়।"

'আরেকজনকে ?" দত্তবিশ্বাস আশ্চর্য হয়। "কে তিনি ?"

'বুঝতে পারলেন না ? আপনার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী।" যুথিকা হাসে।

"সে কী!" দত্তবিশ্বাস থতমত খায়। "উনি যে সাক্ষাৎ অগ্নিকন্যা। আমি নিজেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব যে!"

মধুমালতী যূথিকার উপর কপট কোপভরে বলে, "মিসেস মল্লিক, এ কী কৌতুক! উনি এসেছেন জুলিকে নিয়ে যেতে। তার বদলে আমাকে নিয়ে যেতে নয়। ওঁর সঙ্গে গিয়ে আমি করবই বা কী ? এটা কি দেশভ্রমণের সময় ?"

যূথিকা জিভ কেটে বলে, "আমারই ভুল হয়েছে। অভিমান শুনে আমাব মনে হলো হয়তো কোনো পূর্বসম্বন্ধ ছিল।'

"লেশমাত্র না। অভিমানটা এইজন্যে যে, জুলির কেমন একজন বান্ধব আছে. আমার কেন নেই। তার মানে এই নয় যে উনিই আমার বান্ধব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস. আপনি মহৎ কাজ করেছিলেন জুলিকে বন্ধনমুক্ত করে। কিন্তু আমাকে মুক্ত করা অত সহজ ছিল না, আমার কেসটা আরো খারাপ: বাবারও বহু সাহেব বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমার ওই এক কথা। অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওয়ার। যুদ্ধে আর ভালোবাসায় সবই ন্যায়সঙ্গত। আমাদের দেশের লোকের হাতে অস্ত্র থাকলে যেটার নাম হতো যুদ্ধ আমরা দু'চারজন গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করলে সেটার নামই হয় সন্ত্রাস। আমার কাজই ছিল অস্ত্র পাচার করা। জুলির মতো বোকা মেয়েদের হাত দিয়ে। ওরা আমাকে ধরেছিল ঠিকই, আটক করেছিল ঠিকই, ছাড়তেও যে চায়নি সেটাও ঠিক। তবে এখন আমার আর ওসব কাজে বিশ্বাস নেই। কিসে বিশ্বাস আছে সেকথা বলাও শক্ত। তবে একটু একটু করে আমি সৌম্যদার ব্রতের দিকেই ঝুঁকছি।" মধুমালতী বলে।

"সেই ভালো, সেই ভালো।" যূথিকা বুঝতে পারে যে সুকুমার আর মধুমালতী পরস্পরের জন্যে নয়। তবে সৌম্য আর মধুমালতী পরস্পরের জন্যে কি না বিধাতা জানেন। সে লক্ষ করে জুলি খুব খুশি হয় না সৌম্যদার ব্রতের দিকে মিলির একটু একটু ঝোঁক শুনে। সৌম্য সম্পূর্ণ অবিচলিত।

"এই মেয়ে!" জুলি বলে মিলিকে, 'তুমি কবে থেকে গান্ধীবাদী হলে? জানো ওটা আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়। ধনিকদের সঙ্গে যাদের এত দহরম মহরম তারা শ্রমিকদের শোষণের উপর একটু ত্যাগের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেই অমনি বনবে শ্রেণীশূন্য সমাজের উদ্গাতা। ওদের ভূমিকা ওই স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।"

"অন্তত সেটুকুও তো হোক। ওরা আট আটটা প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট স্থাপন করেছে। কেন্দ্রেও করতে পারে। এটা কি সামান্য কৃতিত্ব? ওদের পলিসি মেনে না নিলে ওরা ইস্তফা দিয়ে আবার লড়তে পারে। এটাও কি সামান্য শক্তিমত্তা? ওরা যদি স্বরাজ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে আমি তোমাদের দিকেই ঝুঁকব, জুলি। ইতিমধ্যে তোমরা কী করতে চাও, করো।" মধুমালতী বলে।

"ওদের আগেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। সারা দেশ আমাদের পেছনে। ওদের পেছনে গোটাকতক মন্ত্রিত্বলোভী আপসপ্রয়াসী।" জুলি নিঃসন্দেহ।

"কী সৌম্যদা, তুমি যে একেবারে চুপ।' যূথিকা বলে।

"আমিও গভীরভাবে চিন্তিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যুদ্ধ করতে, অরবিন্দ বলছেন যুদ্ধ করতে, রলাঁ বলছেন যুদ্ধ করতে, রাসেল বলছেন যুদ্ধ করতে। নাৎসী বা ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা বিনা শর্তে যুদ্ধ করবেন না। শর্তটা ভারতের স্বাধীনতা। অথচ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেলে যুদ্ধ করবেন এটাও তো শর্তাধীন স্বাধীনতা। বিনা শর্তে স্বাধীনতা ঢের বড়ো জিনিস। তার জন্যে সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহে মতি কোথায়? মতি যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হিংসাত্মক বিপ্লবে। তার থেকে দেশকে নিবৃত্ত না করলে সত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। সেই দুরূহ দায় বর্তেছে যাদের উপরে তাদেরই একজন আমি। জুলিকে আমি পুণা থেকে ভজাতে শুরু করি। সে সন্ত্রাসের পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু সত্যাগ্রহের পথ ধরে না। পুণাতে টিলক মহারাজের প্রভাব এখনো সক্রিয়। জুলি সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। ও যা বলছে টিলক মহারাজ বেঁচে থাকলে ওই কথাই বলতেন। ভাষাটা বোধহয় একটু অন্যরকম হতো। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লব এই দুই চরমপন্থার দুটোই হিংসাত্মক। আমরা গান্ধী-

পন্থীরা এই তুটোর থেকেই তফাতে থাকতে চাই। আমাদের সময় আসবে। তখন যেন জনগণকে প্রস্তুত দেখতে পাই।" সৌম্য ধীরে ধীরে বলে।

"তার মানে গান্ধীজী সহসা কিছু করবেন না।" মানস ভাষ্য করে।

"তার মানে গান্ধীজী আর কাউকে কিছু করতে দেবেন না।" জুলি আলাদা ভাষ্য করে।

"তোমরা কিছু করতে চাইলে গান্ধীজী বাধা দেবেন কী করে?" জানতে চায় মধুমালতী। "দিলে দেবে ব্রিটিশ রাজ।"

"বুঝতে পারলে না? কংগ্রেস যদি যুদ্ধে যোগ দেয় কংগ্রেস সরকারই আমাদের বাধা দেবে। আর কংগ্রেস সরকার তো গান্ধীজীরই আঁচলধরা। জনতা অবশ্য আমাদের পক্ষে। তবু জনতা এখনো গান্ধীজীকে মানে।" জুলি উত্তর দেয়।

"তা হলে তোমাদের বিপ্লবটা নির্ভর করছে গান্ধীজীর সম্মতির উপরে।" মানস জুলিকে তর্কে কোণঠাসা করে।

"কিছুদিনের জন্যে নির্ভর করবে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের আমরা মসনদ থেকে নামাবই নামাব। আবার আমরা আমাদের একজন নেতাকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদে বসাব। তিনি আসন থেকে নড়বেন না। নড়তে হবে বল্লভাচারী সম্প্রদায়কেই।" জুলি রসিকতা করে।

মধুমালতী দত্তবিশ্বাসকে বুঝিয়ে দেয় যে বল্লভাচারী সম্প্রদায় মানে কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃমণ্ডলী। বল্লভভাই পটেল যাঁদের সর্দার। মন্ত্রীরা তাঁদের আজ্ঞাবহ। কেন্দ্রীয় সরকারে রদবদল হলে তাঁরাই সেখানে অধিষ্ঠান করবেন।

দত্তবিশ্বাস বলে, "ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে বল্লভাচারীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ধরপাকড় শুরু হয়ে যাবে। আপনাকেও ধরে নিয়ে যাবে। আমি দেশে থেকেও আপনার মুক্তির জন্যে কলকাঠি নাড়তে পারব না। আমার কী স্বার্থ!"

"ওঃ! স্বার্থ কথাটা আপনার মনে লেগেছে বুঝি!" মধুমালতী দুঃখিত।

"লাগবে না? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর কাকে বলে? আমার কী গরজ বলুন দেখি, কেন আমি নিজের কাজকর্ম ফেলে জুলিকে বাঁচানোর জন্যে সাগর পারাপার করি? এতে খরচও কি কম নাকি? ওর মা আমার পাতানো মাসিমা। অমন মাসিমা পিসিমা আমার ইংরেজ ও ভারতীয় মিলে জনা দশ বারো আছেন। সকলেরই ফাই ফরমাস খাটি। লাভলোকসান হিসেবের মধ্যে ধরিনে। লাভও যে হয় না তা নয়। উচ্চতর সমাজে মেশবার সুযোগও মস্ত বড়ো একটা লাভ। এই যেমন ছিল লেডী হ্যারিংটনের বাড়ী অবারিত দ্বার। কতজনের জন্যে সুপারিশ

আদায় করেছি, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কেউ একটু বললেই এদেশেও আমার একটা হিল্লে হয়ে যেত। সেটা আমার ইচ্ছে নয়। আমি ওইদেশেই থেকে যেতে চেয়েছি। থেকে গেছিও। কারো সুপারিশে নয়। কাজ দেখিয়ে। তবে এটাও ঠিক যে কাজ দেখানোও যথেষ্ট নয়। কাকে কাকে চিনি, কে কে আমাকে চেনেন, কোন্ সমাজে মেলামেশা, এসবও গণনার মধ্যে পড়ে। তাই মাসিমা পিসিমাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তাঁরাই আমার অ্যাসেটস।" দত্তবিশ্বাস পরিহাস করে।

'তা হলে স্বার্থ কথাটা ভুল নয়। কী বলেন?" মিলিও পরিহাস করে।

"জুলির বেলা ওটা স্বার্থ নয়, ওটা আরেকটা শব্দ। দুই অক্ষরের। আন্দাজ করুন।" দত্তবিশ্বাস উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

"প্রেম।" মিলি মুচকি হাসে।

"ঠিক বলেছেন। মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।" সুকুমারও হাসে।

"অভিজ্ঞতা?" মিলি চমকে ওঠে। "অগ্নিকন্যা বলে যায় সুখ্যাতি তার ধারে কাছে আসতে সাহস পাবে কোন পতঙ্গ? তাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে বলে সেই যে আশঙ্কা সে আশঙ্কা থাকতে তার সঙ্গে ঘর বাঁধতে রাজী হবে কোন্ সুজন?"

"ট্র্যাজিক!" দত্তবিশ্বাস করুণ সুরে বলে, "ট্র্যাজিক। আপনাকে দেখে মনে হয় মূর্তিমতী একখানি ট্র্যাজেডী। একদিন না একদিন দেশ স্বাধীন হবে। তখন আপনার স্ট্যাচু তৈরি হবে। কিন্তু তাতে হয়তো দেখানো হবে আর একজন জোন অভ আর্ক। বেদনার নয়, বিজয়ের প্রতীক।"

"জোন অভ আর্ক কে? মিলি না আমি?" জুলি চেঁচিয়ে ওঠে। "তুমি কি ভুলে গেলে যে তোমাকে না আমি বলেছিলাম আমার আদর্শ জোন অভ আর্ক? ওর আদর্শ তো ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।"

"আচ্ছা, বেশ, তোমারও তো স্ট্যাচু বানানো হবে। তোমারটাই না হয় জোনের মতো হবে আর তোমার বন্ধুরটা লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো। হ্যাঁ, আমার মনে আছে তুমি চেয়েছিলে জোনের মতো হতে। তোমাকে এবার উদ্ধার করা গেল না। ওরা য' " তোমাকে জোনের মতো পুড়িয়ে মারে তা হলে কিন্তু আমি টেমস নদীতে ঝাঁপ' মধু জুলি।" দত্তবিশ্বাস শ্লেষের সঙ্গে বলে।

"ওসব কী অলক্ষুণে কথা হচ্ছে ডিনার টেবিলে বসে?" শাসন করে যুথি রেছি সে

"মাফ কোরো, যুথি। নদীতে ঝাঁপ দেব বলেছি, ডুবে মরব বলিনি।ত্তবিশ্বাস বীরপুরুষ নই, মরতে ভয় পাই।" দত্তবিশ্বাস বলে, "কিন্তু বিপ্লব একটা

অপেরা নয়, জুলি। প্রতিবিপ্লবীরা তোমাকে হাতে পেলে অমর করে দেবে। আমারা যারা বেঁচে থাকব তারা কি তোমার স্ট্যাচু দেখে সান্ত্বনা পাব ?”

“মিস্টার দত্তবিশ্বাস,” মধুমালতী বলে, “আপনি আজ আমাকে যে কমপ্লিমেণ্ট দিলেন আমি তার যোগ্য নই। বিপ্লব সম্বন্ধে এই সাত আট বছরে আমার ধ্যান ধারণা বদলে গেছে। বিপ্লবের পরে ক্ষমতা যাদের হাতে পড়বে তারা আমার শ্রেণীর লোক নয়, তারা আমার শ্রেণীটাকেই সমূলে উচ্ছেদ করবে। করলে আশ্চর্য হবার কী আছে ? আমাদের পাপের বোঝা জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। একদিন হিসাবনিকাশের দিন আসবেই। সেদিন যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বোঝা নামিয়ে দিই তবেই রক্ষা। নয়তো জোর করে বোঝা নামানো হবেই। কিন্তু আমার নিজের ভূমিকা ওতে কোথায় ? আমি আপনার লোকের রক্তপাত করতে পারব না। তারা ধনিকই হোক আর শ্রমিকই হোক। স্ট্যাচু যদি হয় তো জুলিরই হবে, আমার নয়।”

“আপনার লোকের রক্তপাত করতে কি আমরাও চাই, মিলি ?” জুলি প্রতিবাদ করে। “ওরা যদি পা দিয়ে ভোট দেয় তা হলে ওদের ধরতে বাঁধতে মারতে হবে কেন ? হা হা হা হা ! বুঝতে পারলে না মর্ম ? লেনিন কী বলেছিলেন ? জমিদাররা পা দিয়ে ভোট দেবে। মানে, পালাবে। তখন কৃষকরা জমি দখল করবে। এটাও কি একপ্রকার গণতন্ত্র নয় ? এই গণভোট ?”

জুলির হাসিতে আর কেউ যোগ দেয় না। এর নাম রেভোলিউশন মেড ইজি। সে আপন মনে বকে যায়, “যে ঝাঁটা দিয়ে আমরা ইংরেজকে তাড়াব সেই ঝাঁটা দিয়ে রাজারাজড়াদেরও। সেই ঝাঁটা দিয়ে জমিদারদেরও। সেই ঝাঁটা দিয়ে পুঁজিপতি-দেরও। তবে বুর্জোয়াদের সবাইকে তাড়ানো একই কালে হতে পারে না। রাজ্য চালাবে কে ? কলকারখানা চালাবে কে ? দোকান বাজার চালাবে কে ? তবে ওদের মাইনে কমাব। মানসদা, আপনাকেও অল্পে সন্তুষ্ট হতে হবে।”

“চল হে, মল্লিক, আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে। সেখানে তোমার গুণের কদর হবে। যেদেশে মুড়ি মিছরির একদর সেদেশে থাকতে নেই।” দত্তবিশ্বাস বলে।

“জুলি, তোমার ধারণা আমরা আমাদের দায়িত্বের তুলনায় অত্যধিক পাই।

…মরা যদি আমাদের দায়িত্ব কমিয়ে দাও আমরাও কম নিতে রাজী হব।” মানস

গরজ বলু…

…স দেয়।

পারাপার ক…

…আমরা তার জন্যে তৈরি হচ্ছি, বোন। স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে বিস্তর

অমন মাসিম…

…খরচ করতে হয়। তোমরা আমাদের স্ট্যাটাস খাটো করলে আমরাও বেঁচে

সকলেরই

…। যূথিকা বলে।

হয় না

যেমন f…

"স্ট্যাটাস সকলেরই সমান হবে। কৌশুলী আর মোক্তার, সার্জন আর হাতুড়ে সব সমান। বুর্জোয়াদের দেক্লাসে করতে হবে। মানে, শ্রেণীচ্যুত। ওদের মারব না, ধরব না, তাড়াব না। শুধু নিচের শ্রেণীতে নামিয়ে দেব। যেমন স্কুলের ছাত্রদের করা হয়। অমনি করেই শ্রেণীশূন্য সমাজ গড়ে উঠবে।" জুলি উৎসাহের সঙ্গে বলে।

মল্লিক, তুমি কি এমন দেশে থাকবে না আমার সঙ্গে যাবে? আমি একদণ্ডও তিষ্ঠতে চাইনে।" দত্তবিশ্বাস উদ্বেগ প্রকাশ করে।

'আপনাকে জুলি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, মিস্টার দত্তবিশ্বাস। আপনি ওর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। ওরা আত্মীয়রা সবাই ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পদস্থ অফিসার, কোম্পানীর ডাইরেক্টর। ওর শ্বশুর রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বিপ্লব ওঁদের শ্রেণীচ্যুত করুক তো আগে। তারপরে আপনাকে করবে। আপনি নিজের দেশেই থেকে যান। কেন এই যুদ্ধের মুখে ওদেশে যাবেন? আমি যদি বলি, যেতে নাহি দিব?' মধুমালতী ওর চোখে চোখ রাখে।

"জুলি আমাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না। আপনি কি আমাকে রক্ষা কবতে পারবেন। আপনি কি আমার তারিণী?" দত্তবিশ্বাস আবেগের সঙ্গে বলে।

"আপনি আমাকে অগ্রিম উদ্ধাব করবেন।" মিলি হঠাৎ বলে ওঠে।

দত্তবিশ্বাস হকচকিয়ে যায়। "কী করে তা সম্ভব? আমি তো দেশ ছেড়ে চললুম।"

'আপনাকে দেশে থেকে যেতে বলব না। কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি ভাবছি আমিই বিদেশে যাব। তা হলে তো কেউ আমাকে জেলে পুরতে পারবে না। না, সেখানেও আটক করবে?' মিলি কী জানি কী ভেবে বলে।

'আরে না। ইংলণ্ডে কাউকে বিনা বিচারে আটক করে না। এক যদি না সে যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের লোক হয়। যুদ্ধটা তো জার্মানদের সঙ্গে। আপনি তো জার্মান নন। আপনি যদি জেল এড়াতে চান তো ইংলণ্ডেই চলুন।" দত্তবিশ্বাস আহ্বান করে।

"দেখি মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে। মাসোহারা তো ওঁদেরকেই পাঠাতে হবে।. কখনো ওদেশে যাইনি। আপনার সঙ্গেও পরামর্শ করতে চাই।" মধুমালতী বলে।

"আনন্দের সঙ্গে পরামর্শ দেব। জুলির জন্যে যে ব্যবস্থা করেছি সে ব্যবস্থা আপনারই কাজে লাগবে, ও যদি না যায়, আপনি যদি যান।" দত্তবিশ্বাস জুলির দিকে তাকায়।

"ঢং ! ঢং ! এটা একটা ঢং !" জুলি অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, "মিলি যাবে বিলেত। ইংরেজরা যার জাতশত্রু।"

'এটা শত্রুতার সময় নয়। ওরা বিপন্ন। ওদের বিপদ কেটে যাক, আবার শত্রুতা করা যাবে। পড়াশুনা তো তেমন কিছু করিনি। বেডফোর্ড কলেজে জায়গা পাই তো জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়ে নেব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস আমাকে নেবে তো ?" মিলি সুধায়।

"নেবে না কেন ? আপনার পলিটিকাল রেকর্ড নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না। অ্যাকাডেমিক রেকর্ডটাই দেখবে। সঙ্গে কিছু রেফারেন্সও দরকার। সেটা আমি যেমন করে পারি ম্যানেজ করব। আপনার বাবার ওয়ার রেকর্ডও কাজে লাগবে। মেসোপোটেমিয়ায় টার্কদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আপনার অ্যাডমিশন হয়ে গেছে বলে ধরে নিন। কালকেই টমাস কুককে লেখা যাবে প্যাসেজের জন্যে আর বেডফোর্ড কলেজকে অ্যাডমিশনের জন্যে। যদি আপনার গুরুজন অনুমতি দেন।" দত্তবিশ্বাস আগ্রহ দেখায়।

"পাশপোর্ট নিয়ে গণ্ডগোল বাধবে না ?" যূথিকা সুধায়।

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি শেফার্ডকে বোঝাব " মানস আশ্বাস দেয়। শেফার্ড সুপারিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাশপোর্ট মিলবে।"

"পুলিশ থেকে বাধা দেবে না ?" যূথিকা প্রশ্ন করে।

"আমি জাফর হোসেনকেও বলব। জাফর তো প্রায়ই মুস্তাফীকে কল দেয়। ওঁর মেয়ের জন্যে এক লাইন লিখতে পারবে না ?" মানস অভয় দেয়।

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, মিলি, তুমি কি সত্যি এ সময় দেশ ছেড়ে যেতে চাও ? তোমার সেবাপ্রতিষ্ঠান চালাবে কে ?"

"আমি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যাব, সৌম্যদা। দেশে তো আমি কারো সঙ্গেই পা মিলিয়ে নিতে পারছিনে। এক আপনার সঙ্গেই কতকটা মেলে। কিন্তু আপনারা কবে সত্যাগ্রহ করবেন তা আপনারাও জানেন না। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে। না হলো বিয়ে। না একটা কেরিয়ার। আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা কি ভাবব না ?" মিলির কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।

"ওঃ তোমার সেই অভিজ্ঞতা !" জুলি টিটকারি দেয়।

"হ্যাঁ সে অভিজ্ঞতাও জীবনের সম্পদ। কেন কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাবে না ? কেন প্রপোজ করবে না ? তোমার কাছে প্রপোজ করবে। তুমি প্রত্যাখ্যান করবে। আমি অগ্নিকন্যা হতে চাইনে, আমি স্ট্যাচু চাইনে, আমাকে বাঁচতে দাও।"

মিলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দত্তবিশ্বাসের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়।

"জুলি ওর শেষকথা বলে দিয়েছে। আমি এখন ফ্রী।" দত্তবিশ্বাস মিলির দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়। দৃষ্টিবিনিময় হয়ে যায়।

মানস তা লক্ষ করে টিপে টিপে হাসে। সুকুমারের উদ্দেশে গেলাস তুলে বলে, "বেস্ট, অভ্ লাক।"

সুকুমার উৎসাহের চোটে দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে চমকে দেয়। "আমার একটু নাচতে ইচ্ছে করছে। মল্লিক, চল হে আমরা ক্লাবে ফিরে যাই। নাচের পার্টনার হতে অনুরোধ করি মিস্ সিন্‌হা ও মিস্ মুস্তাফীকে।"

মানস হো হো করে হেসে বলে,"তোমার পার্টনার কে হবেন জানি। কিন্তু আমার পার্টনার তো জুলি নয়, জুঁই। হায়! নাচতে আমরা ভুলে গেছি।"

সুকুমার অপ্রস্তুত হয়ে নিজের আসনে আছাড় খেয়ে পড়ে। "কেন যে মানুষ মরতে এদেশে আসে? কী সুখ পায় বেঁচে? মল্লিক, তুমি এদেশে ফিরে এসে প্রাণে বেঁচে আছো, কিন্তু জীবনটাকেই হারিয়েছ। তোমার জন্যে আমি সত্যিই মর্মাহত।"

। পাঁচ ।

যুথিকার এক চোখ ছিল জুলির উপরে, আরেক চোখ মিলির উপরে। মিলির মুখে একটুখানি গোলাপী আভা। জুলির মুখ টকটকে লাল।

"এই মেয়ে!" জুলি বলে মিলিকে, 'বিপ্লবের দিন তুমি থাকবে বিলেতে। শত্রুপক্ষের খাস তালুকে। এর নাম কী, জানো? বিশ্বাসঘাতকতা। এর সাজা কী, জানো? ফায়ারিং স্কোয়াড।"

মিলি শিউরে ওঠে। "জুলি! তুমি দেখছি এখন থেকেই মারমুখো। লেনিন যখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করতেন তখন তুমি থাকলে তাঁকেও ভয় দেখাতে। আমিও যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা করব না তা নয়। বিপ্লবীরা বরাবরই ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে ও পেয়েছে। মনে করো আমিও যাচ্ছি আশ্রয় নিতে। এদেশে থাকলে তো নির্ঘাত জেল।"

'জেল।" জুলি অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, "জেল! তুচ্ছ জেল। তাকেই এত ভয় যে তুমি জাহাজে চড়ে পালাবে। কেন, আমি কি বলিনি যে জনতা এসে জেল ভেঙে উদ্ধার করবে? চারদিকে রব উঠবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর তখন কিনা তুমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুঁথি পড়ছ।"

"ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দিন লেনিনও তো পেট্রোগ্রাডে ছিলেন না। তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে। জার্মান শত্রুরাই ওঁকে ওদের স্পেশাল ট্রেনে করে রাশিয়ায় পৌছে দেয়। এ রকম যে হবে তা কি তুমি সেদিন থাকলে জানতে? জানলে ক্ষমা করতে? তুমি বলতে লেনিন জার্মানদের চর। ফায়ারিং স্কোয়াড ডাকতে। বিপ্লব যেদিন হবে সেদিন যদি আমি বিদেশে থাকি তবে ওরাই আমাকে ওদের স্পেশাল প্লেনে করে ভারতে পৌছে দেবে। চর বলবে কতক লোক, কিন্তু পরে দেখবে আমারই জিৎ।

কার সাধ্যি আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করায়।" মিলি জলে ওঠে।

"সব বিশ্বাসঘাতকেরই ওই একই যুক্তি। সবাই যেন এক একটি লেনিন। তার চেয়ে সোজাসুজি স্বীকার করলেই পারো যে তুমি বিপ্লবের ভয়ে পলাতক। ভয় পাবারই কথা। ওই যে একজন পাতি বুর্জোয়া উনি দশ বছর আগে থেকেই পলাতক হয়ে লণ্ডনে বসে আছেন।" জুলি দত্তবিশ্বাসের উপর কোপদৃষ্টি হানে।

"দশবছর কেন বলছ, জুলি? বারো বছর।" দত্তবিশ্বাস শুধরে দেয়।

"একই কথা। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। তবে তোমাকে আমরা বিশ্বাস-ঘাতক বলব না। তুমি বিপ্লবীদের একজন ছিলে না। নিতান্ত এক সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষ। তোমার স্বপ্ন নিচের শ্রেণীতে নামা নয়, উপরের শ্রেণীতে ওঠা। ইংলণ্ডই তোমার উপযুক্ত দেশ। জাতকে জাত ওরা তোমারই মতো স্নব। তোমার তো গার্ল ফ্রেণ্ডের অভাব নেই। মিলিকে নিয়ে তুমি করবে কী? বিয়ে?" জুলি রাগতভাবে বলে।

"বিয়ে!" দত্তবিশ্বাস গদগদভাবে বলে, "আমার মতো অভাগার তেমন সৌভাগ্য কি হবে! আমি চাইলে কী হবে, উনি রাজী হলে তো!"

"ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার, জুলি। এখন থেকে আমি আমার হাতের তাস দেখাব না। খেলবার সময় হলে খেলব। মিস্টার দত্তবিশ্বাস, এখন থেকেই ধরে নেবেন না যে আমি আপনাকে বা আর কাউকে বিয়ে করব। বা আদৌ বিয়ে করব। কিন্তু করতে চাইলে আমাকে রুখবে কে? বিপ্লবী নায়িকারা কি বিয়ে করেন না? রোজা লুকসেমবুর্গ কি বিয়ে করেননি? তাঁর স্বামীটি যে বিপ্লবী ছিলেন তা নয়। বিশ্বস্ত হলেই যথেষ্ট। সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী পুরুষও কি বিশ্বস্ত হতে পারে না? আমার কাছে একজন বিশ্বস্ত পুরুষের মূল্য অসীম। জুলির প্রতি দশ বারো বছর বিশ্বস্ত রয়েছেন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি যে এটি একটি দুর্লভ রত্ন।" মিলি প্রকারান্তরে স্বীকার করে যে এমন রত্ন পেলে সে আঁচলে বেঁধে রাখবে।

যূথিকা বলে, "সৌম্যদা, আপনার কী মনে হয়? আমার তো মনে হচ্ছে জুলি মনঃস্থির করতে পারছে না সুকুমারদাকে ছাড়বে, না ধরে রাখবে।"

"মনঃস্থির করা শক্ত। সুকুমারকে প্রত্যাখ্যান করলে সুকুমার মধুমালতীকে বিয়ে করবে। তখন লোকে বলবে সুকুমারই মঞ্জুলিকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কী অপমান! অথচ সুকুমারের কী দোষ।" সৌম্য অভিমত দেয়।

"না, সৌম্যদা, তা নয়। সুকুমারদাকে আমি কি কোনোদিন আশা দিয়েছি যে

আজ নতুন করে প্রত্যাখ্যান করলুম? উনি অন্য কাউকে বিয়ে করুন, আমি দারুণ খুশি হব। কিন্তু মিলি! ও যে আমার প্রিয় বান্ধবী। ও যদি অন্য কাউকে বিয়ে করত তা হলে আমি পরম আনন্দিত হতুম। কিন্তু সুকুমারদাকে! না, না, এটা ভাবা যায় না। এ বিয়ে যদি হয় তবে আমি জানব যে মিলি বা সুকুমারদা কেউ আমার বন্ধু নয়। ওরা আমার সঙ্গে বন্ধুতার সুযোগ নিয়েছে।" জুলি বিষণ্ণ স্বরে বলে।

"অপূর্ব মনস্তত্ত্ব।" মানস মন্তব্য করে। "এ না হলে নারী! তুমি নিজে বিয়ে করবে না। দশবছর কেন, এগারো বছর ধরে চলেছে সাধ্যসাধনা। তবু মন গলছে না। যেই তৃতীয় এক ব্যক্তি মাঝখানে এল অমনি দেখা দিল চিরন্তন ত্রিভুজ। মিলি আর সুকুমার, তোমরা তাড়াতাড়ি মনঃস্থির করে ফ্যালো। মিলির যা রেকর্ড, জুলির আগেই মিলি বন্দী হবে। জুলি হয়তো ফেরার হয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাবে। কিন্তু মলির কি সে সামর্থ্য আছে! শরীর শক্ত নয়। দত্তবিশ্বাস, তুমি কালকেই ওর মা-বাবার সামনে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কোরো। ওঁরা যদি রাজী হন তা হলে শুভকর্মটা সমুদ্রযাত্রার পূর্বেই সমাধা হবে। তার পর লম্বা হানিমুন।"

"আহা, অত তড়িঘড়ি কেন? আমাকেও একটু মনঃস্থির করতে সময় দিন। জুলিকে বঞ্চিত করে তার বরকে কেড়ে নিয়েছি বলে যে অপবাদ রটবে তার প্রতিকার না করেই যদি বিলেত চলে যাই তবে ওটা পলায়নের মতোই দেখাবে। জুলি, ভাই, তুমি আশ্বস্ত হও। বিয়ে আমি রাতারাতি করব না। পাত্রটিকে চিনলুম কবে যে চোখ বুজে বিয়ে করব? চিনতেও সময় লাগবে। না সমুদ্রযাত্রার পূর্বে শুভকর্ম নয়। সমুদ্রযাত্রা আমি আত্মরক্ষার জন্যেই করব। মিস্টার দত্তবিশ্বাসকে সাথী পাওয়া যাবে বলে নয়। বিয়ের কথাবার্তা চলবে, কিন্তু বিয়েটা কোথায় ও কবে হবে, আদৌ হবে কি না, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। জুলিকেও পুনর্ভাবনার জন্যে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হবে। সে যদি চিঠি লিখে জানায় যে সে তার সুকুমারদাকে বিয়ে করতে রাজী তা হলে আমি তক্ষুনি সরে দাঁড়াব। বন্ধুর বরকে চুরি করার অপবাদ আমি সহ্য করব না। আমি তো আশা করছি জুলি নিজেই একদিন আমাদের বিয়েতে মত দেবে। যখন বুঝবে যে আমরা ওর সুখের অন্তরায় নই।" মধুমালতী ধীর গম্ভীরভাবে বলে।

মানস হেসে বলে, "তবে সমুদ্রবক্ষে লম্বা হানিমুন নয়, দীর্ঘ কোর্টশিপ। দত্তবিশ্বাস, আই এনভি ইউ।"

একথা শুনে যূথিকা পালটা দেয়, "মিস মুস্তাফী, আই এনভি ইউ।"

জুলির অবস্থা তখন ফুটো বেলুনের মতো। সৌম্যদার দিকে হেলে ওর কানে কানে বলে, "বিধবার বিয়ে কি পাপ?"

"কে বলে পাপ? মহাত্মাজী তো আজকাল বালবিধবা দেখলেই তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ তো ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বালবিধবার সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজে তো এটা বহুদিন থেকেই চলতি। তুমি ব্রাহ্মসমাজেই জন্মেছ। হিন্দুমতে যদিও তোমার বিয়ে। বিদ্যাসাগর মশায় তো বিধান দিয়ে গেছেন যে হিন্দুর মেয়েরও আবার বিয়ে হতে পারে। তিনি নিজের ছেলের বিয়ে দেন এক বিধবা কন্যার সঙ্গে। না, জুলি, পাপ নয়। তোমার ওই মিথ্যে পাপবোধ কাটিয়ে ওঠ। মিলি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তবে কোর্টশিপ যদি বেশীদিন গড়ায় সুকুমার আর পিছু হটবে না। হটলে সেটা অনারেবল হবে না।" সৌম্য পরামর্শ দেয়।

"অনারেবল যদি বল, আমার পক্ষেও কি অনারেবল হবে আমি যদি দশবছর বিধবার মতো থেকে হঠাৎ সধবা সাজি? এয়োরা কেউ নেবে আমাকে তাদের দলে? লোকে মুখ ফুটে না বলুক মনে মনে বলবে না অসতী? বিপ্লবী দাদারাও আমার সতীত্বে সন্দেহ করবেন। রানী কমলিনীর মতো আমাকেও আত্মগোপন করতে হবে বিলেতে।" জুলি বলে।

'বিলেতে আমরা তো তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতুম।" সৌম্য বলে।

"বিলেতের আবহাওয়ার গুণে। এদেশে থাকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে কি না অপ্রমাণিত। এদেশে সধবারা বিধবা হয়, কিন্তু বিধবারা সধবা হয় না। হলে আড়ালে আবডালে থাকে। প্রকাশ্য সভাসমিতিতে নামে না। আমাকে তা হলে দেশের কাজ ছাড়তে হয়। বিপ্লবের দিন আমারও কি কোনো ভূমিকা থাকবে না?" জুলি জিজ্ঞাসা করে।

"থাকবে না কেন? নিশ্চয় থাকবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়। "লোকে শ্রদ্ধাও করবে। বীরত্বের পরিচয় যদি পায়। সধবা কি বিধবা এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন যাঁরা তাঁরা সমাজপতি শ্রেণীর লোক। তাঁদের বিরুদ্ধেই তো বিপ্লব।"

"কী আশ্চর্য! তুমিও বিপ্লবে বিশ্বাস করো!" জুলি উৎফুল্ল হয়।

"কেন করব না? আমরাও তো বিপ্লবের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। আমাদেরও ভরসা জনগণ। কিন্তু তারা প্রাণ বিসর্জন করবে, প্রাণ নাশ করবে না। তোমরা মেরে মরবে, আমরা মারব না, মরব। আমাদের সাধনা আরো কঠোর। যদি সিদ্ধিলাভ করি আমাদের সিদ্ধিও হবে আরো গৌরবময়। তোমাদের বীরত্বের আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু আমাদের বীরত্ব আরো উচ্চ স্তরের।" সৌম্য বিনম্রভাবে বলে।

"তোমাদের পথ সময়সাপেক্ষ। আমাদের হাতে অত সময় নেই, সৌম্যদা।

সুযোগ হাতছাড়া হলে আর ফিরবে না। অবশ্যই কিছু রক্তপাত হবে। সেটা দু'তরফা। তার জন্যে আমরা দুঃখিত। ইংরেজদের মহত্ত্বের পরিচয়ও তো আমি পেয়েছি। তা বলে কি ওদের দাসত্ব আর সহ্য হয় ?" জুলি আবার তেজস্বিনী।

ডিনারের পর যুথিকা বলে, "দশবছর পরে চারজন একত্র হয়েছ তোমরা। আবার কবে হবে কে জানে! এস, চারজনে মিলে তাস খেলো।"

সৌম্য বলে, "আমি তাস খেলিনে। আমাকে বাদ দাও।"

জুলি বলে, "আমি তাস খেলি, কিন্তু আজ আমার সে মুড নেই। কেন, বুঝতেই পারছ।"

তখন দত্তবিশ্বাসের পার্টনার হয় যুথিকা, আর মানসের পার্টনার মধুমালতী। ব্রিজ খেলায় দত্তবিশ্বাসের ওস্তাদি আছে। চড়া স্টেকে খেলে। হারে যত তার চেয়ে জেতে ঢের বেশী। ওর আয়ের একটা প্রধান উৎস হলো ব্রিজ। আজ কিন্তু স্টেক রাখতে মানা।

"মানা! মানা। সব কিছুতেই মানা। স্টেক রাখতে মানা। বিষ খেতে মানা। তবে আমি খেল্ দেখাব কী করে?" দত্তবিশ্বাস অনুযোগ করে।

"আমরা খেল্ দেখতে চাইনে। খেলা করতে চাই।" মধুমালতী উত্তর দেয়।

"নইলে আজ দুই পরিবারের সঞ্চয় লুট হয়ে যায়।" যুথিকা হুঁশিয়ারি দেয়।

"এক পরিবারের লুটের মাল অর্ধেকটা ফিরে আসবে। কিন্তু অপর পরিবারের অর্ধেকটা ফিরবে কি না কে বলতে পারে। সব নির্ভর করছে সেই পরিবারের গুরুজনের সম্মতির উপর।" মানস এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত।

মধুমালতী আরক্ত হয়। "ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।"

জুলির ভালো লাগছিল না। সে বলে, "চলো, সৌম্যদা, বাইরে গিয়ে বসা যাক। তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে। কবে আবার দেখা হবে কে জানে।"

বিশাল বারান্দার একপ্রান্তে ওরা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আকাশের দিকে মুখ। আকাশে তখন চাঁদ নেই, নক্ষত্রের মেলা। তারাগুলো এত স্পষ্ট আর এত কাছে যে হাত বাড়ালে গাছ থেকে পেড়ে আনা যায়।

"রোজ রাত্রে আমি আকাশের তলায় শুই। নক্ষত্রলোকের সঙ্গ পাই। ভুলে যাই পৃথিবীর দুশ্চিন্তা। যুদ্ধ বলো, বিপ্লব বলো, সবই তো সাময়িক।" সৌম্য বলে।

"ইতিহাসের সমস্তটাই তো সাময়িক, সৌম্যদা। মহাকালের তুলনায় তিন হাজার বছরের ভারত ইতিহাস তো কালকের দিনের খবরের কাগজ। তা বলে কি তার গুরুত্ব কিছু কম? আমরাও ইতিহাস তৈরি করে যাচ্ছি। কালকের দিনের জন্যে। নইলে আমার জীবনের মূল্য কী?" জুলি জানতে চায়।

"আমারও সেই এক জীবনজিজ্ঞাসা। কিন্তু তোমার মতো আমি ইতিহাসের জীব নই। আমি টাইম-স্পেসের ভিতরেও আছি, তার বাইরেও আছি, আমি অমৃতের সন্তান। একদিন তোমারও এই উপলব্ধি হবে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"তোমার সঙ্গে দেখা হলে জীবনজিজ্ঞাসার কথা ওঠে। কথা ওঠে নীতি জিজ্ঞাসার। আমিও কত বড়ো হয়ে যাই। কিন্তু তোমাকে তো সব দিন পাইনে। পাবও না। যাদের সঙ্গে মেলামেশা তারা কেউ সময়ের উর্ধ্বে উঠতে চায় না। পারেও না। আমিও তাদেরই একজন। তোমার কাছে প্রথম ও শেষ বস্তু অমৃত ও অমৃতের সন্ধান। যাতে তোমাকে অমৃত না করবে তা নিয়ে তুমি কী করবে? আমার কাছে ওসব নিছক তত্ত্বকথা। মানুষের দুঃখ দুর্দশাই আমাকে বিচলিত করে। আমি চাই এমন কিছু ঘটুক যাতে মানুষের সব দুঃখদুর্দশা এক রাত্রের প্লাবনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।" জুলি কাতরভাবে বলে।

"দুলালেরও সেই ধ্যান ছিল। দুলাল দেখছি তোমার মধ্যে বেঁচে আছে। ওর কথা কি তোমার মনে পড়ে?" সৌম্য অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করে।

"পড়বে না? ওঁর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়েছিল। যদিও সেটা ওঁর মতে একরকম শিকল পরানো। সোনার শিকল। উনি যেন ইচ্ছে করেই শিকল কাটিয়ে গেলেন। সব মনে আছে, সৌম্যদা! কিন্তু সব ভুলে যেতে চাই। তাই তো কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। জানি সাময়িক। তবু মূল্যবান।" জুলি তার মনের ঢাকা খোলে।

"দুলাল বিয়ে না করেই বিলেত যেতে চেয়েছিল, ওর বাবা তাতে নারাজ। তিনি আর সব বিষয়ে একেলে হলেও ওই একটি বিষয়ে সেকেলে। তাঁর ধারণা বিয়ে না করে বিলেত গেলে ছেলে মেম বিয়ে করে ঘরে ফিরবে। দুলাল বিলেত যাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল, চাপে পড়ে বিয়ে করল। কিন্তু ওর বিবেক ওকে একমুহূর্তও সোয়াস্তি দিল না। তোমার উপরে ওর বিরাগ ছিল না, ছিল বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাব। বিবাহটা ও মেনে নিতে নারাজ। বাপ-বেটার গৃহযুদ্ধে তুমি হলে উলুখড়।" সৌম্য দরদের সঙ্গে বলে।

"আমি কেমন করে জানব বিয়েতে ওঁর অনিচ্ছা ছিল? জানলে কি আমি বিয়ে করতে রাজী হতুম? যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওঁর বাবারও তো

অনুশোচনার অন্ত নেই। আমাকে মোটা মাসোহারা পাঠান। ফিরিয়ে দিতে চাই, কোন স্বাদে নেব? কিন্তু না নিলে তাঁর জীবন দুর্বহ হবে। কাজ কী ওঁকে আরো কষ্ট দিয়ে? নিই, কিন্তু নিজের জন্যে নয়। কমরেডদের প্রয়োজন মেটাই।" জুলি সাফাই দেয়। তার বিবেকের সাফাই।

"দুলাল চেয়েছিল স্বামীস্ত্রীর মিথ্যা অভিনয় থেকে মুক্তি পেতে ও মুক্তি দিতে। তোমাকে ও মুক্ত করে দিয়ে গেছে, জুলি। তুমি সমাজের চোখে বিবাহিতা, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে অবিবাহিতা। কেন তবে সম্পর্কটার জের টেনে যাচ্ছ? মাসোহারা নেওয়াটাও জের টেনে চলা। তোমার শ্বশুর অবশ্য তাঁর পুত্রের সঙ্গে সম্পর্কের জের টেনে চলেছেন। সেটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পক্ষে মিথ্যার অভিনয়। ওঁর মনে যাতে আঘাত না লাগে সেকথা ভেবে তুমি ওঁর টাকা নিচ্ছ, কিন্তু নিজেও বাঁধা থাকছ। দ্বিতীয়বার বিবাহে আমি তো কোনো নীতিগত বাধাই দেখছিনে। তুমি যদি সুকুমারের প্রস্তাবে রাজী থাক তবে এখনো সময় আছে। কাল কিন্তু থাকবে না। কালকেই মিলির জন্যে বাস রিজার্ভ করা হবে। অবশ্য ওর মা বাবা যদি সম্মতি দেন।" সৌম্য অনুভব করে জুলির জন্যে কত বড়ো শক অপেক্ষা করছে।

"সৌম্যদা, তোমার কাছে আমার গোপন কিছু নেই। তোমাকেই আমি সব চেয়ে বিশ্বাস করি।" বলতে বলতে জুলির গলা ধরে আসে। "সুকুমারদা আমাকে আজ যে শক দিয়েছেন তা আমাকে থ করে দিয়েছে। আমি যদি ওঁকে বিয়ে না করি উনি মিলিকে বিয়ে করবেন। মিলি যদিও ঝট করে কথা দিচ্ছে না তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি ও ভিতরে ভিতরে উল্লসিত। তুমি দেখবে কালকেই ও বাগ্‌দান করবে। বিয়েটা হয়তো এদেশে হবে না, কিন্তু ওদেশে হতে কতক্ষণ? তার মানে সুকুমারদাকে আমি চিরকালের মতো হারাচ্ছি। ওঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়, কিন্তু বিয়ে তো করেননি আর কোনো মেয়েকে। অপেক্ষা তো করে এসেছেন আমার সম্মতির জন্যে। এগারো বছর তো একটা যুগ বললেও চলে। প্রস্তাবও তো করলেন এই নিয়ে তিনবার। একবার বিলেতে, একবার বন্দীশালা থেকে মুক্তির পর, একবার এই সম্প্রতি পদ্মার স্টীমারে। জানি উনি আমার অশেষ উপকার করেছেন ও করবেন। প্রতিদানে আমারও তো কিছু করণীয় আছে। কিন্তু সে কি বিয়ে? না, দাদা, আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। বিয়ে আমি কাউকেই করব না। আমি ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুর হচ্ছে সিঁদুরে মেঘ। সিঁদুর পরতে আমি ডরাই।"

"তা হলে তুমি মিলির জন্যে সুকুমারকে ছেড়ে দাও। মিলির হাতে সুকুমারকে তুলে দাও। সুকুমারের প্রতি সেটাই তোমার করণীয়। সেটাই সব চেয়ে বড উপকার। জানি তোমার মন এর জন্যে তৈরি ছিল না। হঠাৎ মিলির সঙ্গে সুকুমারের সংযোগ তোমাকে চমকে দিয়েছে। তুমিই তো একজনকে নিয়ে এলে আরেকজনের বাড়ী। তুমিই তো ওদের আলাপ করিয়ে দিলে। তোমারই তো এ ঘটকালি। তোমারই তো খুশি হওয়া উচিত যে মিলির মতো বান্ধবীর একটি বর জুটল। আর সুকুমারের মতো বন্ধুর একটি বৌ জুটল। তার পর ওদেব ভাগ্য ওদের হাতে। মিলি ওদেশে না যেতেও পারে, সুকুমার এদেশে থেকে যেতেও পারে, মুস্তাফীদের একজন ঘরজামাই হলে ভালো হয়, যার হাতে ওঁরা রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব সঁপে দেবেন। হ্যাঁ, বলেছেন আমাকে একথা। অনেকদিন আগে। তখন আমিই বোধ হয় ছিলুম তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু এ-মহাদেবের তপোভঙ্গ ও-পার্বতীর অসাধ্য। মিলি যদিও হিংসার পথ থেকে বেশ কিছুদূর সরে এসেছে।" সৌম্য মুখ টিপে হাসে।

"তবে তুমিই ওকে বিয়ে করে পুরোপুরি অহিংসাবাদী করো না কেন? গান্ধীজীর যেমন কস্তুরবা তোমার তেমনি মধুমালতী দেবী।" জুলি সীরিয়াসভাবে বলে। "তা হলে তো আমার কোনো খেদই থাকে না।"

"কেন, খেদ তোমার কিসের? চির অনুগত জনকে হারাচ্ছ বলে? এগারো বছরের সম্পর্ক কাটিয়ে উঠতে পারছ না বলে?" সৌম্য সহানুভূতির সঙ্গে বলে।

"না, মিলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। তুমি আর মিলি রাজযোটক। মিলি আর সুকুমারদা সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতু দিয়ে গড়া।" জুলি সুনিশ্চিত।

"মুস্তাফীরা ভালো করেই জানেন যে জেলে যাবার জন্যে আমি সদলবলে প্রস্তুত হচ্ছি। মিলি যদি আমার কস্তুরবা হয় তাকেও জেলে যেতে হবে। ওর মা-বাবা সেটাকে ভয় করেন। আর তাঁদের ওই অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে করবই বা কী? আমার পৈত্রিক সম্পত্তির মতো আরো একটা ট্রাস্ট? গান্ধীজীর ট্রাস্টীশিপ থিওরির অনুসরণ?" সৌম্য ব্যাখ্যা করে।

"সেও মিলির পক্ষে ভালো। কিন্তু বিলেত ফেরৎ জামাই নিয়ে ওঁরা করবেন কী? যদি এদেশে ওর মন না বসে। ও একদিন উড়ে যাবেই। মিলি যদি ওর সঙ্গে উড়ে যেতে না চায় বা না পারে তা হলে বিচ্ছেদ অবধারিত। আর সে মিলনই বা কোন্ সুখের হবে? সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে বিপ্লববাদীর গরমিল অনিবার্য।" জুলি লিখে দিতে পারে।

"আচ্ছা, জুলি, তোমরা কেউ যদি ওকে বিয়ে না করো তবে ও বেচারি যাবে

কোথায়? ওদেশেই বিয়ে থা করে দেশকে ভুলে যাবে। চিরকাল তো অপেক্ষা করতে পারবে না। ওর তো তেমন কোনো ব্রত নেই, যেমন আছে আমার। ফিরে গিয়ে এরার ও বিয়ে করবেই। মিলিকে না হোক আর কাউকে।" সৌম্য অনুমান করে।

জুলি একটু গুছিয়ে নিয়ে বলে, "মা আমাকে জানতেই দেননি যে তিনি খবর পেয়েছেন যুদ্ধ বাধার মাসখানেকের মধ্যেই শতখানেক পুরনো রাজবন্দীকে আবার ধরে নিয়ে জেলে পোরা হবে ও তাদের তালিকায় আমারও নাম থাকবে। তিনি হন্তদন্ত হয়ে বিদেশে সুকুমারদাকে চিঠি লেখেন। সে যেন ওদেশের কলেজে আমার ভর্তির ব্যবস্থা করে ও অবিলম্বে দেশে ফিরে এসে ভর্তির প্রমাণ দেখিয়ে আমাকে ওদেশে নিয়ে যায়। চিঠিতে অবশ্য এমন কোনো কথা ছিল না যে যাবার আগে বা পরে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তার জন্যে চাই আমার মতামত। আমি তো আরেক পরিবারের বৌ। মা আমাকে না বলে ও কথা লিখতে পারতেন না। তাঁর লক্ষ্য আমার নিরাপত্তা। সেটুকু সম্ভব হলে বাকীটা সুকুমারদার উদ্যোগিতা আর আমার ইচ্ছা।"

সৌম্য হেসে বলে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী। গৃহলক্ষ্মী।"

"সংস্কৃত বুঝিনে। মানে কী ওর?" জুলি সুধায়।

"উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ হয়। এক্ষেত্রে গৃহলক্ষ্মী।" সুধী উত্তর দেয়।

"সুকুমারদার বোধ হয় সেই ধারণাই ছিল। সে সত্যি সত্যি ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে এসে হাজির। টাকাও আগাম দিয়ে এসেছে। জাহাজও বুক করা হয়েছে। মা তো মহা খুশি। জানো তো মেজদির বর স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। তিনি সরকারের পেয়ারের লোক। সুকুমারদাকে নিয়ে যান পুলিশ কর্তার দফতরে। তালিকা থেকে ওরা আমার নাম কাটতে রাজী হয়। সেটা কিন্তু দেশ ছেড়ে রওনা হবার পরে। কিন্তু আমি তো তেমন কোনো অঙ্গীকার করিনি যে বিপ্লব হলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। ঝাঁপ দেবার জন্যেই আমি তৈরি। ওরা যদি পারে তো আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। জনতা যদি পারে তো আমাকে জেল ভেঙে খালাস করে নিয়ে আসবে। বিলেত গিয়ে নিরাপদ হওয়ার আমি কোনো তাৎপর্য বুঝিনে। আর তার মাশুল যদি হয় বিয়ে সেটা তো আরো অর্থহীন।" জুলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে তোমাদের বিপ্লবে তোমরা ছাড়া আর কেউ সাড়া দিল না। জনতা অসাড়। মাঝখান থেকে তোমাদেরই কারাদণ্ড। প্রাণদণ্ডও হতে পারে। যুদ্ধকালে বিপ্লব তো চরম রাজদ্রোহ। তোমাদের বাঁচাতে পারে

একমাত্র কংগ্রেস। যদি কেন্দ্রে ক্ষমতা পায়। কিন্তু কংগ্রেসকেও তো তোমরা অমান্য করছ। গান্ধীজীর বিরুদ্ধেও তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ। যাতে তাঁর প্রভাব কমে আর তোমাদের নেতাদের বাড়ে। কিন্তু আপৎকালে সেই গান্ধীই তোমাদের ভরসা। না, জুলি, ওসব অবাস্তব পরিকল্পনা ত্যাগ করো। তা যদি করো তবে তোমাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না সুকুমারকে বিয়ে করতেও হবে না। ও তোমার প্যাসেজটা মিলিকে দেবে, তোমার নামের অ্যাডমিশনটা মিলির নামে করিয়ে নেবে। মিলি ওকে বিয়ে করবে কি করবে না সেটা পরে স্থির করবে। সেটা তোমার ভাবনা নয়। তোমার ভাবনা তুমি কী করে বাঁচবে, যদি বিপ্লব ব্যর্থ হয় বা কংগ্রেস অসমর্থ হয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা হয়তো অবিলম্বে গদী ছাড়বেন।" সৌম্য যতদূর জানে।

"আমরা কংগ্রেসের কল্যাণে মুক্ত হতে চাইনে। জনতার অভ্যুত্থানে মুক্তি পেতে চাই। তেমন সৌভাগ্য যদি আমাদের না হয় আমরা জেলের ভিতর থেকে লড়ব। প্রাণের ভয় এখনো আমার আছে, কিন্তু সেটাও ক্রমে ক্রমে যাবে।" জুলি বলে যায়, "তবে সব চাল বেচাল হয়ে যেতে পারে। নাৎসীদের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি। তারপরে জার্মানে ইংরেজে একজোট হয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ। তখন আর ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ নয়। রাশিয়ার দুর্যোগই ভারতের দুর্যোগ। তেমন দিন যদি আসে আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ব। মীরার মতো বৃন্দাবনেই আশ্রয় নেব আমি। কোনো এক কুঞ্জে গাইব। বৃন্দাবনকে কুঞ্জ গলিনমে তেরি লীলা গাঁসু।" বিপ্লব এগিয়ে আসবে না, পেছিয়ে যাবে কতকাল!" জুলি হতাশভাবে বলে।

সৌম্য অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "জুলি, তুমি তো একবার বৈষ্ণবী হয়ে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়েছিলে। সে অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হয়নি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও যদি আশ্রয় নিতে চাও তো আমাকে একটা খবর দিয়ো। যদি জেলের বাইরে থাকি আমিই তোমার ভার নেব।"

"তা হলে তো আমি বর্তে যাই, সৌম্যদা! তোমার মতো নির্ভরযোগ্য আর কে আছে আমার!" জুলির কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের আভাস।

"কই, তুমি তো আমার খোঁজখবর রাখো না।" সৌম্য ক্ষোভ জানায়।

"আর তুমি! তুমি যেন আমার কত খোঁজখবর রাখো!" জুলি পালটা দেয়।

"কলকাতা হয়ে যাওয়া আসা করতে হয়। কিন্তু সেখানে থামিনে। সেইজন্যে কারো খোঁজ নেওয়া হয় না, শুধু কি তোমার!" সৌম্য কৈফিয়ৎ দেয়।

"ওঃ তোমার বান্ধবীদের কথা বলছ। হায়, তাঁদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে তোমার অলকনন্দা, যে তোমাকে বিয়ে করবে বলে ব্যাকুল হয়েছিল, ওর এখন তিনটি ছেলেমেয়ে। খাচ্ছে, দাচ্ছে, পরচর্চা করছে। তোমার বিরহে দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে। হবে না কেন? স্বামীর মোটা আয়। সলিড বুর্জোয়া। তবে এখনো গান নিয়ে পাগল। গানের আসরে ওকে প্রায়ই দেখতে পাই।" জুলি বলে।

সৌম্যর মনে পড়ে যায়। সেসব দিনের জন্যে মন কেমন করে। অলকনন্দা ওকে সত্যি ভালোবাসত। কিন্তু ওর দাবী ছিল সৌম্যকে ব্যারিস্টার হতে হবে। কলকাতায় বসতে হবে। শ্বশুরের প্র্যাকটিস তিনি তাকে দিয়ে যাবেন। এদিকে সৌম্য মুক্ত থাকতে চায় দেশকে মুক্ত করতে। প্রয়োজন হলে আজীবন। কে জানে হয়তো আমরণ। সত্যাগ্রহীকে মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হয়।

"অলকনন্দার সঙ্গে দেখা হলে বোলো আমি ওর ছেলেমেয়েদের দেখতে যাব একদিন। কিন্তু কবে তা আমার হাতে নয়। হঠাৎ সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে যেতে পারে। আমার এখানকার কাজের ভার কার উপর দিয়ে যাই সে এক সমস্যা। মিলির যদি খাদি ও কুটিরশিল্পে মতি থাকত ওকেই বলতুম দেখতে। ওকে আশ্রম-বাস করতে হতো না। আমরা মেয়েদের দিনের বেলা কাজ করতে দিই, কিন্তু রাতের বেলা থাকতে দিইনে। যদি না স্বামী স্ত্রী দু'জনেই আমাদের কর্মী হয়।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

"তা মিলি তো তোমার দিকে এক পা বাড়িয়েই রেখেছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে। সুকুমারদা হঠাৎ কোন্ দিক থেকে এসে দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়ে না দিলে ও হয়তো মূর্তিমতী কস্তুরবা হতে পারত। মহাত্মাটি কে তা আমি উচ্চারণ করব না। হ্যাঁ, সৌম্যদা, এটাও একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তুমি তো দেশের স্বাধীনতা না দেখে নারীর পাণিগ্রহণ করবে না। ততদিন অপেক্ষা করবে কোন্ নারীর রূপ-যৌবন! এমনিতেই ও মেয়ের চেহারা যা হয়েছে তা সুকুমারদার মতো রাতকানার চোখেই চলনসই। তোমার জন্যে অপেক্ষা করলে ও চেহারা হতো নন্দলাল বসুর 'শবরীর প্রতীক্ষা'র বৃদ্ধা শবরীর মতো।" জুলি উপহাস করে।

"মিলিকে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে না, জুলি। তুমি যা ভেবেছ তা নয়। মিলির দিক থেকে যা আছে তা শ্রদ্ধা, তা প্রেম নয়। আর আমার দিক থেকে যা আছে তা বিশুদ্ধ কল্যাণকামনা। কিসে ওর কল্যাণ হয় সেই ভাবনা। বিপ্লব ওর মতো মেয়ের জন্যে নয়। ওর মতো মেয়েও বিপ্লবের জন্যে নয়। সন্ত্রাসকেই ও বিপ্লব বলে ভুল করেছিল। সে ভুল ভেঙেছে। এখন যাকে বিপ্লব বলে বোঝানো

হচ্ছে সেও একপ্রকার অ্যাডভেঞ্চার। তাতে ও যে ওর অন্তরের সায় আছে তা নয়। মুসলিম জনতার মারমূর্তিকে ওর প্রাণে ভয়। আছে তো এখানে দুটিমাত্র সাহেব। দুটিকে মেরেই কি ওদের উন্মাদনা থামবে? বর্ধিষ্ণু হিন্দুদেরও ওরা মেরে খতম করবে। মিলি তাই ও পথ থেকে সরে আসছে, কিন্তু গান্ধীজীর উপরেও ওর পুরোপুরি বিশ্বাস জাগেনি।" সৌম্য বলে।

"কী এতক্ষণ ধরে গুজগুজ ফিসফিস করছ তোমরা?" যূথিকা বারান্দায় বেরিয়ে এসে সুধায়। আমাকে ডামি করে সুকুমারদা যা খেলছে দেখবার মতো। কাউকে একটা হাতও নিতে দিচ্ছে না। তাসগুলো যেন ওর বোল মানে। যাকে যা করতে বলে তাই করে।"

তৃতীয়জনের আবির্ভাবে কথাবার্তায় ছেদ পড়ে যায়। সৌম্য জিজ্ঞাসা করে বাচ্চাদের কথা। যূথিকা আশ্বাস দেয় যে ওরা অকাতরে ঘুমচ্ছে। তা হলেও বার বার গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে মণিকে। মাকে ছাড়া ও শুতে পারে না।

জুলি লক্ষ করছিল যে দাদা ও বৌদির দুই ঘরে দুই বিছানা। মণি শোয় মায়ের সঙ্গে আর দীপক আলাদা খাটে। এ রকম ব্যবস্থা ও আর কোথাও দেখেনি। ওটাও কি একপ্রকার অসিধার ব্রত? সৌম্যদা না থাকলে প্রশ্ন করত বৌদিকে।

"আমি জানতে এলুম তোমাদের কালকের প্ল্যান কী। ডিনারে আসবে তো? আমাদের এখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।" যূথিকা বলে।

"আমাকে কাল আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। রাত্রে ফিরব না। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ো, বোন।" সৌম্য ক্ষমা চায়।

"তুমি নিশ্চয়ই থাকছ, জুলি।" যূথিকা ধরে নেয়।

"আমি ভাবছি সুকুমারদাকে এস্কর্ট না করে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে কালকেই ফিরে যাব। ওর যতদিন ইচ্ছে ততদিন এখানে থাকতে পারে। যে খেলাটা ও খেলছে তা দেখবার মতো। সেটা কিন্তু তাস নয়, বৌদি। সেটা মন দেওয়া নেওয়া। কবি রবীন্দ্রনাথ কাকে লক্ষ করে ওসব লিখেছিলেন জানিনে, কিন্তু ওর বেলা অক্ষরে অক্ষরে খাটে। 'মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে। নূপুরের মতো ফিরেছি চরণে চরণে।' এখন ও যতদিন ইচ্ছে ফিরবে চরণে চরণে। তুমি আমাকেও বাদ দিয়ো, বৌদি। কালকের ডিনারটা জমবে আরো ভালো।" জুলি ক্ষমা চায়।

"আমি সত্যিই দুঃখিত, সৌম্যদা ও জুলি। ব্যাপার কী আমি ঠিক ঠাওরাতে পারছিনে। কেন তোমরা দু'জনেই এখান থেকে যাবে? জুলির বৈঠক তো আরো

কয়েক দিন চলবে। আর তোমার গ্রাম পরিক্রমা কি এতই জরুরি যে তুমি মানসের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা না করেই বিদায় নেবে, সৌম্যদা? তা হলে, চল ওঘরে, তাস খেলা বন্ধ করে দিই।" যূথিকা বলে।

তাস খেলা বন্ধ হয়। সৌম্য আর মানস বসবার ঘরে গম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে। জুলি আর যূথিকা শোবার ঘরে চটুল বিষয়ে। আর সুকুমারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মধুমালতীর সঙ্গে বারান্দায়। সেখানে বসে ওরা সুখদুঃখের কথা বলে। আর কেউ শুনতে যায় না।

সুকুমার মধুমালতীর মুখোমুখি আসন নিয়ে মন খোলে। "আপনাকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যেমন আমার, ফিরিয়ে দিয়ে যাবার দায়িত্বও তেমনি আমারই। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই যদি আপনি হোমসিক বোধ করেন তা হলে যুদ্ধকালে কেমন করে সেটা সম্ভব? যুদ্ধ হয়তো আর দু'বছর গড়াবে। আপনি আরো হোমসিক হবেন। কিন্তু টর্পেডোর ভয়ে যাত্রীজাহাজ এ মুখো হবেই না। কী সাংঘাতিক বিপদ!"

"আবার দেখছি সেই বন্দীশিবিরের মতোই হলো। সেবার স্বদেশে। এবার বিদেশে। তফাতের মধ্যে আপনাকে কাছে পাব।" মধুমালতী বলে।

"কিন্তু আমাকে কনস্ক্রিপ্ট করে কোথায় নিয়ে যায় কে জানে! তবে ওরা খুবই বিবেচক। বুঝিয়ে বললে বুঝবে। আমার চেনাজানা প্রভাবশালী ব্যক্তির অভাব নেই। তবু আপনাকে সব রকম অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়ার ইজ ওয়ার। ইংরেজরা নিজেরাই বিপন্ন।" সুকুমার হুঁশিয়ারি দেয়।

"বিয়ে যদি হয় তো স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর বিপদের ভাগী হওয়া, স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে আসা নয়। হোমসিক তো আমি বন্দীশিবিরেও ছিলুম।" মধুমালতী বলে।

॥ ছয় ॥

সেদিন বিদায় দেবার সময় মানস বলে সৌম্যকে, "কত কথা বলবার ছিল, শোনবার ছিল, তার সিকির সিকিও হলো না। তুমি আরেকদিন এসো, সৌম্যদা।"

যূথিকা যোগ করে, "আমাদের সঙ্গে ডে স্পেণ্ড করবেন। সকাল থেকে শুরু। ডিনারের পর সারা। তা হলে বাচ্চাদেরও সঙ্গ পাবেন।"

"সেটাই তো সব চেয়ে বড়ো ভোজ। কিন্তু লোভ সংবরণ করতে হবে। আস্ত একটা দিন খরচ করার স্বাধীনতা কি আমার আছে? রবিবারেও না। ছুটির দিন দেখে একদিন দুপুরটা তোমাদের সঙ্গে কাটাব। কিন্তু," সৌম্য একটু থেমে বলে, "এত ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ হলে তোমার নামে পুলিশ রিপোর্ট যাবে না তো?"

"গেলে কী হবে? কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এই তো। আমি তার চেয়ে কিছু বেশী দেব। বেণীর সঙ্গে মাথা।" মানস রহস্যময় করে।

"না, না, ওসব করতে যেয়ো না। তোমার যাতে অনিষ্ট হয় তার মধ্যে আমি নেই। সেইজন্যেই এতদিন দেখা করতে আসিনি। আচ্ছা, আবার আসব একদিন। বাচ্চাদের জন্যেই। দীপকের জন্যে সাপ আর শজারু আনতে হবে।" সৌম্য বিদায় নেয়।

এর পরে বিদায় নিতে আসে জুলি। বলে, "আপাতত এই শেষ দেখা। আমি কালকেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি, দাদা, বৌদি।"

"সে কী?" মানস বিস্মিত হয়। "তুমি একলা যাবে কী করে?"

"পথ চিনে গেছি। একলা যেতে খুব পারব। তবে একজন কমরেডকেও সঙ্গে নেব। সুকুমারদার কবে সুবিধে হবে, তার জন্যে বসে থাকব নাকি?" জুলি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে।

"কেন? কালকেই তুমি যেতে চাও কেন? তোমার বৈঠক তো তিনদিনের আগে শেষ হবে না। ততদিনে আমিও যেতে পারব।" দত্তবিশ্বাস নিবেদন করে।

"তুমি পারবে কি না সেটা নির্ভর করছে তৃতীয় একজনের উপরে। পাশপোর্ট, রিজারভেশন ইত্যাদির জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে না? তবে সমস্তটাই কেঁচে যেতে পারে, যদি গুরুজনের আপত্তি থাকে।" জুলি সাবধান করে দেয়।

"ওটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।" মিলি একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলে।

জুলির সঙ্গে ওরাও মোটরে ওঠে। কিন্তু জুলি ওদের সঙ্গে পেছনের সীটে বসে না। সামনে শোফারের পাশে আসন নেয়।

যূথিকা হেসে বলে সৌম্যকে, "প্রজাপতির নির্বন্ধ। এগারো বছর তপস্যা করেও সুকুমারদা জুলির মন পেলেন না। দেখে শুনে মনে হচ্ছে একদিনেই মিলির মন পেয়েছেন। তবে গুরুজনের মত না পেলে আবার যে কে সেই। সুকুমার না চিরকুমার!"

"না, চিরকুমার নয়। ও ফিরে গিয়ে বিয়ে করবেই। ওর গার্ল ফ্রেণ্ডদের একজনকে।" মানস আভাস পেয়েছে।

"তা হলে মিলির জন্যে আমি দুঃখিত হব। ওর আর বর জুটবে না। ওর মা বলেছিলেন বলে আমি চেষ্টা করেছি ও কতকটা সফলও হয়েছি।" যূথিকা বলে।

"আমার মনে হয় তুমি পুরোপুরি সফল হবে, জুঁই। ঘটকালিতে তোমার সহজাত কুশলতা। তবে কিনা যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে মেয়েকে বিলেত পাঠাতে রাজী হবে কোন্ মা বাপ! ওরা হয়তো জামাইকে দেশে ধরে রাখতে চাইবেন। চাকরির টোপ দেখাবেন। দেখা যাক দত্তবিশ্বাস কী করে।" সৌম্য অপেক্ষমান।

"সুকুমারদা দেশ থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন। ও বিদেশে ফিরে যাবেই। মিলি যদি যেতে নারাজ হয় তবে সেই কারণে এ সম্বন্ধ ভেস্তে যেতে পারে। পূর্ণ সফলতা লাভ করব যখন মিলি রাজী হবে যুদ্ধের দুর্যোগ সত্ত্বেও বিলেত যেতে।" যূথিকা আশা করে। তবে ভরসা রাখে না।

শুতে যাবার আগে মানস বলে যূথিকাকে, "দশ বছর আগে আমি লক্ষ করেছি যে জুলির মনের কম্পাসের ধ্রুবতারা সুকুমার নয়, সৌম্য। দশ বছর পরেও পরিবর্তন দেখছিনে। রাজনৈতিক মতান্তর থেকে ওদের মনান্তর ঘটেনি।"

"সে কী!" যূথিকা অবাক হয়। "তুমি বলতে চাও জুলির বিয়ের আশা আছে, সৌম্যদা যদি তপোভঙ্গ করে?"

"না, সৌম্যদা তপোভঙ্গ করবে না। বলতে পারো, সৌম্যদার তপস্যা যদি ভারতের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়। তার অনেক দেরি। কারো কারো মতে ১৯৫৭ সালের মিউটিনির আগে নয়। তা যদি হয় তবে জুলি বেচারিকে আরো আঠারো বছর প্রতীক্ষা করতে হবে।" মানস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"ততদিনে ওর মা হবার বয়স গড়িয়ে গিয়ে থাকবে।" যূথিকা আপসোস করে। "যদি দেখতে আমাদের বাচ্চাদুটিকে নিয়ে ও আজ কত আদর সোহাগ করছিল। মণি যেন ওর চক্ষের মণি। যেন ওর খেলার পুতুল। ওর স্বভাবটা মায়ের স্বভাব। মা হয়েই ওর সার্থকতা। ও যদি মা না হয় তবে ওর জীবন বৃথা। ভগবানের কী যে বিচার! যে স্নেহময়ী মা হতে পারত সে হলো অকালে বিধবা।"

"শুধু বিধবা নয়, কুমারী বিধবা।" মানস সংশোধন করে।

"ভগবান কি মুখ তুলে তাকাবেন না? কবে ১৯৫৭ সাল আসবে, তার আগে কি মিউটিনি কি বিপ্লব কি যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে না? ফলে ভারত স্বাধীন হবে না? জুলি তো পারলে এই বছরই বিপ্লব ঘটায়। তা হলে পরের বছর ওর পরিণয়। বলো, ওর মনের কথাটা ঠিক ধরতে পেরেছি কি না।" যূথিকা জানতে চায়।

"যথার্থ।" মানস বলে, "আমার এখন মনে হচ্ছে জুলি সৌম্যদাকে বোঝাবার জন্যেই এখানে এসেছিল। গান্ধীজীকে সৌম্যদা যেন গণসত্যাগ্রহের জন্যে তাড়া দেয়। জুলির চেয়ে মিলি ঢের বেশী বাস্তববাদী। তাই ঢের কম বিপ্লববাদী।"

"ওদের দু'জনার মধ্যে কে বড়ো কে ছোট বলতে পারো?" জানতে চায় যূথী।

"মিলিই বড়ো। যদিও দেখতে ছোট। বুদ্ধিবিদ্যাও জুলির চেয়ে বেশী। জুলি ওর তুলনায় ছেলেমানুষ। ও আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারবে। মিলি কিন্তু বুড়িয়ে যেত। হঠাৎ ওর কপাল খুলে গেল।" মানস আনন্দিত।

"খুলত না, যদি না সৌম্যদার আকর্ষণে জুলি এখানে আসত, আর জুলির আকর্ষণে সুকুমারদা। তবে এটাও আমি লক্ষ করেছি সৌম্যদার দিকে মিলি একটু একটু করে ঝুঁকছিল। দেখছ না, এর মধ্যে ও খদ্দর ধরেছে। জুলি কিন্তু ধরেনি।" যূথিকা বলে।

"সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল।" মানস বলে, "সৌম্যদার দিকে নয়, সুকুমারের দিকে ঝোঁক। পল্লীর দিকে নয়, বিলেতের দিকে মুখ। কোন্ মন্ত্রে এটা সম্ভব হলো! বিয়ের মন্ত্রে। বিয়েটা যদি হয়।"

"কেন, তোমার মনে সন্দেহ আছে নাকি?" যূথিকা জেরা করে।

"কালকের দিনটা দেখি। তারপর বলব।" মানস পাশ কাটায়।

পরের দিন বিকেলে মিলি এসে হাজির। সুকুমারকে ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। মিলির প্রথম কথা হলো ওরা আজ ডিনারে আসবে না।

"ব্যাপার কী, মিস মুস্তাফী?" যূথিকা সভয়ে সুধায়।

"সংক্ষেপে বলছি। আমরা স্থির করেছিলুম জুলি চলে গেলে তার অসাক্ষাতে মাকে সব কথা খুলে বলব। তারপর বাবাকে। কিন্তু যাবার মুখেই জুলি একটা বেফাঁস কথা ছুঁড়ে ফেলে যায়। হয়তো ইচ্ছে করেই বেফাঁস। বলে, কেউ বা বিলেত যাবার জন্যে বিয়ে করে। কেউ বা বিয়ে করবার জন্যে বিলেত যায়। যেমন ওই দুলাল। যেমন এই মিলি।"

"তার পরে?" যূথিকা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে চায়।

"তার পরে মা আমাকে চেপে ধরেন। জুলির কী! ও খিল খিল করে হাসে। কত বড়ো একটা তামাশা! আমি বলি, মা, পাগলে কী না বলে! জুলি যে একটা পাগলী একথা কে না জানে? তুমিই তো কতবার ওকে পাগলী বলেছ।"

"মা বিশ্বাস করলেন?" যূথিকা কৌতূহলী।

"মা একবার আমার দিকে তাকান, একবার জুলির দিকে। তলে তলে একটা কিছু চলেছে আন্দাজ করেন। কিন্তু তখনকার মতো থামেন। পরে আমরাই খাবার টেবিলে কথাটা পাড়ি। মিস্টার দত্তবিশ্বাসই কয়েকবার ঢোক গিলে আগ বাড়িয়ে বলেন, জানি আপনারা ক্ষমা করবেন না, তবু জোড়হাতে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। কথা ছিল জুলি আমার সঙ্গে শেষ জাহাজে বিলেত যাবে। সেখানে বেডফোর্ড কলেজে ভর্তি হবে। তা হলে ওকে আর বন্দীশিবিরে ধরে নিয়ে যাবে না। সিদ্ধান্তটা জুলির মায়ের। মিসেস সিন্‌হার। জুলি কিন্তু বেঁকে বসেছে। জাহাজের বার্থ খালি। কলেজের সীট খালি। এমন সুযোগ তো চাইলেও মেলে না। কেউ কি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে? অধমের প্রস্তাবে মধুমালতী দেবী এ সুযোগ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।"

"তারপরে?" যূথিকা রুদ্ধশ্বাস।

"তার পরে মা কেঁদে ওঠেন। কী কান্না! কী কান্না! সে কান্না এখনো থামেনি। যাকে বলে নন্‌স্টপ। মিস্টার দত্তবিশ্বাস মনের দুঃখে বিষপান করতে গেছেন। সেখানেই মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওঁকে সোজাসুজি 'না' বলিনি। বাবাও ছিলেন খাবার টেবিলে। তিনি কাঁদছেনও না, হাসছেনও না। সম্পূর্ণ মৌন। বোধহয় চিন্তামগ্ন। দু'জনেই ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন। বিলেত

গিয়ে পড়াশুনাটা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। লক্ষ্য হচ্ছে বিবাহ। এর একটা উল্টোদিকও আছে। বিলেত থেকে যদি না ফিরি। যদি যুদ্ধে নিহত হই। এত কম নোটিসে বিলেত যাওয়াটাও মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ এর চেয়ে কম নোটিসেও বন্দীশিবিরে ধরে নিয়ে যেতে পারে। যুদ্ধের সময় ওরা বিপ্লবীদের বাইরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। বাবা এটা বোঝেন। মা অবুঝ। অথচ মাই তো চেয়েছিলেন আমার বিয়ে দিতে।" মিলি লজ্জায় নত হয়।

"আমাদের সকলেরই সেই ইচ্ছে। আমার মনে হয় আপনার বাবা এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন। তিনি সব দিক ওজন করে দেখবেন যে এইটেই সব চেয়ে ভালো। তখন তিনিই বোঝাবেন আপনার মাকে।" যুথিকা আশ্বাস দেয়।

"কিন্তু সব দিক বিবেচনা করতে হলে পাত্রটির সম্বন্ধেও আরো জানতে শুনতে হয়। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। পাত্রটি অবশ্য বিয়ের প্রস্তাব তোলেননি, আমিও আমার মতামত হাতে রেখেছি। কিন্তু ওঁরা হলেন সেকেলে মানুষ। অমনি তো একজন অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে যেতে দেবেন না। বিয়ে না হোক, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হওয়া চাই। আপনারা এক্ষেত্রে পাত্রের বন্ধু। মধ্যস্থও বলা যেতে পারে। আপনারা পেছনে না থাকলে আমি নিজেই জোর পেতুম না। আপনাদের কি আজ সন্ধ্যায় সময় হবে? আমাদের ওখানে যেতে পারবেন? বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন মিস্টার মল্লিক। আর মায়ের সঙ্গে আপনি।" মিলি ব্যাকুলভাবে বলে।

"দরকার হলে একশোবার আসব। বিয়ের সিদ্ধান্ত অবশ্য আপনাকেই নিতে হবে। ভুল করলে পশতাবেন তো আপনিই।" যুথিকা সাবধান করে দেয়।

"সে আমার প্রাইভেট ব্যাপার। কিন্তু মা বোধহয় অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করতে চাইবেন বিলেত যাবার আগে বিয়ে দিয়ে। তা হলে আর সময় কোথায়? আমাকেও তো বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। মানুষকে গুলী করতে যত সময় লাগে বিয়ে করতে তার চেয়েও কম সময় লাগবে।...মিলি গম্ভীরভাবে বলে।

ক্যাপটেন মুস্তাফী অপেক্ষা করছিলেন। মানসকে নিয়ে যান তাঁর চেম্বারে। একথা সেকথার পর বলেন, "বিলেত যাওয়া, বেডফোর্ড কলেজে পড়া, এসব কথায় ভবী ভুলবে না। ভবী শুধু জানতে চায় একটি কথা। মেয়ের বিয়ে হবে কি না। যদি হয় তবে শুধু শুধু বিলেত যাওয়া কেন, কলেজে পড়া কেন? যদি না হয় তবে অকারণে বিলেত যাওয়া কেন, কলেজে পড়া কেন? এখন আমি এর কী উত্তর দিই, বলুন? বন্দীশিবিরের হাত থেকে পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই

বললে ভবী বিশ্বাস করবে না। মেয়ে তো রাজনীতি ছেড়েই দিয়েছে। সেবাকর্ম নিয়েই আছে। সরকার যদি অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেন তাতেও ওর মা রাজী। কিন্তু বিলেত? এই যুদ্ধকালে বিলেত? যে পারছে সে পালিয়ে আসছে। যে পালায় সে-ই বাঁচে।"

মানস কেমন করে বোঝাবে যে সমস্যাটা দত্তবিশ্বাসের সৃষ্টি নয়। সে তো আজ এখনি বিয়ে করতে পারলে বর্তে যায়। মিলিই মনঃস্থির করতে পারছে না। কারণ বিয়ে করলে দত্তবিশ্বাস যেখানে থাকবে মিলিও সেখানে থাকবে। দত্তবিশ্বাস থাকবে বিলেতে। দেশে ওর কোনো কাজও নেই, বন্ধনও নেই। বিলেতেই ওর অন্নসংস্থান। বইয়ের দোকান। ওর দোকান থেকে বই আনিয়েছে মানস কয়েকবার।

"মিলিকে বিলেতেই থাকতে হবে?" মুস্তাফী মেনে নিতে অক্ষম। "কেন, মিস্টার দত্তবিশ্বাস কি এদেশেই যেতে পারেন না? কাজের মানুষের কাজের অভাব কী? গভর্নমেন্ট থেকে আমি ব্যাণ্ডেজ সরবরাহের অর্ডার পেয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে। তার জন্যে আমি একটা কোম্পানী ফ্লোট করব। ম্যানেজমেণ্টের জন্যে লোক চাই। হোয়াই নট ডাট বিশোয়াস?"

"বলে দেখব। কিন্তু ও দেশে ও লর্ড ও লেডীদের সঙ্গে মেশে। এ দেশে কার সঙ্গে মিশবে? বারো বছর ও দেশে থেকে ওর অনেকগুলি কন্‌টাক্‌ট হয়েছে ওদেশে। এ দেশে ওকে চিনবে কে? মফস্বল বারের এক উকীলের ছেলে। সৎমায়ের শাসনে দেশছাড়া। বিয়ে করতে এসেছে। বিয়ে করার কথা জুলিকে। জুলি নারাজ। জুলি এখন ইংরেজের নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। বিলেত যেতে বললে মারতে আসে। মিস মুস্তাফীরও সেই একই মনোভাব। তাই আমরা কেউ আশাবাদী নই। তবে মিসেস মুস্তাফী একটি পাত্রের সন্ধান দিতে বলেছিলেন। এটিও একটি পাত্র। দৈবাৎ উড়ে এসেছে। কিন্তু জুড়ে বসবে কি না নির্ভর করছে আপনার উপর।" মানস নিবেদন করে।

"আপনার বন্ধু, এ ছাড়া ওঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনে। জানবার দরকারও নেই। যার তার সঙ্গে আপনার বন্ধুতা হয় না। তবে জানতে ইচ্ছে করে ওঁর পড়াশুনা কতদূর। কোন্ ইউনিভার্সিটিতে।" মুস্তাফী জানতে উৎসুক।

"লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকসের ছাত্র। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি. এসসি। এদিকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বি. এ.। দেশে ফিরে এলে একটা কিছু জুটে যেত হয়তো, কিন্তু তেমন কোন চাড় ছিল না। একজন মানুষের পক্ষে যাঁহা স্বদেশ তাঁহা বিদেশ। সেখানেও চেষ্টা করলে একটা কিছু জুটে যায়। এতকাল পরে

একজনের জায়গায় দু'জন হতে যাচ্ছে। নিজের একটা আস্তানা আছে। স্থানাভাব হবে না। আয়ের অন্যান্য উৎসও আছে। চলে যাবে। যদি বিয়ে হয়। আপাতত বিয়ের কথা উঠছে না। মধুমালতী আগে পড়াশুনা করবেন, তারপরে বিয়ে। যদি ইচ্ছে হয়।" মানস বলে যায়।

"তার মানে কী দাঁড়াল ? পাত্র পাত্রী কারো পক্ষে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিয়ে হলেও হতে পারে। না হলেও না হতে পারে। অথচ এই দুঃসময়ে ইংলণ্ডে যাওয়া চাইই চাই। লাগে টাকা দেবে কালী মুস্তাফী।" তিনি গজগজ করেন।

"বাধ্যবাধকতার কথা যদি বলেন, দত্তবিশ্বাস এক্ষুণি বিয়ে করতে রাজী। চোখ বুজে বিয়ে করবে। পলিটিকাল রেকর্ডের দিকে তাকাবে না। মেডিকাল রেকর্ডের দিকেও না। পণযৌতুকও নেবে না, বিলেতযাত্রার খরচপত্রও না। ও চায় জুলির পরিবর্তে মিলিকে। খালি হাতে ফিরবে না। ওর মানসম্মানের প্রশ্নও জড়িত। কিন্তু আপনার কন্যার মন পাওয়া অত সহজ নয়। উনি কারো পরিবর্ত হতে চান না। ওঁর জন্যেও তপস্যা করতে হবে। আমার বন্ধু তাতেও রাজী। কিন্তু একটি শর্তে। কন্যাকে বিলেতে গিয়ে বেডফোর্ড কলেজে পড়াশুনা করতে হবে। নয়তো আমার বন্ধু বার বার তিনবার প্রত্যাখ্যানের জ্বালা সইতে পারবে না। ফিরে গিয়ে যাকে পাবে তাকে বিয়ে করবে।" মানস তার শেষ তাসটি খেলে।

"হুঁ। বুঝেছি। জেদের মাথায় বিয়ে। একজনকে না একজনকে উনি বিয়ে করবেনই। সম্ভব হলে আজ এক্ষুণি। কিন্তু মিলি প্রস্তুত নয়। ওরও তো মানসম্মানের প্রশ্ন আছে। মল্লিক সাহেব, আপনিই বলুন আমার কী করা উচিত। একটি পাত্রকে হাতছাড়া করলে আর একটি পাত্র জুটবে না। মিলিও কয়েকটি খারিজ করেছে। নিজেও খারিজ হয়েছে। দত্তবিশ্বাসকে তো আমার খুব তুখোড়, স্মার্ট ও করিৎকর্মা মনে হয়। কিন্তু আমার কন্যাটি যে আইডিয়ালিস্ট। আইডিয়ালিজমের জন্যে ওর জীবনটাই ব্যর্থ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে এ জীবনে ওর বিয়ের আশা নেই। হঠাৎ একটু আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি। মল্লিক সাহেব, আপনার মেয়ে হলে আপনি কী করতেন ? এক্ষুণি বিয়ে দিতেন না আরো কিছুদিন দেখতেন ?" মুস্তাফী উদ্‌ভ্রান্ত।

"মেয়ে যেখানে সাবালিকা সেখানে সিদ্ধান্তটা মেয়ের উপরে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন। মধুমালতী শুধু সাবালিকা নন, তিনি স্থিরমতি। মনঃস্থির করতে তাঁর সময় লাগবে। অথচ দত্তবিশ্বাসের হাতে অত সময় নেই। ওর শেষ জাহাজ তিন সপ্তাহের মধ্যেই বম্বে ছাড়বে। একজন যদি সমুদ্রের এপারে থাকে আরেকজন ওপারে

তা হলে চিঠিপত্রই মিলনের সূত্র। কিন্তু যুদ্ধকালে সেটাও ক্ষীণ হতে হতে ছিন্ন হতে পারে। তা হলে আরেকজনকেও ওপারে যেতে হয়। এই পর্যন্ত তাঁর বাধ্যবাধকতা। এর বেশী নয়। পছন্দ না হয় বিয়ে করবেন না। দত্তবিশ্বাসকে মুক্তি দিলে সেও আর কাউকে বিয়ে করবে। তবে আমার নিজের মত হচ্ছে হাতের লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলা। আইডিয়াল ম্যাচ এ পৃথিবীতে কোথায়? যতই দিন যাবে ততই রূপযৌবন ক্ষয় হবে। শেষে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ওল্‌ড মেড হয়ে জীবন কাটবে।' মানস তার মত জানায়।

"ঠিক। ঠিক। যতই দিন যাবে ততই বিবাহের অযোগ্য হবে। এটা কি ওর মা বোঝেন না? না বুঝলে কী করে বোঝাই বলুন তো? মিসেস মল্লিকের সহায়তা চাই। তিনি তো ঘরে বসে মিলির মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরে জানতে পাব কী বললেন। এ ঘটকালি তো ওঁরই কীর্তি।" মুস্তাফী তারিফ করেন।

মিলির মা নরম হয়েছেন শোনা গেল। কিন্তু মেয়ে যদি বিয়ে না করেই ফিরে আসে লোকে ছি ছি করবে। পরে ওকে আর কেউ বিয়ে করবে না। লাভের মধ্যে হবে বিলিতী শিক্ষা। তাতে মাথা উঁচু হবে। সব চেয়ে ভালো হয় মিলি যদি বয়স থাকতে বিয়ে করে। বয়স কি আর অপেক্ষা করবে? যূথিকা নাকি পরামর্শ দিয়েছে চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে। নারীর জীবনে এটাও তো একটা বিপ্লব। বিপ্লব মানেই ঝুঁকি। বিয়ে মানেও তাই। দু'তিন বছর বয়স পার করে দিয়ে এমন কী নিশ্চয়তা বাড়বে? সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। জুলি যথাকালে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওর বন্ধু মিলির জন্যে। এটাকে বন্ধুকৃত্য বলেই মনে করা উচিত। মিলি কেন দোনোমনো করছে? ওর নজরে কি আর কোন পাত্র আছে? পুরুষ হচ্ছে প্রজাপতির মতো। ওকে পিন দিয়ে এঁটে না রাখলে ও উড়ে গিয়ে অন্য কোনো ফুলে বসবে। অন্য কোনো মালতীর মধু পান করবে। আদর্শ পুরুষ নয়। কিন্তু তার জন্যে শবরীর প্রতীক্ষা নিরর্থক।

মা বলেন মেয়েকে, "মনঃস্থির তুই দিন সাতেকের মধ্যেই কর। তুই 'হ্যাঁ' বললেও আমি রাজী। 'না' বললেও রাজী। কিন্তু ঝুলিয়ে রাখিস্‌নে।"

নৈশভোজন সেদিন মুস্তাফীদের ভবনেই হয়। বিদায় দেবার সময় মানস বলেন, "বেশ, সাতদিন পরেই এস্‌পার কি ওস্‌পার। কিন্তু ইতিমধ্যে পাসপোর্টের দরখাস্তটা করে রাখলে সময় বাঁচে। দরকার না হয় তুলে রাখবেন। পরে কাজে লাগতে পারে।"

পরের দিন পাসপোর্টের ফর্ম আনতে স্বয়ং মুস্তাফী যান জেলা শাসকের অফিসে। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। লোকে ভাবে তিনিই বিদেশে যাচ্ছেন। এর পরে তিনি

শেফার্ড সাহেবের কুঠিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে মিলি ও সুকুমার! শেফার্ড একগাল হেসে বলেন, "এই বাঘিনীর বিয়ে দেবার জন্যে সরকার থেকে কত না ফাঁদ পাতা হয়েছে! কিন্তু কারো মাথায় আসেনি যে একে বিলেত পাঠাতে হবে। সেখানেই অপেক্ষা করছে ফাঁদ। আমার ঘাড় থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঝা নামল। দরখাস্ত মন্‌জুর করতে এই আমি সুপারিশ করলুম। বেস্ট অভ লাক টু ইউ, মিস মুস্তাফী, অ্যাণ্ড টু ইউ ইয়ং ম্যান।"

মধুমালতী বলে, "আমি কিন্তু এখনো কথা দিইনি যে আমি বিয়ে করব।"

"আমিও তো উল্লেখ করিনি যে আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আপনি যাচ্ছেন পড়াশুনা করতে। মঞ্জুলিকা সোমের জন্যে সংরক্ষিত স্থানে। এস্‌কর্ট হচ্ছেন মিস্‌টার ডাট বিশোয়াস। যাঁর লণ্ডনে বইয়ের দোকান আছে। এর থেকে যদি কেউ অনুমান করে যে এর পরিণতি বিবাহান্ত তবে ক্ষতি কী?" শেফার্ড চোখ টেপেন।

ক্যাপটেন মুস্তাফী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, "এমনও হতে পারে যে পাসপোর্ট পেলেও যাওয়া হবে না। কাজেই ব্যাপারটা গোপনীয় রাখবেন, সার।"

সাতদিনের মধ্যেই পাসপোর্ট পৌঁছে যায়। পাসপোর্টখানা হাতে পেয়ে মিলির সে কী বিস্ময়! ইংরেজদের উপর ওর বিশ্বাস একেবারেই ছিল না। অন্তত ছ'টি মাস না ঘুরিয়ে ওরা কি পাসপোর্ট ইস্যু করবে ওর মতো বিপ্লবী নায়িকাকে? ও যদি বিলেত থেকে সুইডেন চলে যায় ও সেখানে থেকে রাশিয়ায় তা হলে ওরা কী করতেপারে?

"তা হলে তুই কী স্থির করলি, মিলি?" মা জানতে চান।

"এ পাসপোর্ট তুলে রাখলে ওরা যে-কোন দিন কেড়ে নিতে পারে। আমি এটা নিয়ে সাগর পাড়ি দেব, মা।" মিলি উত্তর দেয়।

"তা হলে, বাছা, এবার আমার কথা শোন। বিয়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে যা। কবে ফিরে আসবি কে জানে! ততদিন যদি বেঁচে না থাকি! তার আগে আমি দেখে যেতে চাই তোর সিঁথিতে সিঁদুর।" মা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন।

"তোমার হাসিমুখ দেখে যেতে চাই, মা। তোমাকে কাঁদিয়ে যেতে চাইনে। তুমি যা বলবে তাই হবে।" মিলি মাথা নত করে।

"তোর যাকে পছন্দ তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব, মিলি। যাবার আগেই দেব। অঘ্রাণপর্যন্ত থাকলেই ভালো হতো, কিন্তু ততদিন তো জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকবে না। কার্ত্তিকেই বিয়ের দিন ফেলতে হবে। অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ে কার্ত্তিকেও হয়। হাতে সময় বড়ো কম। তেমন বেশী ধুমধাম হবে না। মনে খেদ থেকে যাবে। উপায় কী! তুই যে রাজী হয়েছিস এতেই আমি কৃতার্থ।" তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মুস্তাফী সুকুমারকে ডেকে বলেন, "মিলি মত দিয়েছে, এখন আমরাও মত দিচ্ছি। ইংরেজরা বলে, ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। আমরা নিমিত্তমাত্র। মিলির বিয়ে ভাবতে পারিনি যে স্বচক্ষে দেখতে পাব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি দিচ্ছি। তুমি কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে চাও ফর্দ করো। তোমাদের পক্ষ থেকে কে কে আসবেন? তোমার পিতৃদেব? তাঁকে চিঠি লিখব কি?"

"লিখলে ভালো দেখায়। কিন্তু ওঁর খাঁই মেটাতে পারবেন না। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। পাঠাইনে বলে আমার উপর খাপ্পা।" সুকুমার লজ্জিত।

"মিলি আমাকে অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছে যে বিপ্লবীর জীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু পণযৌতুক দানগ্রহণ নিষেধ। ত্যাগ ও শৌর্যের দ্বারা ও যেটুকু সুকৃতি অর্জন করেছে তার সবটাই নষ্ট হবে যদি ওর বিবাহ হয় বুর্জোয়া বড়লোকের মেয়ের মতো। সত্যি কথা বলতে কী, এতদিন যে ওর বিয়ে হয়নি তার প্রধান কারণ বরপক্ষ আশা করে পণযৌতুক আর কন্যাপক্ষ তাতে নারাজ। এক বিপ্লবী ভিন্ন আর কে ওকে বিয়ে করত, বলো? তাতে কিন্তু ওর জননীর আপত্তি। মেয়েকে যার হাতে দেবেন তার জেল হবে কি দ্বীপান্তর হবে কে জানে! ফাঁসীও হতে পারে।" মুস্তাফী শিউরে ওঠেন।

"আমিও তো কালাপানি পার হয়েছি ও হব।" সুকুমার সবিনয়ে বলে।

"সেইজন্যে তোমার বেলাও তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু তিনিও চান যে মিলি আর কোথাও যাক, এদেশে থাকলে হয় বন্দীশিবিরে নয় আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। বিপ্লব থেকে যত দূরে যায় তত ভালো।" মুস্তাফীর সেই মত।

"তা হলে এত কান্নাকাটি করলেন কেন? আমার তো মনে হলো মিলিকে ছেড়ে তিনি একদিনও বাঁচবেন না।" সুকুমার দুঃখিত।

"ওটা শক থেকে। এতদিনে সয়ে গেছে। তুমি চালাক চতুর ছেলে, যুদ্ধের সময় আপনাকে বাঁচাবে, বৌকেও বাঁচাবে, তোমাকে দেখেশুনে তাঁর প্রত্যয় হয়েছে। আমার তো সন্দেহই ছিল না। বিপদ বরং এই দেশেই বেশী।" মুস্তাফীর ধারণা।

"আমি সামান্য মানুষ। আমার উপর আপনাদের এই বিশ্বাস আমাকে অভিভূত করেছে, মেসোমশায়।" সুকুমার এর মধ্যে 'মেসোমশায়' ও 'মাসিমা' ডাকতে শুরু করেছে। সেটা জুলির অনুকরণে।

"বিলেত গেলে মিলিও চালাক চতুর হয়ে উঠবে। এদেশে থাকলে ওর জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে না। আমার মনেও তো একটা খেদ রয়ে গেছে যে আমার মা আমাকে বিলেত যেতে দিলেন না। নইলে আমিও একজন আই. এম. এস. হতে

পারতুম। এতদিনে কর্নেল মুস্তাফী। মা বেঁচে থাকতে আমাকে যুদ্ধে যেতেও দিতেন না। গেছি বলেই ক্যাপটেন মুস্তাফী হয়েছি। আরো উঁচু র‍্যাঙ্ক আমার পাওনা ছিল, সুকুমার। মেজর মুস্তাফী হবার আগেই আমি সরে পড়ি। জানতুম যে বন্দীশিবিরে মিলিকে ওর বন্ধুরা ধিক্কার দেবে। যার মেয়ে বিপ্লবী বন্দী তার মেজর হওয়া সাজে না। তুমি হয়তো ভাবছ আমি র‍্যাঙ্কের জন্যে লালায়িত। না, বাবা। তবে এটাও কবুল করছি যে লোকে যদি আমাকে ক্যাপটেন মুস্তাফী না বলে ডাক্তার মুস্তাফী বলে আমি ব্যথা পাই। যুদ্ধে এবার বহু ডাক্তার নেবে। বহু ক্যাপটেন হবে। যুদ্ধ জিনিসটা সেদিক থেকে খুব একটা খারাপ জিনিস নয়। কী বলো, সুকুমার?" তিনি সিগারে টান দেন।

"আমিও তাই ভাবছি, মেসোমশায়। এই হিড়িকে আমিও ক্যাপটেন বনে যেতে পারি। হোম গার্ডে আমাকে নেবে, যদি রেগুলার আর্মীতে না নেয়। এবারকার যুদ্ধে সিভিল ডিফেন্স বলে একটা বিভাগ থাকবে। মিলিটারী ডিফেন্সই সব নয়।" সুকুমার উৎসাহের সঙ্গে বলে।

'যুবকদের মধ্যে আমি এমনি উৎসাহ দেখতে ভালোবাসি। বাঙালীর জীবনে সামরিক অভিজ্ঞতার সুযোগ কোথায়? যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে, হ্যাঁ, আপনাকে বাঁচিয়ে।" মুস্তাফী সাবধানী মানুষ।

বিয়ের দিন শেফার্ডকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একখানি পরিচয়পত্র দিয়ে যান। লণ্ডনে তাঁর এক বোন থাকেন। ওঁর নামে। মিসেস দত্তবিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হলে উনি সুখী হবেন। প্রয়োজনের সময় সহায়তা করবেন।

"ভালো কথা," শেফার্ড মনে করিয়ে দেন, "কলকাতায় পাসপোর্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করে বলবেন যে ইতিমধ্যে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার পদবী তাই পালটে গেছে। প্রমাণ চাইলে নিমন্ত্রণপত্র দেখাবেন।"

মধুমালতী তার আন্তরিক ধন্যবাদ জানায় ও করমর্দন করে তাঁকে বিদায় দেয়।

তখন পুলিস সাহেব খোন্দকার জাফর হোসেন বলেন মুস্তাফীকে, কানে কানে, "আর কিছুদিন পরে ওই শেফার্ডের হাত দিয়েই আমি সই করিয়ে নিতুম গ্রেফতারি পরোয়ানা এই মেয়ের নামে। তার আগেই পাখী উড়ে যাচ্ছে। শুভ হোক।"

শহরের গণ্যমান্যরা প্রায় সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। দস্তুরমতো হিন্দু বিবাহ। সালঙ্কারা কন্যাকে দেখে কে বলবে যে ইনি শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর! তবে পণ যৌতুকের আড়ম্বর ছিল না। তার বদলে সেবাপ্রতিষ্ঠানে মুস্তাফী পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

কিন্তু বরকর্তা কোথায়? তিনি আসেননি। পত্রের উত্তরে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর পুত্রের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিবাহে তাঁর সমর্থন নেই।

বরকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি না হলে বরকে সভাস্থ হতে অনুমতি দেবে কে? সৌম্যকেই বরকর্তা সাজতে হয়। বরের চেয়ে বয়স যদিও খুব বেশী নয় তবু দাড়ি গোঁফের বাহুল্যে প্রৌঢ়ের মতো দেখায়। কন্যাকর্তার অনুরোধে সৌম্য বরকর্তার আসন নেয়।

বিয়ের পরে সৌম্যর কর্তাগিরির মুখোশ খসে পড়ে। সে বন্ধুর হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানি দেয়। "সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে এ্যায়সা কাম কোই নেহি কিয়া। লাটিন ভাষায় জুলিয়াস সীজার একবার একটা দেশ জয় করে বলেছিলেন, ভেনি ভিডি ভিসি। বাংলাভাষায় তুমিও বলতে পারো, এলুম, দেখলুম, জয় করলুম।"

"কেন লজ্জা দিচ্ছ, ভাই চৌধুরী? তুমি তো জানো সব কথা। কাকে পেতে এতদূর এসেছিলুম, কাকে হারালুম, কাকে তার বদলে পেলুম।" সুকুমার বলে ধরা গলায়।

"কাকে হারালে সেটা বড়ো কথা নয়, কাকে পেলে সেইটেই বড়ো কথা। এই নারীর জন্যেও তপস্যা করতে হয়। বিনা তপস্যায় এমন নারী মেলে না। তুমি যে পাচ্ছ এটা নেহাৎ বরাত জোরে। বোধহয় তোমার সেই তপস্যাই তোমার এই সাফল্যকে বল জুগিয়েছে। মিলি তোমার সেই তপস্যায় মুগ্ধ। তা হলেও তোমাকে নতুন করে তপস্যা করতে হবে। মিলির মন পেতে। মিলি তোমাকে পরখ করে নেবে। সময় লাগবে। বিয়ে করেছ বলে ধরে নিয়ো না যে ভালোবাসা পেয়েছ।" সৌম্য উপদেশ দেয়।

"তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে, ভাই।" সুকুমার বলে।

"কেন, ভয় কিসের? জুলি মিলি দু'জনকেই আমি চিনি। জুলির সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে ওর হাত থেকে চড়টা চাপড়টা খেতে। বকুনি তো হতো নিত্য আহার্য। মিলি ঠাণ্ডা মেয়ে। সন্ত্রাসবাদী যুগে দেশের অপমানে আগুন হয়ে কী করেছিল না করেছিল সেসব পূর্বজন্মের মতো শোনায়। তবে আগুন পুরোপুরি নেবেনি, বিপ্লবের আবহাওয়ায় আবার জ্বলে উঠতেও পারে, সেইজন্যেই তো ওকে বিদেশে চালান করে দেওয়া। কিন্তু তেমন কোনো অঘটন না ঘটলে ও তোমাকে সুখী করবে, সুকুমার। তুমিও ওকে সুখী করবে, আশা করি। আর কারো দিকে দৃষ্টি দিয়ো না। আর কেউ যেন তোমাদের দু'জনের মাঝখানে না আসে। মিলি

প্রাচ্য নারী। ওদেশের রীতিনীতি বোঝে না। তোমার গার্ল ফ্রেণ্ডদের থেকে শতহস্ত দূরে থেকো। একদা তুমি একজন গ্যালাণ্ট ছিলে। সেকথা বেবাক ভুলে যেয়ো। আলবামে ছবি টবি থাকলে পুড়িয়ে ফেলো। কষ্ট বোধ হলে ফেরৎ দিয়ো। জুলির নামও করতে মানা করি। ওদের দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব লক্ষ করেছি। প্রিয় বন্ধু, অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী।" সৌম্য সতর্ক করে দেয়।

স্বকুমার গদগদ হয়ে বলে, "তোমার মতো শুভার্থী আর কে আছে আমার! তুমিই প্রকৃত বরকর্তা। তবে এ বিয়েটা যূথিকার কীর্তি। ভাগ্যিস্, ওরা এখানে ছিল। মানস আর যূথিকা। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।"

॥ সাত ॥

জুলিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করেছিল ওর মাকে। তিনি তা পেয়ে অবাক। মেয়েকে শেয়ালদায় রিসিভ করতে এসে তিনি ওর মুখে যা শোনেন তা আরো বিচিত্র। তিনি হতবাক হন। শেষে যখন বিয়ের নিমন্ত্রণ আসে তখন তিনি স্তম্ভিত হন। জুলিকে উদ্ধার করার জন্যে বিলেত থেকে যে ছুটে এল সে কিনা জুলিকে পথে বসিয়ে ওর বান্ধবী মিলিকে নিয়ে উধাও হবে।

"সুকুমারের মতো বিশ্বাসী ছেলে, এগারো বছর ধরে যে বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে, সেও শেষকালে বিশ্বাসভঙ্গ করল। ও তোকে বিট্রে করেছে, জুলি।" মিসেস বিনীতা সিন্‌হা হাহুতাশ করেন।

"না, মা, তুমি ভুল বুঝেছ। সুকুমারদা আমাকে বিট্রে করেনি। আমিই ওকে জিল্‌ট করেছি। এই নিয়ে ও তিনবার প্রপোজ করল। তিনবারেই আমি 'না' করলুম। ওর জীবনের উচ্চাভিলাষ হলো বুর্জোয়াদের সমাজে আরো, আরো, আরো উপরে ওঠা। পৈঠার পর পৈঠা পার হয়ে 'সার সুকুমার' কি 'লর্ড ডাট বিশোয়াস' বনা। আর আমি তো ওর বিপরীত মার্গে চলেছি। দিন দিন দেক্লাসে হচ্ছি। চাষানী কি মজুরনীর সঙ্গে আমার কোনো তফাৎ থাকবে না। ও আমাকে টেনে উপরে তুলতে পারবে না। আমিও ওকে টেনে নিচে নামাতে পারব না। এমন বিয়ে কি সফল হতে পারে? তা ছাড়া আরো কথা আছে।" জুলি একটু থামে।

"কী কথা?" ওর মা উৎসুক হন।

"ও ব্রহ্মচারী নয়।" বলতে গিয়ে জুলি লজ্জায় লাল হয়। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

"ওঃ এই কথা! যার বয়স হলো গিয়ে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ সে কতকাল সাধু সন্ন্যাসীর মতো থাকবে? আজকাল সেটল্‌ড না হয়ে বিয়ে করা যায় না। আর সেটল্‌ড হতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়। অত বাছবিচার করলে কি তোর দুই দিদির বিয়ে হতো? বিয়ের সময় ওসব বিষয়ে চোখ বুজে থাকতে হয়।" মাও লজ্জায় লাল হন।

"এ তো ভারী অন্যায়। মেয়েদের বেলা এক নিয়ম, ছেলেদের বেলা আরেক। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত।" জুলি ক্ষেপে যায়।

"তা হলে তো উপার্জনক্ষম হবার আগেই ছেলেদের বিয়ে দিতে হয়। ছিল আগে এ প্রথা। এখন উঠে গেছে। তোর নিজের বেলা আমরা ও প্রথা মানতে গিয়ে বিপাকে পড়েছি। বিশ বছর বয়সের ছেলের সঙ্গে ষোল বছর বয়সের মেয়ের বিয়ে। দু'বছর যেতে না যেতেই বিধবা। নইলে তুই যেমনটি চেয়েছিলি তেমনটিই পেয়েছিলি। ওটা একটা বিয়েই নয়। তাই আমি তোর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছি। সুকুমারের মতো আর কেউ তো এগিয়ে আসেনি বিধবাকে বিয়ে করতে। এখন সুকুমার হাতছাড়া হলো। কোথায় আবার পাত্র খুঁজব! তোর বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিয়ে দিতে গেলে আবার ওই বয়সী ছেলের খোঁজ নিতে হবে। সেও কি শুদ্ধসত্ত্ব হবে?" মা সংশয় প্রকাশ করেন।

"বিয়ে তো তুমি একবার দিয়েছিলে, মা। আবার দেওয়া তো তোমার দায়িত্ব নয়। যদি আবার হবার থাকে তো আমার দায়িত্বে হবে। তার দেরি আছে। তখন তুমি দেখবে যে আমার ভুল হয়নি।" জুলি আশ্বাস দেয়।

"কার কথা ভেবে বলছিস্? আমি কি তাকে চিনি?" মা কৌতূহলী হন।

"খুব চেনো। এগারো বছর ধরে চেনো।" জুলি টিপে টিপে হাসে।

"কে? কে? আমি তো ভেবে পাইনে।" মা পীড়াপীড়ি করেন।

"সৌম্যদা।" জুলি ফাঁস করে দেয়।

"কী যে বলিস্।" মা যেন আকাশ থেকে পড়েন। "পাগল আর কাকে বলে।" "ওর না আছে চাল, না আছে চুলো। বাপের সম্পত্তি ও ট্রাস্ট করে দিয়েছে। তার পর থেকে আশ্রমে আশ্রমে ঘুরছে। তোর সঙ্গে বিয়ে হলে তোকে নিয়ে ও রাখবে কোথায়? সংসারটা চলছে যে দুটো চাকায় তাদের একটার নাম টাকা। আরেক-টার নাম লাঠি। গান্ধী মহারাজ এর দুটোর একটাতেও বিশ্বাস করেন না। তাঁর শিষ্যও হয়েছে তাঁরই মতো। সংসার চলবে কী করে?" মা বার বার মাথা নাড়েন।

"তার অনেক দেরি আছে, মা। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। তার আগে ওঁর ব্রতভঙ্গ হবে না। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখনো অনির্দিষ্ট। উনিও কথা দেননি, আমিও কথা দিইনি। আমি ইচ্ছে করলে আর কাউকে বিয়ে করতে পারি। উনিও আর কাউকে। তবে এটাও মনে রেখো, মা, আমি আমার দিদিদের মতো টাকার জন্যে বিয়ে করব না বিপ্লবের দিন কোথায় থাকবে ওদের স্বামীদের সম্পত্তি! সব বাজেয়াপ্ত হবে। ওরা এমিগ্রি হয়ে বিদেশে পালিয়ে যাবে। নয়তো কচুকাটা হবে। তুমি ভাবছ সংসারের চাকার কথা। আমি ভাবছি ইতিহাসের চাকার কথা। সব টাকা সমাজের। সব লাঠি সমাজের। নিজের বলতে কারো কিছু থাকবে না।" জুলি করে ইতিহাসের ব্যাখ্যা।

ওর মা তর্ক করতে পারেন না। হাল ছেড়ে দেন। বলেন, "তার আগেই যেন আমার মরণ হয়। আমার যাতে আতঙ্ক তাতেই তোর উল্লাস। দেক্লাসে হওয়া যেন মস্ত বড়ো একটা বাহাদুরি।"

"সৌম্যদাও ওই লক্ষ্যে বিশ্বাসী। তবে ওর পন্থা অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী। সেটা নীতিহিসাবে শ্রেয়, কিন্তু পলিসিহিসাবে অকেজো। সেইজন্যেই তো আমি ওর সঙ্গে যোগ দিতে পারছিনে। ও বেচারা নিঃসঙ্গ।" জুলি দুঃখিত।

"সৌম্যকে আমি স্নেহও করি, শ্রদ্ধাও করি। ও তো মানুষের ভালো ছাড়া আর কিছু ভাবে না ও করে না। কিন্তু দুনিয়া বড়ো কঠিন ঠাঁই। যীশুকেও ক্রশে বিঁধে মারে। কেন? কারণ তিনি মানুষের চেয়ে বড়ো। তিনি অতিমানব। অতিমানব দেখলে আমি ডরাই। মহাত্মা যে এখনো বেঁচে আছেন এটাই আশ্চর্য। বড়ো হওয়ার শাস্তি আছে। সৌম্যর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে আমার ভাবনা বাড়বে।" মা উদ্বিগ্ন।

মা ও মেয়ে দু'জনেই দুটো গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন সুকুমারকে ও মিলিকে। দু'জনেরই শুভকামনা আন্তরিকায় ভরা।

কলকাতা এসে সুকুমার জুলিদের বাড়ীতেই ওঠে। সেখানে ওর বাঁধা নিমন্ত্রণ। এবার কিন্তু তার ব্যত্যয় ঘটে। কলকাতায় মুস্তাফীদের নিজস্ব বাড়ী আছে। সেটার একটা অংশ ভাড়াটেদের দখলে। একটা অংশ খালি। মুস্তাফীরা কলকাতা এলে সেখানে ওঠেন। এবার মিলি ও তার বরকে নিয়ে মুস্তাফীরা স্বামীস্ত্রী দু'জনেই আসেন। দু'জনেই যাবেন ওদের নিয়ে বম্বে। তুলে নিয়ে আসবেন জাহাজে।

হঠাৎ মিলি বলে বসে, "শ্বশুরবাড়ী যাব। শ্বশুরশাশুড়ীকে প্রণাম করব।"

সুকুমার বিব্রত হয়ে বলে, "কেন মিছিমিছি অপমান হতে যাবে? টাকা ছাড়া ওঁরা আর কিছু বোঝেন না। টাকা পাননি, সমর্থন করেননি।"

"আচ্ছা, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।" এই বলে মিলি অনেক টাকার বাজার করে, উপহার কেনে। যশোরে একটা টেলিগ্রাম করে দেয় যে পরের দিন আসছে। তারপরে আর যা করে তা শুধু বাবাকেই জানায়।

বাবা বলেন, "বিয়ের আগে যেটা দেওয়া হয় সেটার নাম পণ। বিয়ের পরে যেটা দেওয়া হয় সেটার নাম প্রণামী। আমি তো এতে নীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখিনে। তোমার যা সাধ্য তা তুমি দেবে। একটা মোহরও দিতে পারো, একশো একটা মোহরও দিতে পারো। শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনকেই দিয়ো। যদিও সৎশাশুড়ী।"

জুলি কাউকে জানতেই দিল না দোকানে গিয়ে ক'টা মোহর কিনেছে। তোড়া দুটোর আকার আর ওজন দেখে মুস্তাফী অনুমান করেন আড়াইশো আর আড়াইশো। সুকুমার তো বিস্ময়ে থ।

বিয়ের আসল মন্ত্র তো এই। মন্ত্রের মতো কাজ করে। শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনেই দুটি তোড়া পেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ। এ তাঁদের আশার অতীত। শাঁখ বেজে ওঠে, যথারীতি বধূবরণ হয়। মিলির কি আর সেই মিলিটাণ্ট চেহারা আছে? সে লাবণ্যময়ী লজ্জানম্র সুমঙ্গলী বধূ। পাড়ার মেয়েরা তাকে লুট করে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের বাড়ীতে সেও কিছু না কিছু প্রণামী দেয়।

জিতেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটা বৌভাতের আয়োজন করেন। এই জিনিসটি মিলি মনে মনে কামনা করেছিল। সব মেয়ের বিয়ের পরে বৌভাত হয়। ওর কেন হবে না? বিপ্লবের পরে কি বিয়ে থাকবে না, বৌভাত থাকবে না? থাকবে, থাকবে, সব থাকবে। স্ত্রী আচার লোকাচার কিছুই বাদ যাবে না। বাদ যাবে শুধু অলঙ্কারের বাহুল্য। বাবা যা দিয়েছিলেন তা বিলেত নিয়ে যাওয়া বৃথা। বিলেতে কেউ অত গয়না পরে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার একদিন সব সোনা কিনে নেবে। মিলি তাই সাধারণ ব্যবহারের জন্যে কয়েকখানা রেখে আর সমস্ত বিক্রী করে দেয় ও সেই টাকায় মোহর কেনে।

সুকুমার অনুমোদন করে না। মুখ ভার করে থাকে। মিলির মা নন্দরানীরও সেই রকম মনোভাব। কিন্তু ক্যাপটেন মুস্তাফী মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করে বলেন, "মিলি যা ঘটিয়েছে তা একটা বিপ্লব ছাড়া আর কী? সুকুমার এখন আর ত্যাজ্য-পুত্র নয়, পিতার উত্তরাধিকারী। তার বিবাহ এখন সর্বস্বীকৃত। তার বৌকে এখন সবাই আদর করে ঘরে তুলেছে। খরচ যা হয়েছে তা আমি পরে পুষিয়ে দিতে পারব। আনন্দ করো, আনন্দ করো। মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

জুলির মাকে সুকুমার মাসিমা বলে ডাকে। তিনিও তাকে মাসিমার মতো

ভালোবাসেন। বিলেতে যতদিন ছিলেন সুকুমার ছাড়া তাঁর একটা সপ্তাহও চলত না। অত রকম ফাইফরমাস খাটবে কে? জুলিকে সুকুমার বিয়ে করতে চেয়েছিল বিলেত থাকতেই। আবার তাকে বন্দীশিবির থেকে মুক্ত করার পর। সেদিন আবার ওর এস্কর্ট হয়ে। জুলি যদি বার বার প্রত্যাখ্যান করে তবে আরেকজনকে বিয়ে করা তো অপরাধ নয়। মিসেস সিন্‌হা সুকুমারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মিলির জন্যেও। ওরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতেই তিনি ওদের দু'জনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দু'জনের গালেই চুমু খান।

বলেন, "তোমাদের বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে, মিলি ও সুকুমার। আমার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। তবে জুলির সঙ্গে বদলে গেল।"

জুলি তখন বাড়ীতে ছিল না। তার মা বলেন, "জুলির বিয়ে যখন হবার তখন হবে। না হলেও যে আমি কাতর হব তা নয়। একবার তো ওর বিয়ে দিয়েছিলুম। কপালে সইল কই? জুলির না হয়ে মিলির হলো এতে আমি আরো খুশি। এ না হলে মিলি বেচারির একবারও বিয়ে হতো কি না সন্দেহ। সুকুমার, তুমি ঠিকই করেছ মিলির কাছে প্রপোজ করে। মিলি, তুমিও ঠিক করেছ অ্যাকসেপ্ট করে। এখন তোমরা হানিমুনে যাচ্ছ। যাত্রা শুভ হোক। সুকুমার, ওদেশে পৌঁছেই পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের একটা রিসেপশন দিয়ো। আমাকে যাঁরা চেনেন সবাইকে আমার প্রীতি জানিয়ো।"

জুলির সঙ্গে যাবার আগে দেখা করতে ব্যাকুল ছিল সুকুমার। মিলি এটা জানত, কিন্তু বাধা দিতে চায়নি। এগারো বছরের সম্পর্ক একদিনে বদলে যেতে পারে, কিন্তু কেটে যেতে পারে না। সে বলে, "মাসিমা, জুলিকে বোলো হাওড়া স্টেশনে আমাদের সী অফ করতে। হ্যাঁ, ইম্পীরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল। বোট ট্রেন। যুদ্ধের পরে দেশে ফিরব। আপাতত দীর্ঘকালের জন্যে বিদায়। জুলি আর মিলি আমরা ছেলেবেলার থেকে বন্ধু। এ বন্ধুতা যেন অক্ষয় থাকে। ও যেন বিশ্বাস করে যে ওর বরকে আমি ভুলিয়ে কেড়ে নিইনি। ও যেন বিশ্বাস করে যে এটা ঘটনাচক্রে ঘটেছে। ওর যাতে ভালো বিয়ে হয় তার জন্যে আমি যথাসাধ্য করব।"

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে জুলিকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে। দুই হাতে দুটো ফুলের তোড়া। বিরাট বিরাট। ওর পেছনে পেছনে ছুটে আসছে এক ঝাঁকা মুটে। তার ঝাঁকায় আপেল নাসপাতি কমলালেবু ইত্যাদি ফল। মিলি আর সুকুমার কামরায় তুলে নেয়।

"কী করব আমরা এত ফলমূল নিয়ে ?" মিলি জিজ্ঞাসা করে।

"যত ইচ্ছে খাবে। বাকীটা বিলিয়ে দেবে।" জুলি উত্তর দেয়।

"তা হলে এখনি বিলিয়ে দিই।" এই বলে মিলি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের হাতে দুটি তিনটি করে ফল ধরিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন মুস্তাফী, মিসেস মুস্তাফী, এঁরা তো ছিলেনই, ছিলেন বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব। যশোর থেকেও এসেছিলেন অনেকে।

মুস্তাফীরা সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ পরে নিজেদের কামরায় চলে যান। অন্যান্যরাও নেমে যান। তখন জুলি বলে মিলিকে ও স্বকুমারকে, "যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমি মিলির জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছি। মিলি আমার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছে। আমার যেদিন বিয়ে হবে সেদিন হিসাব মিলে যাবে। গরমিলটা সাময়িক।"

স্বকুমার স্বধায় মিলিকে, "এর অর্থ কিছু বুঝলে ?"

"পরিষ্কার। জুলির মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ক'জন !" মিলি হাসে।

"কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না।" স্বকুমার বলে।

"বুঝবে একদিন, যদি ওর স্বপ্ন সার্থক হয়।" মিলি সঙ্কেতে বলে।

জুলি বিদায় নিয়ে নেমে যায় ও রুমাল নাড়ে। ট্রেন ছেড়ে দিতে স্বকুমার বলে, "তুমি কার জন্যে ওকে পথ ছেড়ে দিলে ?"

"সৌম্যদার জন্যে।" মিলি মুখ নিচু করে। তার চোখে জল।

"বুঝেছি। সৌম্যদা মহান। তুমিও মহীয়সী। সোনায় সোহাগা হতো তুমি যদি ওকে বিয়ে করতে। আমি কি তোমার যোগ্য ! আমি যে মাঝারি! কিন্তু আকাশের চাঁদ যেমন দুর্লভ সৌম্যদাও তেমনি। মাটির প্রদীপই স্বলভ।" স্বকুমার সখেদে বলে।

"যে মানুষ নিজের উদ্যোগে পড়াশুনা চালিয়ে নিজের উদ্যোগে বিদেশে গিয়ে নিজের উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে সেদেশেই স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে কি স্বয়ংবরসভায় উত্তীর্ণ হয়নি ? আমি কি কৃতী পুরুষের কণ্ঠে মালা দিইনি ? আমি ঘরসংসার করতে চাই। আমার পক্ষে মাটির প্রদীপই ভালো।" মিলি তার হাতে হাত সঁপে দেয়।

জুলি যে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে এ কাঁটা স্বকুমারের মনে বিঁধে রয়েছে। সে বলে, "তোমাকে কখনো প্রত্যাখ্যানের বেদনা বহন করতে হয়নি, মিলি। তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করি সমবেদনা। এই যে তোমাকে নিয়ে আজ বিলেতের পথে

রওনা হচ্ছি এমনি একদিন জুলিকে নিয়েও রওনা হয়েছিলুম, বিয়ের আশায়। কিন্তু বম্বেতে ও আমাকে ছেড়ে সৌম্যদার সঙ্গে পুণা যায়। সে বেদনা কি আমি ভুলতে পারি? তবু আবার ও মেয়ের পেছনে ছুটেছি। আবার সেই বিয়ের আশায়। আবার সেই সৌম্যদার সঙ্গে দেখা। আবার তেমনি ভাঙচি। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নইলে আমাকে আবার খালি হাতে বিলেত ফিরে যেতে হতো। তুমি আমার মুখরক্ষা করেছ। তুমি আমার মানরক্ষা করেছ। তুমি যেন ঈশ্বরের প্রেরিত। গডসেণ্ড। জুলির চেয়ে তুমি কোন্ অংশে খাটো? আমি তো মনে করি তুমিই ওর চেয়ে বড়ো। ইতিহাসে তোমারই নাম থাকবে। যদি না জুলি পরবর্তী অধ্যায়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আরো নাম করে। কোথায় বিপ্লব! ও একটা আলেয়ার পানে ছুটেছে। তেমনি আরেক আলেয়া সৌম্যদা। ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দেশ যতদিন না স্বাধীন হয়েছে ততদিন ও অবিবাহিত থাকবে। তা হলে জুলির কী আশা! স্বাধীনতা কি কেউ জয় করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে? হতে কতকাল লাগবে! সৌম্যদা দশবছর অপেক্ষা করতে পারে, জুলি কি ততকাল পারবে? যদি পারে তবে হয়তো একদিন ওর স্বপ্ন সার্থক হবে। আর নয়তো একটা বাজে ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, দেখো। যেমন চেখভের গল্পে হয়।"

মিলি একটু ভেবে নিয়ে বলে, "জুলি বা আমার মতো মেয়ের স্বপ্ন কি একটি মনের মতো বর ও শান্তিময় ঘর? আমাদের স্বপ্ন বিশাল ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, মুক্ত পক্ষে অবাধ সঞ্চরণের আকাশ। আমাদের স্বপ্ন আত্ম আবিষ্কার, আত্মবিকাশ। আমরা যখন দেশের স্বাধীনতার বা তার বৈপ্লবিক রূপের ধ্যান করি তখন বর ও ঘর যেন সিন্ধুর মাঝখানে বিন্দু। তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মহিমা নেই। বিয়ে না হলে নারী অপূর্ণ থেকে যায়, নারীত্বের হানি হয়, আমরা একথা মানিনে। মা না হলে নারীর জীবন অচরিতার্থ এটাও তেমনি অসত্য। কিন্তু বয়স যতই বাড়ছে ততই অনুভব করছি যে পাখীর কাছে আকাশ যেমন আবশ্যক নীড়ও তেমনি প্রিয়। স্বভাবতই মন চাইছে স্থিতি। দেহ চাইছে সঙ্গ। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিলুম না। তুমি আমাকে বাঁচালে। এখন জুলির বাঁচা দরকার। সেও কি বেশীদিন অপেক্ষা করতে পারবে? দশ বছর! জাতির জীবনে দশটা বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে? বিশেষ করে নারীর জীবনে।"

"বেচারি জুলি! ওর জন্যে কী আমরা করতে পারি? ও যদি আর কাউকে বিয়ে করতে রাজী হয় তো ছেলের খোঁজ করতে পারি। কিন্তু সৌম্যদাকে পেতে হলে ওকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতে হবে।" সুকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

"যদি না অকস্মাৎ একটা কিছু ঘটে যায়। বিপ্লব কি গণসত্যাগ্রহ কি মিউটিনি। জুলির বিশ্বাস তেমন কিছু ঘটবে ও তাতে তার হাত থাকবে। সে-ই তাকে ঘটাবে। এই নিয়ে সে বর ও ঘর ভুলে থাকছে। কিন্তু কদ্দিন পারবে! সাতবছর আগেও তো মনে হয়েছিল বিপ্লব আসন্ন। সাহেব খুন করলেই সাহেবরা পালাবে। ক্ষমতা দখল করবে বিপ্লবীরা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। বাংলার ভাগ্যে যা হয়েছে তাতে কি বিপ্লবীদের কোনো ঠাই আছে? জেল থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেন ছাড়া পাবার জন্যেই তারা লড়েছিল। আরো একবার লড়তে কে উৎসাহ বোধ করবে? আমি তো নয়। জুলির উৎসাহ আমাকে লজ্জা দেয়। ওকে তো আমার মতো পাঁচ বছর দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। তুমি যদি ওকে সে সময় উদ্ধার না করতে তা হলে ওকেও আমারই মতো দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তবে ওর অপরাধটা আমার মতো অত গুরুতর ছিল না। কিন্তু তুমি সৌম্যদার উপর অবিচার করলে, সুকুমার।" মিলি ওর স্বামীকে নাম ধরেই ডাকে। যেমন স্বামী ওকে।

"অবিচার!" সুকুমার চমকে ওঠে। "কেন অবিচার?"

"বম্বেতে জুলির সঙ্গে সৌম্যদার দেখা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। সৌম্যদা জুলিকে তোমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেয়নি। ও ভাবতেই পারেনি যে তুমি জুলিকে নিজের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছ। ও ভেবেছিল তুমি নিঃস্বার্থ ও নিঃস্পৃহ পরমহংস। জুলিকে প্রশ্ন করে ও জানতে পারে যে বিলেতে ফিরে যাবার ইচ্ছে ওর একেবারেই নেই। ইংরেজদের উপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে। ও দেশে থেকে দেশের মুক্তির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়। বিবাহে ওর রুচি নেই। বিধবার বিবাহ দেশের লোক শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সেইজন্যেই তো ওকে পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। আচার্য কার্বে বিধবাবিবাহের সমর্থক। সৌম্যদা সেটা নিজের স্বার্থে করেনি। ও জানত যে দেশের স্বাধীনতা পেছিয়ে গেলে ওর নিজের বিবাহও পেছিয়ে যাবে অনির্দিষ্টকাল। জুলি বা তার বয়সের একটি মেয়ে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে পারে না। জুলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা সম্পূর্ণ নিষ্কাম। আমার সঙ্গেও তাই। জুলিও যে ওর জন্যে তোমাকে ছাড়বে এটাও তো সে কোনদিন প্রকাশ করেনি। এই প্রথম করছে। এর জন্যে সৌম্যদা দায়ী নয়। মিলি না হয়ে জুলি হলেও সে সানন্দে বরকর্তার ভূমিকা নিত। তুমি যদি ওকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে তা হলে এটাও জানতে যে ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত হচ্ছে। ও বলে দেশের জন্যে কতক লোককে মৃত্যু বরণ করতে হবে, কিন্তু সন্ত্রাস-

বাদীদের মতো মেরে মরতে নয়। ও কি বাঁচবে যে বিয়ে করবে!" মিলির ছ'চোখ সজল হয়।

"সৌম্যদা কিন্তু আগে এ রকম ছিল না, মিলি। বিলেতে ওর সঙ্গে বছর দুই কাটিয়েছি। তখন ও আদর্শ প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। তাঁরা বিবাহ করতেন। তাঁদের পুত্রকন্যা হতো। তপোবনের ঋষিরাই সমাজের পথপ্রদর্শক। সৌম্যদা চেয়েছিল এমন একজনকে যে হতো সেকালের ঋষিপত্নী। বাস করত শহরে নয়, গ্রামে। যে গ্রাম অরণ্যবেষ্টিত। প্রকৃতির কোলে লালিত হতো ওদের সন্তান। গ্রামই তো প্রকৃত ভারত। শহর বিজাতীয়। বিলেতে থাকতেই অলকা বলে একটি মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু ওর আদর্শের প্রেমে নয়। অলকা চায় কলকাতায় ঘরসংসার পেতে নাগরিক সমাজের একজন হতে। ওর বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার। সৌম্যকে ও মেয়েটি নিজের ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল সৌম্য যেন একটা বিলিতী ডিগ্রী নিয়ে ফেরে। পদস্থ রাজকর্মচারী হয়। নয়তো ব্যারিস্টার। সৌম্যদা তেমন শর্তে বাঁধা পড়তে নারাজ। অপর পক্ষে অলকাও পল্লীবাসিনী ঋষিপত্নী হবে না। প্রেম পরাজিত হয় ভিন্নমুখী জীবনধারার কাছে। এই তো আমি জানতুম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই সত্য ও অহিংসায় সৌম্যদার বিশ্বাস। কিন্তু যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়েছে ততদিন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে এমন কোনো পণ ওকে গার্হস্থ্যবিমুখ করেনি। দশবছর আগে এই তো আমি জানতুম। এখন দেখছি ওর আদর্শ ঋষিদের তপোবন নয়, সন্ন্যাসীদের আশ্রম। স্ত্রী থাকলে সেও হবে সন্ন্যাসিনী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে এই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে যাঁরা প্রস্তুত তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার মতে তাঁদের এই আদর্শ সামাজিক মানুষদের জন্যে নয়।" সুকুমার অনুমোদন করে না।

"অলকার কথা কেউ আমাকে বলেনি। সৌম্যদা তা হলে গৃহস্থ হতে রাজী ছিল, যদি অলকা ওর সঙ্গে ওর গ্রামে গিয়ে নীড় বাঁধত। জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি পার হয়ে যাবার পর ওর মতিগতি বদলে যায়। ও লবণ সত্যাগ্রহে গান্ধীজীর অনুচর হয়ে কারাবরণ করে। মুক্তির পর তাঁরই নির্দেশে হরিজন সেবায় লেগে যায়। তিনিই ওকে পূর্ববঙ্গে ঘাঁটি গড়তে প্রবর্তনা দেন। লক্ষ্য রাখতে বলেছেন যাতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটাতে চিড় না ধরে। মহাত্মার আশঙ্কা যে সমস্যাটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নেতারা সবাই তো কলকাতার মোহে মত্ত। মফঃস্বলে তাঁরা সফর করতে আসেন। ছ'দিন থাকেন। চরকার মতো ঘোরেন। তারপর মধুচক্রে

ফিরে যান। সৌম্যদা মাটি কামড়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে সেগাঁওতে যায়, পথে কলকাতায় একদিন কি দু'দিন থামে। কাজের জন্যেই। ওর জীবনদর্শন ক্রমে স্টোইক হয়ে উঠছে। সুখ শান্তি ওর জন্যে নয়। ওর জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। নিজের মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে। তবে ও হাসতে ভুলে যায়নি। খেলাধূলাও করে। যাত্রায় নারদ সাজে। মুসলমানদের নাটকে আলীবাবা। ও গায়ও ভালো। বাঁশিও বাজায়। অথচ খাবে ওই আকাঁড়া চালের ভাত। গান্ধীজীর আশ্রমে ওইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।" মিলি কৌতুকের সঙ্গে বলে।

"সব ভালো যার শেষ ভালো। শেষ ভালো হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা। হবে একদিন তার অভীষ্ট পূরণ। তখন আসবে ঘরসংসার পাতার সময়। আশা করি জুলির সঙ্গেই। লেবার পার্টিতে আমার বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁরা ভারতের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে। স্বাধীনতা বলতে যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বোঝায় তো দশবছর লাগবে না। তার আগেই লেবার গভর্নমেণ্ট আসবে। কিন্তু যুদ্ধকালে নয়। যুদ্ধকালে সর্বদলীয় সরকার। সকলের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের উপর চাপ না দিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। তা হলেও আমি অধ্যাপক ডালটনকে ভারতের জন্যে তদ্বির করতে বলব। জানো তো আমি তাঁর ছাত্র। হ্যাঁ, ল্যাস্কির কাছেও পড়েছি।" সুকুমার সগর্বে বলে।

"ভারতের স্বাধীনতা হবে রাজ অনুগ্রহে!" মিলি ঠোঁট ওলটায়।

পরের দিন রেস্তোরাঁ কারের ব্রেকফাস্ট টেবিলে মুস্তাফী দম্পতির সঙ্গে ভোজন। রাত্রে ঘুম কেমন হলো জিজ্ঞাসা করতে মিসেস বলেন, "চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সাত সমুদ্দর পারে তোরা যাচ্ছিস্। তাও যুদ্ধক্ষেত্রে।"

"যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কিন্তু অঘোরে ঘুমোতুম। ভয়ের মাঝখানে পড়লে ভয় চলে যায়। তোমরা দেখবে ইংরেজরা কেমন নির্ভীক। ন'শো বছর আগে নর্মানরা ওদের দেশ আক্রমণ করেছিল। তারাও পরে ইংরেজ বনে যায়। তার পর থেকে আর কেউ ওদের আক্রমণ করেনি। না স্পেনের আর্মাডা। না নেপোলিয়নের আর্মি। এবার কিন্তু হিটলারের জার্মানরা হানা দেবে জলে স্থলে আকাশে। নর্মানের পর জার্মান। ভাবনা করি। ঘুম আসে না।" ক্যাপটেন বলেন।

"আকাশপথে ক'হাজার ল্যাণ্ড করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে কোতল হবে। জলপথ নিয়েই ভাবনা। কিন্তু আমাদের নেভী ওদের নেভীর চেয়ে প্রবল। ওরা ল্যাণ্ড করার আগেই খতম হবে। বোমাবর্ষণকেই ভয়। তা আমরাও পাল্টা দিতে ছাড়ব না দেখবেন।" সুকুমারের 'আমরা' অবশ্য ভারতীয়রা নয়। সবাই হাসে।

ব্রেকফাস্টের পরে যে যার কামরায় যান। লাঞ্চের সময় আবার একত্রভোজন।

"তোমাদের কুশলসংবাদের জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকব। এয়ার মেলে চিঠি লিখো। আশা করি জাহাজের ডাকও বন্ধ হবে না।" মুস্তাফী বলেন।

"জাহাজের ডাকের অন্য ব্যবস্থা হবে। তবে দেরি হতে পারে।" সুকুমার সুনিশ্চিত।

মিলির মা এমন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকান যেন আর কোনোদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। ওই শেষ দেখা। বাবা যদিও ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন তবু বাইরে নির্বিকার।

বম্বেতে পৌঁছে টমাস কুকের অফিসে গিয়ে জানা গেল যে জাহাজ যাবে ভূমধ্য সাগর দিয়ে যথারীতি। কারণ ইটালী এখনো যুদ্ধঘোষণা করেনি ও ইটালিয়ান জাহাজ নিয়মিত যাতায়াত করছে। সুতরাং সুকুমারের পি অ্যাণ্ড ও জাহাজ 'স্ট্রাথমোর' তো সুয়েজের পথে যাবেই, ঐ জাহাজও শেষ ব্রিটিশ যাত্রী জাহাজ নয়।

"ওঃ। যা তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিলে তুমি। কী ক্ষতি হতো আরো কিছুদিন বাদে গেলে?" মিলি অনুযোগ করে।

"আহা, আমি কী করে জানব যে মুসোলিনি হিটলারের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে না? সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করবে না!" কৈফিয়ৎ দেয় সুকুমার। "তা ছাড়া তোমার কলেজ তো এর মধ্যেই খুলে গেছে। আরো দেরি করলে ওরা এ বছর নেবে না।"

"তা হলে তুমি সত্যিই চাও আমি আরো পড়াশুনা করি?" মিলি সুধায়।

"নিশ্চয় চাই। আধুনিক জগতের কেন্দ্রস্থল হলো লণ্ডন। সেখানে বাস করে তুমি আরো পড়াশুনা করবে, আরো জানবে শুনবে শিখবে। তখন বুঝতে পারবে যে এতদিন যা সত্য ভেবেছ তা সত্য নয়, যা অসত্য ভেবেছ তা অসত্য নয়। তোমার কর্মপদ্ধতি কেন সফল হয়নি তার অর্থ খুঁজে পাবে। বিপ্লব কি চাইলেই হয়? জুলি একটা ভ্রান্তির গোলোকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।" সুকুমার আবার জুলিকে স্মরণ করে।

"জুলি তো বলে তুমি একজন এমিগ্রি, তোমার সঙ্গে এসেছি বলে আমিও তাই। বিপ্লবের আগে ভাগেই আমরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছি। আমারও কতকটা সেইরকম মনে হচ্ছে। মা বাবার জন্যে আশঙ্কা হচ্ছে। বিপ্লবী জনতা যদি ওঁদের বুর্জোয়া বলে শেষ করে না দেয় বিপ্লবী সরকার ওঁদের লিকুইডেট করবে। আমি দেশে থাকলে আমার নাম ক'রে হয়তো ওঁরা বেঁচে যেতেন। কিন্তু আমি এমিগ্রি বলে উল্টো ফল হবে।" মিলি কাতর হয়।

"ওঁদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ডাক্তারকে কেউ মারবে না। দানশীলতার জন্যে ওঁরা বিখ্যাত। হিন্দু-মুসলমান সবাই ওঁদের চায়। ওঁরা বাঁচবেনই। পিছুটান ছেড়ে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।" সুকুমার বলে।

মিলির বিয়েতে তার দাদা শিবপ্রসাদ উপস্থিত হতে পারেন নি। থাকেন তিনি বম্বে প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণপ্রান্তে ধারওয়ারে। উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসার। বোনকে বিদায় দিতে বম্বে আসেন। ক্রিকেট ক্লাব অভ ইণ্ডিয়াতে তাঁর বন্ধু জয়ন্ত চক্রবর্তীর স্থায়ী অধিষ্ঠান। দাদা নিজেও সেখানকার সদস্য। দুই বন্ধুতে মিলে ক্রিকেট ক্লাবেই মিলিদের চারজনের বন্দোবস্ত করে দেন।

ছোটবোনের বিয়ে না হলে দাদাও বিয়ে করবেন না, এ রকম একটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও ছিল তাঁর। মিলি তাঁকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, "দাদা, এবার তোমার পালা। তুমি যদি ঘরে বৌ আনো তো মা বাবা একটু শান্তি পান। বুঝতেই তো পারছ, আমি যাচ্ছি সাত সমুদ্রপারে। যেখানে যুদ্ধ বেধে গেছে। কবে দেখা হবে, আদৌ হবে কি না কে জানে? আমি না থাকলে তুমিই একমাত্র সন্তান।"

"ছি! অমন কথা বলতে নেই, বোন। দেখা আবার হবেই। লণ্ডনে আমার বন্ধুবান্ধব আছে। ভারতীয় আর ইংরেজ। সবাইকে আমি চিঠি লিখেছি। চিঠিগুলো তোর হাতেই দিচ্ছি। পৌঁছেই ডাকে ছেড়ে দিস্। কিন্তু ভাবনার কথা হচ্ছে পৌঁছবি কেমন করে। যুদ্ধের অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাচ্ছে। মুসোলিনি যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে তা হলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে কবে যে ইংলণ্ডে পৌঁছবে কে জানে।" শিবপ্রসাদ চিন্তিত হন।

"কেন, কুক তো আমাদের বলেছে এ জাহাজ ভূমধ্যসাগরের পথেই যাচ্ছে।" মিলি সুকুমারকে সাক্ষী মানে।

"কুক কেমন করে জানবে মুসোলিনির মনে কী আছে। কাজেই অতটা আশাবাদী না হওয়াই ভালো। তবে হতাশারও হেতু নেই। পৌঁছে দেবে ঠিকই। ভালোই তো। হানিমুন আরো দীর্ঘ হবে।" শিবপ্রসাদ রঙ্গ করেন।

সুকুমারও সকৌতুকে বলে, "মুন মানে এখানে চাঁদ নয়, মুন মানে মাস। পুরো একমাস যদি জাহাজে কেটে যায় সেটাকে তো দীর্ঘ বলা চলে না।"

"তা হলেই হয়েছে আমার কলেজে ভর্তি হওয়া।" মিলি রাগ করে। "আমি কি তবে বিলেত যাচ্ছি ঘরকন্না করতে? না, আমি ক্যানসেল করব।"

"তুমি না থাকলে আমি একা একা গেরস্তালী করব নাকি? যুদ্ধে নাম লিখিয়ে আমি ফ্রন্টে গিয়ে লড়ব।" সুকুমার হাসিমুখে বলে।

"কী সর্বনাশ! সেই ভয়ে আমাকে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলতে হবে?" মিলি আঁতকে ওঠে।

"ক্ষেপেছ? রান্নার পাট ওদেশে খুবই সংক্ষিপ্ত। চল তো আমার সঙ্গে। দেখবে তোমার জন্যে কলেজের দুয়ার খুলে যাবে। স্বয়ং সার জন অ্যাণ্ডারসনকেই ধরব। পুরনো টেররিস্টদের দিকে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।" সুকুমার আশ্বাস দেয়।

"আমি তাঁর সাহায্য চাইব কোন মুখে? খবরদার, তুমি ওঁর কাছে যেয়ো না। আমি নিজেই কলেজে গিয়ে সব কথা খুলে বলব।" মিলি দৃপ্ত কণ্ঠে বলে।

ক্যাপটেন মুস্তাফী বলেন, "জাহাজের উপরে তো কারো হাত নেই। সেটা কি ওরা বুঝবে না? আমিও এয়ার মেলে চিঠি লিখে সব কথা খুলে বলেছি।"

"আমিও আমার বন্ধুদের কাছে এয়ার মেলে এই সমস্যার কথা জানিয়ে রাখছি। দেখাই যাক না জাহাজ কোন্ পথে যায়।" শিবপ্রসাদ ভরসা দেন।

মিলির মা মনটাকে বেঁধে শক্ত করেছিলেন। মিলি দেশে থাকলে নির্ঘাত জেল। যাত্রাভঙ্গ করা কিছুতেই নয়। একবার যখন বেরিয়ে পড়েছে তখন এগিয়েই যাক। যা থাকে কপালে। ওর বাপ তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অক্ষত ফিরেছিলেন। ভগবান রক্ষা করবেন।

মিলির শেষ অনুরোধ, "মা, এবার দাদার বিয়ে দিয়ো। শুনেছি ও নাকি বম্বেতেই হৃদয় হারিয়েছে। দাদা, শুভস্য শীঘ্রম্।"

॥ আট ॥

মণিকা ওইটুকু মেয়ে। ও "জ্যাঠামশায়" বলতে পারে না। তাই ওর মা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে সৌম্যকে 'জেঠু' বলে ডাকতে। দীপক কিন্তু 'জ্যাঠামশায়' বলে ডাকে।

"জেঠু", "জেঠু", "জ্যাঠামশায়", "জ্যাঠামশায়।" দূর থেকে সৌম্যকে আসতে দেখে ভাই বোন দু'জনে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে দৌড়য়। সৌম্য মণিকে দুই হাতে তুলে নিয়ে কাঁধে চড়ায়। সেও জেঠুর মাথা চেপে ধরে। দীপক ততক্ষণ জ্যাঠামশাইয়ের বগল থেকে ঝোলা কেড়ে নিয়ে বগলদাবা করেছে।

"শম্ভুবাবু এসেছেন।" ভিতরে গিয়ে খবর দেয় বেয়ারা।

"শম্ভুবাবু" শুনে যুথিকা মানসের দিকে তাকায়। মানস যুথিকার দিকে। কিন্তু ঝড়ের মতো দীপক ঘরে ঢুকে বলে, "জ্যাঠামশায় কী এনেছে, ভাখ। হা হা হা! গণ্ডার। শজারু বানাতে গিয়ে গণ্ডার বানিয়েছে। সাপটা কিন্তু অজগর।"

সৌম্যর কাঁধ থেকে মণি নামে না। নামতে চায় না। সৌম্য ওকে কাঁধে নিয়েই ঘরে ঢোকে। চেয়ারে বসে। ওর মা রাগ করে। জেঠু ওর জন্যে একটা পুতুল এনেছিল, সেটা দিতেই নামে।

"দত্তবিশ্বাস বম্বে থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে ওরা নিরাপদে পৌঁছেছে। তোমাকে জানাতে বলেছে।" মানস বলে।

"আমি মুস্তাফীদের ওখান থেকেই জেনেছি। ওঁরাও প্রতিষ্ঠানে টেলিগ্রাম করেছেন ও আমাকে জানাতে বলেছেন।" সৌম্য বলে।

"আমিও বঁ ভোয়াজ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলুম কুকের কেয়ারে। বম্বেতে। যাতে জাহাজে ওঠার আগে পায়।" মানস আরো বলে।

"কুকের কথায় মনে পড়ল বছর ছয়েক আগে জুলিকে নিয়ে সুকুমার আর আমি ওদের ওখানে যাই। জুলি ওর প্যাসেজ ক্যানসেল করে। সুকুমার তো আমাকেই দোষ দেয়। আমি ওকে বুঝিয়ে বলি যে জুলি কারাগার থেকে মুক্ত হলেও সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত হয়নি। ওর দাদারা ওকে যে নির্দেশ দেবে ও বিলেতে গিয়েও সেই নির্দেশ পালন করবে। তখন তো আবার সেই কারাগার। তার চেয়ে ছেড়ে দাও আমার হাতে। ওকে আমি পুণায় নিয়ে যাব। আমাকে ওখানে থাকতে হবে গান্ধীজীর কাছাকাছি। জুলি থাকবে আমার কাছাকাছি ওকে দেব মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ও পড়াশুনা করবে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হবে। গান্ধীজী জেল থেকেই হরিজনদের সেবা করে যাচ্ছেন। আমি ছাড়া পেয়ে বাইরে থেকে ওঁর কাজে সাহায্য করেছি। জুলি যদি আমাদের কাজকর্ম দেখে তবে ওরও অন্তঃপরিবর্তন হবে। বিয়ের সময় এখন নয়। বিলেতে গেলেই যে ও বিয়েতে রাজী হবে তা নয়। সুকুমার যেন ধৈর্য ধরে।" সৌম্য শোনায় স্মৃতিকথা।

"ওর মা তখন ওর সঙ্গে ছিলেন না?" জিজ্ঞাসু হয় মানস।

"না। সুকুমারকে উনি বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া উনি তো ধরে নিয়েছিলেন যে ওটা বিবাহের পূর্ব শর্ত। পরে আমি তাঁকে চিঠি লিখতেই তিনি সমর্থন করেন। জুলির সঙ্গে যথেষ্ট ট্রাভেলার্স চেক ছিল। পরে ওর মা আরো টাকা পাঠান। কিন্তু শেষপর্যন্ত জুলির মন টেকে ন'। সন্ত্রাসবাদটা ও সত্যি কাটিয়ে ওঠে। দেশেরও আবহাওয়া বদলে গেছে। জুলি মায়ের কাছে ফিরে যায়। সরকার বাধা দেয় না। আমিও গান্ধীজীর পিছু পিছু ওয়ার্ধা যাই। সেখান থেকে সেগাঁও। জুলির দায় থেকে আমিও মুক্ত। আমার তত্ত্বাবধান থেকে জুলিও মুক্ত। ওদিকে সুকুমারও বিবাহের পূর্ব প্রস্তাব থেকে মুক্ত।" সৌম্য মুক্তির সমাচার শোনায়।

"কিন্তু জুলিকে কারামুক্ত করে ও যে উপকার করেছিল সেটার পরিবর্তে ওর তো কিছু পাবার কথা ছিল। ও কি এতদূর এসেছিল অমনি ফিরে যেতে?" মানস সুধায়।

"ওটা বন্ধুকৃত্য। বিবাহ ওর প্রতিদান নয়।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"সব ভালো যার শেষ ভালো। দত্তবিশ্বাসকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হলো না। কিন্তু হতেও তো পারত। তখন বন্ধুকৃত্য বলে কী করে ওকে সান্ত্বনা দিতে? তোমার উপরে ও রীতিমতো বিরূপ। তুমি ওকে একবার শিশুপাল করেছিলে, কিন্তু নিজে রুক্মিণীকে বিয়ে করোনি। আবার শিশুপাল করলে, এবারেও রুক্মিণীকে বিয়ে করার নামগন্ধ নেই। তবে শিশুপাল এবার শুধু হাতে ফিরে যায়নি। রুক্মিণীর সখীকে

বিয়ে করে নিয়ে গেছে। জুলির মা যা চেয়েছিলেন তা হলো না। মেয়ের সামনে বন্দীশিবিরের বিপদ। সে নিজেও বিবাহবন্ধনের পরিবর্তে কারাবন্ধন পছন্দ করে। পাগলীর ধারণা ফরাসী বিপ্লবে যেমন বাস্তিলের পতন এদেশেও তেমনি বক্সার পতন ঘটবে। জনতা গিয়ে পাঁচিল ভেঙে উদ্ধার করবে বন্দীদের। জুলি পড়াশুনা কিছু কম করেনি। কিন্তু সমস্তই একতরফা। বিপ্লবের তত্ত্ব ও ইতিহাস বা পুরাণ। পুরাণকে ইতিহাস বলে চালানো কেবল প্রাচীন হিন্দুদের একচেটে নয়। আধুনিক বিপ্লববাদীদেরও পুরাণ তৈরির উপর আগ্রহ। ট্রট্স্কি বলে আস্ত একটা ঐতিহাসিক চরিত্রকে ইতিহাস থেকে বেবাক মুছে ফেলা হয়েছে স্টালিনের মহিমা প্রচার করতে। জুলিকে তুমি পুণা নিয়ে গেলে সন্ত্রাসবাদের মোহ থেকে মুক্ত করতে। সেটা দত্তবিশ্বাসকে দিয়ে হতো না। কিন্তু পারলে কি ওকে বিপ্লববাদের মোহ থেকে মুক্ত করতে? কলকাতায় ফিরে এসে ও আবার সেই পুরাতন চক্রে ভিড়ে যায়। এবারকার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠাভূমি মার্কস কথিত সুসমাচার। সন্ত্রাসবাদীরা আর ক'টা মানুষ মারত! এরা তো শ্রেণীকে শ্রেণী লিকুইডেট করবে।" মানস শিউরে ওঠে।

"তার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে হবে। সে কাজটা যদি ওরা নিষ্পন্ন করার আগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাই নিষ্পন্ন করে তা হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাই জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠন কয়বে। সে সরকার যতদিন না জনগণের আস্থা হারাচ্ছে ততদিন ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না। মাঝখানকার এই যে অধ্যায়টা এটাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বিপ্লব যদি পরাধীন ভারতের মাটিতে ঘটে তবে সেটা হবে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব। তাতে গান্ধী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদেরও ভূমিকা থাকবে। ভূমিকা থাকবে জবাহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ নারায়ণেরও। মার্কস লেনিনবাদীরা এঁদের পর বিপ্লব করতে গেলে দেখবেন যে বিপ্লবের যা প্রেস্টিজ তা এঁরাই অর্জন করে বসে আছেন। এঁদের বঞ্চিত করতে হলে পৃথকভাবে বিপ্লব ঘটাতে হয়। সেটা কি এঁদের সাধ্যে কুলোবে? তাই এঁরা কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকেছেন। কিন্তু তাতেও কি এঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে? আসল সিদ্ধান্তটা তো গান্ধীজীর হাতে। তিনি এগিয়ে না এলে কেউ তাঁর আগে এগোতে সাহস পাবে না। যদি সাহস পায় তবে অসময়ে ধরা পড়বে। জনগণ সাড়া দেবে না। গান্ধীজীর যখন সিদ্ধান্ত নেবার দিন আসবে তখন তিনিই তো সংগ্রামের একমাত্র পরিচালক। সফল হলে তাঁরই তো একচ্ছত্র নেতৃত্ব। বিফল হলে অবশ্য অন্য কথা। সেক্ষেত্রে মার্কসপন্থী বিপ্লবীদের একটা ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সফল হলে তাঁদেরই একচ্ছত্র নেতৃত্ব হবে। বিফল হলে তাঁরাও নেতৃত্ব হারাবেন। সফল যে তাঁরা হবেনই এটা যুক্তির কথা নয়, বিশ্বাসের কথা।" সৌম্য নীরব হয়।

এমন সময় মধ্যাহ্নভোজনের আহ্বান আসে। ছোটদের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন বড়োদের পালা।

"মিলির তো একটা হিল্লে হলো," যূথিকা বলে, "এবার জুলিরও একটা হিল্লে হয় না? নিজের ঘরসংসার হলে ও মা দুর্গার মতো তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মা কালীর মতো মার মার কাট কাট করে বেড়াবে না।"

"ওর মায়েরও সেই বক্তব্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা!" সৌম্য সায় দেয়।

"শুনবে, যদি একজন তপস্বী তপোভঙ্গ করেন।" ইঙ্গিত করে যূথিকা।

"করবেন যখন তপস্যার ফল ফলবে। দেশের স্বাধীনতা। সেই স্বর্গে দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের ইন্দ্রত্ব। তিনি তখন সরে দাঁড়াবেন।" সৌম্য আশা দেয়।

"কেন? কেন? তিনি কি ইন্দ্রত্ব কামনা করেন না।" যূথিকা আশ্চর্য হয়।

"ইন্দ্রকেও প্রয়োজনে বজ্র প্রযোগ করতে হয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের হাতে শাস্তির ক্ষমতাও থাকবে। যাঁরা সৈন্য পুলিস ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক তাঁদের কর্তব্য রাষ্ট্রব দায়িত্ব না নেওয়া। গান্ধীজী কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুমতি দেবার আগে আপনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য কেবল স্বাধীনতা অর্জন নয়, শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠান। স্বাধীনতা অর্জনে অহিংসাই যথেষ্ট, কিন্তু শাসনের কাজও যে সৈন্য পুলিস জেল আদালত বিনা চলে একথা কংগ্রেস নেতারা মেনে নিতে নারাজ। গান্ধীজীও বোঝেন যে সেটা আপাতত অবাস্তব। কিন্তু সে আদর্শ তো তিনি ত্যাগ করবেন না। একা একাই যতদূর পারেন এগোবেন। আমিও তাঁর সঙ্গে পা মেলাব।" সৌম্য খুলে বলে।

"অবাস্তব বলে অবাস্তব।" মানস তার অভিজ্ঞতা থেকে বলে। "শাসনের দায়িত্ব নিলে শাসনের ক্ষমতাও হাতে থাকা চাই। তবে ক্ষমতা আছে বলে বেহিসাবীভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। গণতন্ত্রে হিসাবনিকাশের দায় আছে। পার্লামেন্টের কাছে। ইলেকটোরেটের কাছে। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতর আদালতের কাছেও। স্বাধীনতার পরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে হবে। কংগ্রেস নেতারা তাই সংবিধান সভার দাবী তুলেছেন।"

যূথিকার জ্ঞাতব্য ছিল জুলির ভাগ্যে বিবাহ আছে কি না। সে বলে, "তা হলে, দাদা, তুমি স্বাধীনতার পরেও তোমার তপস্যা চালিয়ে যাবে? আশ্রমেই তোমার অবশিষ্ট জীবন কাটবে?"

"বুঝেছি তুমি যা শুনতে চাও।" সৌম্য হেসে বলে, "না, স্বাধীনতার পরে তেমন কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আমাব নেই। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেবার আগে তো আমি বিবাহের জন্যে দ্বার খোলা রেখেছিলুম। অলকনন্দা যদি গ্রামে গিয়ে সংসার পাততে রাজী হতো আমিও তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলুম। মানস তোমাকে বলেনি ও কথা? মানস, তোমার মনে পড়ে অলকাকে?" সৌম্য যুথিকাকে ছেড়ে মানসকে সুধায়।

"কই, আমাকে তো উনি বলেননি।" যুথিকা উত্তর দেয়।

"মনে পড়ে বইকি। সার অজিত মজুমদারের কন্যা অলকনন্দা। তুমি ওকে গ্রামিকা করতে চেয়েছিলে। আর ও চেয়েছিল তোমাকে নাগরিক করতে। আমি তখন ছিলুম অলকনন্দারই পক্ষে। কারণ আমি ছিলুম আধুনিকতার পক্ষে। ইতিমধ্যে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের পক্ষপাতী হয়েছি। আধুনিকতার সে জলুসও আর নেই, সে আবার এক মহাযুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে। আমার এখন অর্জুনবিষাদ।" মানস গীতার আশ্রয় নেয়।

"অর্জুনবিষাদ!" সৌম্য জিজ্ঞাসু হয়।

"জার্মানীতে আমি কত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখেছি। কত অজানা অচেনা লোকের কাছে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি। সবাই তো নাৎসী নয়, কিন্তু সবাই হচ্ছে জার্মান। নাৎসীদের বিনাশ করতে গিয়ে জার্মানদের নির্বিচারে বিনাশ করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে তাদের যুগ যুগান্তরের শিল্পকীর্তি। কেমন করে আমি শহরকে শহর গুড়িয়ে দেব? পরিবারকে পরিবার উড়িয়ে দেব? তেমন বাঁচা কে বাঁচতে চায়, যে বাঁচার শরিক জার্মান জাতি নয়? যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু যখনি মনে পড়ে যায় ডাক্তার নয়মান বা ফ্রাউ নয়মানের মুখ বা তাঁদের ভাই হাইনরিখের মুখ তখনি অনিচ্ছায় অন্তর ভরে যায়। আমার বিশ্বাস হয় না যে ওঁরা সবাই নাৎসী। হতে পারে হাইনরিখ এখন কনসক্রিপ্ট। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ওর বুড়ো বাপ মার বা ছোট ভাগনে ভাগনীর কী দোষ! কেন আমি তাঁদের বোমা দিয়ে বধ করব? শত্রু বলে? বালবৃদ্ধ বনিতাও শত্রু? হিটলার অবশ্য বলছে টোটাল ওয়ার। কিন্তু আমরা তো তার বিপরীতটাই বলি। কার্যকালে একই রকম দাঁড়ায়।" মানস মর্মবেদনায় অভিভূত হয়।

সৌম্য তা শুনে বলে, "তুমি অর্জুন হতে পারো, আমি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নই। কৌরবদের হারিয়ে দিতে হলে কৌরবদের মতো নির্বিবেক হতে হবে এ শিক্ষা আমার নয়। যুদ্ধে নামলে মানুষ বিচার বিবেক প্রজ্ঞা সব কিছুর কাছ থেকে বিদায় নেয়।

বর্বরতায় শত্রুকেও ছাড়িয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হলো না। বিজ্ঞান মানুষকে সভ্যতর করেছে না অসভ্যতর করেছে যুদ্ধকালে সেটা ধরা পড়ে যায়। উপরে উপরে সভ্য, ভিতরে ভিতরে অসভ্য, এই হচ্ছে ইউরোপের পথ। ভারতও কি এই পথ ধরবে? অন্তত একটা দেশও কি এ জগতে থাকবে না যে বালবৃদ্ধ বনিতাকে নির্বিবেকভাবে হত্যা করতে অস্বীকার করবে? না হয় নাই বা হলো জয়।"

"সে কী কথা! জয় না হলে যে সর্বনাশ! হিটলার তার শত্রুদের কাউকে আস্ত রাখবে না। যারা অহিংস প্রতিরোধ করবে ভাবছে তাদেরও মেরে শহীদ করে দেবে। নৈতিক জয় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারো, সৌম্যদা, আমি কিন্তু সুখী হতে পারিনে। অথচ জার্মানদের সবাইকে আমি নাৎসী বলে উজাড় করতেও পারিনে। এখানেও সেই নীতির প্রশ্ন। যুদ্ধ করতে হবে, হিটলারকে হারাতে হবে, অথচ যারা নাৎসী নয় তাদের বাঁচাতে হবে। কী করে এটা সম্ভব? গীতায় এর উত্তর নেই।" মানস উত্তর খোঁজে।

"এ সমস্যা তো গীতার যুগে ছিল না। তখন যুদ্ধ হতো লোকালয়ের বাইরে এক মাঠে বা ময়দানে। বালবৃদ্ধ বনিতা সেখানে থাকত না। অসামরিক পুরুষরাও না। লড়াই হতো শস্ত্রধারীর সঙ্গে শস্ত্রধারীর। বিষাদ সেক্ষেত্রে হৃদয়দৌর্বল্য। কিন্তু একালের যুদ্ধ তো সিভিল পপুলেশনকেও মেরে সাবাড় করে। দুই পক্ষই এটা মেনে নিয়েছে। একালের যুদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয় না। না শিশুকে, না স্ত্রীজাতিকে, না অসামরিক পুরুষকে। মানুষ যদি এর থেকে নিবৃত্ত না হয় তো সভ্যতার নিদর্শন বিশেষ কিছু টিকে থাকবে না। গত মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যের বা সঙ্গীতে বা চিত্রকলার বিকাশ যেটুকু দেখছ সেটুকু তার নিছক নূতনত্ব। নূতন পুরাতন হলে তার দিকে ফিরে তাকাবে কে? যদি না থাকে চিরন্তনের ছাপ। কোথায় কতটুকু তা দেখছ? বিজ্ঞান আর মারণাস্ত্র ছাড়া গর্ব করবার মতো আর কী আছে? গণতান্ত্রিক জীবন ধারাও তো যুদ্ধকালে সংকীর্ণতর হয়।" সৌম্য খুঁত ধরে।

'কিন্তু একপক্ষকে বাধা দেবার জন্যে আরেকপক্ষ যদি না থাকে, যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তবে অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড এক এক করে তাদের অস্তিত্ব হারায়। কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে হয়। নইলে ভারতও একদিন নাৎসী পদানত হবে। অর্জুনকে যুদ্ধ করতেই হবে, সৌম্যদা। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে না হোক, হোম ফ্রন্টে। তোমার অহিংসা তখন কোন্ কাজে লাগবে?" মানস সংশয়ান্বিত।

"আমরা যদি আমাদের অহিংস পদ্ধতির সংগ্রামে ব্রিটিশ রাজকে অচল করতে পারি। তবে নাৎসী রাজকেও অচল করতে পারব। মারতে মারতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু সহযোগিতা পাবে না। নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মতো হিটলারের ভারত অভিযানও ব্যর্থ হবে। আমরাই আমাদের ঘড়বাড়ী দোকান বাজার ক্ষেত খামার দগ্ধ করে ওদের বঞ্চিত করব। আমাদের ক্ষতি যা হবে তা পুষিয়ে যাবে। বিরাট দেশ, তার বিশাল অভ্যন্তর। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের মতো ওরাও ভিতরে ঢুকতে সাহস পাবে না। পাছে পেছনের রাস্তা কাটা যায়। নাৎসীরা কখনো অহিংস প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। যদিও অসিয়েটস্কির মতো শান্তিবাদী জার্মানীতে জন্মেছেন। আমরা যদি অন্তরে নির্ভয় হই কে আমাদের পদানত করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরও হতে হবে। খাদ্য আর বস্ত্র এ দুটিতে আত্মনির্ভর হবে প্রত্যেকটি গ্রাম। গঠনকর্মের উপর সেইজন্যে আমরা এতটা জোর দিই। ওটাই আমাদের দেশরক্ষার প্রস্তুতি। যে দেশরক্ষায় সর্বসাধারণ অংশ নিতে পারে। কেবল মুষ্টিমেয় পেশাদার সৈনিক নয়। অথবা একরাশ অনিচ্ছুক কন্‌সক্রিপ্ট নয়।" সৌম্য অবিচলিত কণ্ঠে বলে।

জুলির বিয়ের কথাটা পাড়বার অবকাশ পায় না যূথিকা।

আহারের পর আরাম। মানস বলে, "আমি একটু গড়াতে চাই। তুমি চলো আমার শোবার ঘরে বসে গল্প করবে। তোমাকে দেওয়া হবে একটা ডেক চেয়ার।"

সৌম্য বলে, "দুপুরের খাওয়ার পর আমিও একটু গড়াই।"

"বেশ তো, তোমার যদি অসুবিধে না হয় তবে তুমি আমার ক্যাম্প খাটে শুতে পারো। ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসব আমি।" মানস প্রস্তাব করে।

সৌম্য লক্ষ করে যে মানস ক্যাম্প খাটে শোয়। তাতে গদীর বদলে একটা চাদর পাতা।

"কবে থেকে এই কৃচ্ছ্রসাধনা শুরু?" সৌম্য জানতে উৎসুক।

"আমার জীবন শূন্য হয়ে গেছে যেদিন, সেদিন থেকে।" মানস নিষ্প্রাণভাবে বলে। সৌম্য বুঝতে পারে। দীপকের ভাই রূপক আর নেই। সে "আহা" করে ওঠে।

"ভাই সৌম্যদা, আমি যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনে। আমার সব সময় মনে হচ্ছে ওর তো যাবার কথা ছিল না, ও গেল কেন, গভীরতর কারণটা কী।" মানস প্রশ্ন করে।

"এল কেন আর গেল কেন, এই দুই প্রশ্নের উত্তর তো আদিকাল থেকেই খোঁজা হচ্ছে, ভাই। এখনো কেউ নিশ্চিত উত্তর পায়নি। পাবে কী করে? মানুষের

জ্ঞানবুদ্ধি সীমাবদ্ধ। সত্যের উচ্চতম স্তরে পৌছতে হলে জ্ঞানবুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। তার জন্যে চাই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। যার জন্যে চাই সব মানুষকে ভালোবাসা, সব প্রাণীকে ভালোবাসা। প্রেমের গভীরতম স্তরে যদি কেউ পৌছয় তবেই সত্যের উচ্চতম স্তরে পৌছতে পারে। সে রকম সাধক বিরল। তাঁরাই ভেদ করেছেন জন্ম মৃত্যুর দুর্ভেদ্য রহস্য। জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা মৌন থাকেন। কিংবা উত্তর দেন, ওপারে না গেলে ওপারের সত্য এপার থেকে প্রতিভাত হয় না। ওপার বলে কিছু আছে যদি মানো তবে ওপারে গেলেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। নিশ্চিত উত্তর। ওপারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় যদি থাকে তবে অবশ্য অন্য কথা। সাধারণ লোকের সংশয় নেই। তাই তারা বিশ্বাস করে ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবান নিয়ে গেলেন। কিংবা পূর্বজন্মের কর্মফলে এসেছিল, কর্ম ফুরিয়ে গেল, তাই চলে গেল। কিংবা যার যতদিন আয়ু তার ততদিন স্থিতি। ললাটলিখন।" সৌম্য তার বন্ধুকে শোনায়।

মানস মন দিয়ে শোনে। চোখ বুজে থাকে। রূপককে স্মরণ করে। ফুলের কুঁড়ির মতো অকালে ঝরে পড়ল। এর একটা জৈব ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু অন্তর চায় গভীরতর ব্যাখ্যা।

"ও বোধ হয় বলতে এসেছিল যে, বাবা, তুমি কি জানো তুমি কেন এসেছ, কী তোমার প্রকৃত কাজ, সে কাজ না করে অকাজ করছ না তো? তোমাকে যে জীবন দেওয়া হয়েছে তা কি ব্যক্তিগত সুখের জন্যে? না মহত্তর কল্যাণের জন্যে? তুমি কেবল পদোন্নতির চিন্তায় মগ্ন থেকেছ। দারুণ আঘাত না পেলে তুমি জাগতে না। সত্যি, আমার পতন হতে যাচ্ছিল। দেখতে আরোহণের মতো। আসলে অবরোহণ। আমি নিজেই অশান্ত বোধ করছিলুম আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে কোন্ পাতালে নিয়ে যাচ্ছে অনুভব করে। আমার অবরোহণ রোধ হয়েছে। কিন্তু আমার আর এ চাকরি ভালো লাগছে না। এটা আমার স্বধর্ম নয়। তুমি ভালো করেই জানো কেন, কার জন্যে, কোন্ অবস্থাচক্রে আমি এ পথে পদার্পণ করেছিলুম। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলে গেছে। আমাকে তার ভার নিতে হয়নি। তা হলে কেন আমি অতীতের জের টেনে যাচ্ছি? আমি চাই নতুন করে শুরু করতে।" মানস বলে আকুল হয়ে।

"কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি বিবাহ করেছ, তোমার পুত্রকন্যা হয়েছে, তাদের প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই? তাদের বাঁচবার একটা বিকল্প উপায় খুঁজে বার করো। সেটা এই যুদ্ধের বাজারে আরো দুরূহ। যেটাকেই জীবিকা করবে সেটাই পরধর্ম।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তা বলে কি সপরিবারে নিধনং শ্রেয়ঃ? আমি যে বিয়ে করিনি সেটা এইসব ভেবেই।" সৌম্য তার আপনার কথা বলে।

"যে ব্যক্তি সব মানুষকে ভালোবাসবে, সব প্রাণীকে ভালোবাসবে সে কি একটি নারীকে ভালোবাসবে না! ভালোবাসলে বিয়ে করবে না? বিয়ে করলে সন্তানের জনক হবে না? আমি আমার স্বভাবের অনুসরণ করেছি। যূথিকাও তার। আমাকে বিয়ে করে ও ত্যাজ্যকন্যা হয়েছে, জানো? অত বড়ো ত্যাগের উপরে আরো বড়ো ত্যাগ কি চাপানো উচিত? আমি যদি এমন কোনো বিকল্প জীবিকা খুঁজে না পাই, যেটা পরধর্ম নয়, তা হলে ও হবে ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা। একালে তার মানে ওকেই পরের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ নিতে হবে। ও আমাকে অভয় দিয়ে বলেছে ও কিছু না কিছু রোজগার করবেই। শুনে আমি আরো ভয় পাই। না, ওটা একটা সমাধান নয়। নিজের বিবেককে নির্মল রাখব বলে স্ত্রীর বিবেককে বন্ধক দিতে পারিনে। সৈরিন্ধ্রী পরের গৃহে থাকলে কীচকও থাকে। অথচ কীচকবধের জন্যে ভীম নেই। আমার এই সাজানো সংসারে মৃত্যু হানা দিয়েছে, সেই শোকে অন্ধ হয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিলে সংসারটাই তছনছ হবে, সৌম্যদা।" মানস উদ্বিগ্ন হয়ে বসে।

"আমার মতে দুটোই বাড়াবাড়ি। চাকরি ছেড়ে দেবার উপযুক্ত কারণ যেখানে নেই সেখানে সেটা বাড়াবাড়ি। অপর পক্ষে, উপযুক্ত কারণ যেখানে আছে সেখানে অনিশ্চিতের ভয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটাও বাড়াবাড়ি। সেক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতেই হবে, যা থাকে কপালে। ইতিমধ্যে যূথিকাকে তৈরি করে নাও। সেবাপ্রতিষ্ঠান চালাবে। খাদি ভাণ্ডারের ভার নেবে। কিছু না হোক টিউশনি করবে। ও তো ভালো পিয়ানো বাজায়। ওটাই ওর লাইন।" সৌম্য পথ দেখায়।

মানস চিন্তা করে। বলে, 'ছেলেমেয়েরা একটু বড়ো না হলে ওদের মা কোনোটাতেই মন দিতে পারবে না। মন পড়ে থাকবে বাড়ীতে। এমন কাজ চাই যা বাড়ীতে বসেই করা যায়। কিন্তু চরকা কেটে তো দিনে আট আনার বেশী হয় না।"

"তুমি কী করে জানলে যে আমি এখন এই সমস্যা নিয়েই গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি? তিনিই ডেকেছেন। মজুরি আরো বাড়াব কী করে? পড়তায় পোষাবে কেন? লোকে খাদি না কিনে মিলের কাপড় কিনবে। একটা মজার কথা শুনবে? আমার কাটুনীরাই আমার কাছ থেকে মাসে পনেরো টাকা গুনে নেয়, নিয়ে মিলের কাপড় কেনে। নিজেদের হাতে কাটা সুতোর খাদি নিজেরাই পারবে না। বাপু এই নিয়ে ঘোরতর চিন্তিত। দেশের স্বরাজ হয়তো বিঘ্নিত হবে না, কিন্তু

সে স্বরাজ কি জনগণের স্বরাজ হবে, না বড়ো বড়ো কলওয়ালাদের রাজ হবে?" সৌম্যও ঘোরতর চিন্তিত।

"ওঃ তুমি তা হলে সেগাঁও যাচ্ছ? ফিরে এসে বলবে তো ওখানকার হালচাল। খবরের কাগজে যেটুকু লেখে সেটুকুতে মন ভরে না। আমার তো ইচ্ছে সোজাসুজি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার নিজের প্রশ্নের উত্তর চাওয়া। নচিকেতার প্রশ্নই আমার প্রশ্ন। জানি তিনি যমরাজ নন, সেগাঁও নয় যমরাজ্য, তবু মর্ত্যলোকে আর কে আছেন যিনি আমাকে আমার সংশয়ে নিশ্চিতি দিতে পারেন? তাছাড়া এটাও আমার জিজ্ঞাসা যে দেশ যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সত্যাগ্রহীদের শিবিরে আর সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে, তখন আমার মতো ব্যক্তির স্থান কোন্ শিবিরে? আমি কি তোমাকে জেলে পুরব নাকি?" মানস শিউরে ওঠে!

"তোমার কর্তব্য হবে আমাকে সর্বাধিক দণ্ড দেওয়া, আর নয়তো নিজে পদত্যাগ করা। জজ ব্রুমফিল্ডকে যা বলেছিলেন গান্ধীজী ১৯২২ সালে। কিন্তু এর জন্যে সেগাঁও যাবার দরকার কী? বাপু তো গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশে আসবেন, কথাবার্তা চলছে। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সে সময় করা যেতে পারে। তাড়া কিসের?" সৌম্য ভরসা দেয়। "কিন্তু নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর যম ভিন্ন আর কে দিতে পারবেন? মহাত্মাও যমের অধীন।"

আবার ওরা গান্ধীজীর প্রসঙ্গে ফিরে আসে। মানস জানতে চায়, "মহাত্মাজীর সঙ্গে কি তোমার কেবল চরকার অর্থনীতি নিয়ে কথাবার্তা হবে? ওর চেয়ে সীরিয়াস কোনো বিষয় নিয়ে নয়?"

"ওর চেয়ে সীরিয়াস আর কী হতে পারে, মানস?" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে, "বুদ্ধকে অভিভূত করেছিল মানুষের জরা ব্যাধি মৃত্যু। গান্ধীকে অভিভূত করেছে মানুষের দীনতা হীনতা অধীনতা। আপাতত ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু ভারত বলতে ভারতের দীনহীনদেরও বোঝায়। তাদের দীনতা দূর হবে কী করে, যদি সবাইকে কাজে লাগিয়ে না দেওয়া যায়? আর, সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাবে কী করে? যদি তাদের হাতে চরকা বা তারই মতো সহজ সুলভ হাতিয়ার ধরিয়ে না দেওয়া যায়? কলকারখানার কাজ শতকরা পাঁচজন কি দশজনকে সক্রিয় রাখতে পারে, কিন্তু আর-সবাই তো নিষ্ক্রিয় থাকবে। বিদেশী সরকার সেই নিষ্ক্রিয় জনতাকে আহার জোগাতে বাধ্য নয়। তারা দুর্ভিক্ষে মরলে বিদেশীর আসন টলে না। কিন্তু স্বদেশী সরকারকে সক্রিয় নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষে সবাইকে অন্ন জোগাতে হবে। কেউ দুর্ভিক্ষে মরলে সরকারের আসন টলবে। যাদের আমরা খাওয়াব তাদের কি আমরা

বসিয়ে রেখেই খাওয়াব? না, যাদের আমরা খাওয়াব তারা আমাদের পরাবে। আমরা জোগাব খাদ্য, ওরা জোগাবে খাদি! কেউ অনাহারে থাকবে না, কেউ নিষ্কর্মা হবে না। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ ওরা আমাদের বেশীর ভাগ লোককে অনাহারে রেখেছে বা মরতে দিয়েছে। তাদের হাতে কাজ নেই, তাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে বিদেশী কলকারখানার শ্রমিক। বিদেশীর জায়গায় স্বদেশী কলকারখানা হলে যে তাদের দুঃখ দূর হবে তা নয়। তারা যে তিমিরে তারা সে তিমিরে। সেইজন্যেই তো চরকার অর্থনীতি।" সৌম্য যতদূর বোঝে।

মানস মন দিয়ে শোনে ও ভাবে। "এ তো গেল দীনদের দীনতা দূর করার উপায়। হীনদের হীনতা দূর হবে কী করে?"

"সেটা আরো কঠিন, আরো সময়সাপেক্ষ। হিন্দুসমাজের বর্ণবিন্যাস এমনভাবে হয়েছে যে সব চেয়ে দরকারী কাজ যারা করে তারাই সব চেয়ে হীন। তারা যদি দেশ ছেড়ে পালায় বা একধার থেকে মুসলমান হয়ে যায় তা হলে হিন্দুসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। আর হিন্দুসমাজ মানে তো দেশের অধিকাংশ লোকের সমাজ। তাদের পতন হলে তারা আর সবাইকে টেনে নামাবে। তখন আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। গান্ধীজী তাই বর্ণগর্বিত হিন্দুদের অন্তঃপরিবর্তনে তৎপর হয়েছেন। ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সেইজন্যে ইংরেজবিরোধী রাজনীতিকরা এর মর্ম বোঝেন না। কিন্তু দীনের দীনতা দূর করার মতো হীনের হীনতা দূর করাও গান্ধীজীর জীবনের উদ্দেশ্য। হরিজন যাদের তিনি বলছেন তাদের জন্যে তিনি গোড়া থেকেই সীরিয়াস। তবে হরিজন আন্দোলনটা বেশীদিনের নয়। পুণায় যখন তিনি হরিজন আন্দোলনের সূচনা করেন তখন আমিও তাঁর একজন অনুগামী হই। এ সমস্যা দু'শো বছরের চেয়ে অনেক বেশী পুরনো। ভারত উদ্ধার যত না কঠিন তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন হরিজনদের উদ্ধার। বর্ণ হিন্দুরা ক্ষেপে যাচ্ছে, অশুচিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ও বিয়েসাদী করলে শুচিতা থাকবে না। এ কী রকম মহাত্মা যিনি অশুচিকে শুচি করতে গিয়ে শুচিকে অশুচি করতে যাচ্ছেন? বর্ণ হিন্দুদের ভিতরে উত্তেজনা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে গান্ধীবিরোধিতা। সমাজে হাত পড়বে না, অথচ দেশ স্বাধীন হবে এ মানসিকতা গান্ধীজীর নেতৃত্বের পূর্বেও ছিল। নতুন কিছু নয়। তবু খারাপ লাগে, যখন শুনি যে হরিজনদের বাদ দিয়েও দেশকে স্বাধীন করা যায়। সেটা যেন নিগ্রোদের ক্রীতদাস রেখে আমেরিকাকে স্বাধীন করা।" সৌম্য আক্ষেপ জানায়।

মানস বলে, "তার মানে স্বাধীনতাযুদ্ধের পরের অধ্যায় গৃহযুদ্ধ। ভারতকেও তার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। বর্ণ হিন্দুরা কি লড়তে প্রস্তুত?"

"পরে কী হবে না হবে তা ইতিহাসের উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। আপাতত প্রথম কর্তব্য স্বাধীনতা অর্জন। তাতে হরিজনদেরও অংশগ্রহণ।" সৌম্য বলে।

মানস জানতে চায় কংগ্রেস কি গান্ধীজীর মতবাদ সর্বাংশে সমর্থন করে। না কেবল তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বটুকুই মানে।

"কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক সংগঠন। রাজনৈতিক সংগ্রামের অধিনায়ক হিসাবে সে গান্ধীজীকে মানে। কিন্তু তাঁর মতবাদকে মানে না। এইখানেই গান্ধীজীর দুঃখ। অধীনতা দূর হবে, কিন্তু দীনতা ঘুচবে না, হীনতা মুছবে না। কংগ্রেসের তাতে আগ্রহ নেই। আমরা যারা বিশ্বাস করি যে গান্ধীজীই এ যুগের বুদ্ধ তারা অধীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসে থাকলেও দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে স্বতন্ত্র একটা সঙ্ঘের প্রয়োজন অনুভব করি। বৌদ্ধদের যেমন বুদ্ধ আর ধর্ম আর সঙ্ঘ আমাদেরও তেমনি গান্ধী আর গান্ধীবাদ আর গান্ধীসেবাসঙ্ঘ। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের ভিন্ন মত। এই ধরো না কেন, যুদ্ধ আমরা চাই পৃথিবী জুড়ে নিরস্ত্রীকরণ। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়। ভারতই সকলের আগে নিরস্ত্র হবে। কংগ্রেস নেতারা এতে নারাজ। কিংবা ধরো বিকেন্দ্রীকরণ। আমরা কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকৃত করতে চাই কংগ্রেস নেতারা তাতে নারাজ। আমরা কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেও বিকেন্দ্রীকৃত করতে চাই। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাঁরা সমাজতন্ত্রী তাঁরা রাষ্ট্রকেই করবেন অর্থনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র। আর যাঁরা ধনতন্ত্রী তাঁরা বড়ো বড়ো কোম্পানীর হাতে মূলধনকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবেন। তারপর তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাবেন। গান্ধীজী তাঁদের ট্রাস্টী হতে বললেও তাঁদেরও বিকেন্দ্রীকৃত করার পক্ষে কিন্তু ধনতন্ত্রীদের মতো সমাজতন্ত্রীরাও বিকেন্দ্রীকরণ পছন্দ করবেন না। তার বদলে করবেন ধনসম্পদ্ রাষ্ট্রসাৎ। তা হলেই দেখছ কংগ্রেসীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের কত তফাৎ। আমরা অধীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসে আছি, কংগ্রেসের সঙ্গে আছি, কিন্তু দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে কংগ্রেসেব উপর নির্ভর করতে পারিনি, তাই পৃথক সঙ্ঘ গঠন করেছি। এ না হলে গান্ধীবাদ বাঁচবে না, গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করবে। কংগ্রেস মত্ত থাকবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতে। প্রাদেশিক স্তরে যা দেখছ কেন্দ্রীয় স্তরেও তাই দেখবে। তাই আমরা কংগ্রেসের বাইরে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাই। এটা কি অন্যায়? তুমি কী মনে করো, মানস?" সৌম্য ব্যাকুলভাবে বলে।

"না, অন্যায় কিসের? বুদ্ধ থাকলে সঙ্ঘ থাকে।" মানস রায় দেয়।

"কিন্তু বামপন্থীদের ধারণা এটা দক্ষিণপন্থীদের বর্ণচোরা সংগঠন। বামপন্থীরা

।দি কংগ্রেস ক্যাপচার করে দক্ষিণপন্থীরা তাদের তাড়াবার জন্যে গান্ধীসেবাসঙ্ঘের গরণ নেবে। বামপন্থীরা যখন রাষ্ট্র ক্যাপচার করবে গান্ধীসেবাসঙ্ঘ তখন দক্ষিণ-পন্থীদের মদত দেবে। ওদের এ ধারণা গান্ধীজীকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। সন্দেহ নেই বহু দক্ষিণপন্থী নেতা আমাদের সঙ্ঘের সদস্য। গান্ধীবাদী বলে যদি কেউ পরিচয় দেন আমরা কি তাঁকে ফেলতে পারি? তেমনি বহু ধনিক গান্ধীবাদী বলে পরিচয় দিয়ে সদস্য হয়েছেন। তাঁদের ফিরিয়ে দিলে অনেকের উপর অবিচার করা হবে। দুর্মুখরা বলছে যে কংগ্রেসের হাতে প্রাদেশিক সরকার না থাকলে এঁরা সঙ্ঘে ভিড়ে যেতেন না। কংগ্রেস যেদিন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবে এঁরাও সেদিন যে যার পথ দেখবেন। সঙ্ঘ কি থাকবে?” সৌম্য সুধায়।

“দেখা যাক। প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বত্যাগ তো একরকম নিশ্চিত। ব্রিটিশ কর্তারা কেন্দ্রে তেমন কোনো ক্ষমতা দেবেন না কংগ্রেস নেতারা যেমনটি আশা করেন। সেদিন শেফার্ডের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন ইংরেজ হোম মেম্বর ফাইনান্স মেম্বররা যাবেন কোথায়? যুদ্ধকালে যে যার পদে থাকবেন।” মানস ভিতরের খবর দেয়।

॥ নয় ॥

মাঝখানে বিরতি। যুথিকা এসে দু'জনের সামনে দু'গেলাস সরবৎ রেখে যায়। লেবুর সরবৎ। সৌম্য তো বাজারের লেমন স্কোয়াশ খাবে না।

মানস বলে, "তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাসের জোর আছে। তুমি তোমার বিশ্বাসের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছ। প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হচ্ছ। কিন্তু আমি তো আঁকড়ে ধরবার মতো একটা খড়কুটোও খুঁজে পাচ্ছিনে। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসও টলতে টলতে অজ্ঞেয়বাদের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তেমনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। পরলোকে বিশ্বাস। পরজন্মে বিশ্বাস। জগতের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস। মরাল অর্ডারে বিশ্বাস। সত্যের জয় হবে, ন্যায়ের জয় হবে, প্রেমের জয় হবে এই অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস। একালের মানুষের ভুলভ্রান্তি দোষক্রটি ভাবীকালের মানুষ শুধরে দেবে, এই নিশ্চয়তায় বিশ্বাস। ভাবীকাল যে একালের চেয়ে নিখুঁত হবেই এই নিশ্চিতিতে বিশ্বাস। ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব যে চিরকালের নয়, কালক্রমে মানবসংসার যে নির্জলা ভালো হতে পারে, এই শিবত্বে বিশ্বাস। নেতি নেতি করতে করতে আমি শূন্যের অভিমুখেই চলেছি।"

সৌম্য ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বলে, "এটা বোধহয় তোমার পুত্রশোকের প্রতিক্রিয়া। সে আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে।"

"সেই কি একমাত্র আঘাত? চোখের সুমুখেই দেখছ চেকোস্লোভাকিয়ার দশা। আর পোল্যাণ্ডের দশা। কতকাল ধরে কত শত দেশপ্রেমিক তোমার মতো জীবন উৎসর্গ করে প্রাণদান করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। ত্রিভঙ্গ পোলাণ্ডকে একত্ব দিতে সে কী দুর্মর সাধনা! অথচ বিশ বছর যেতে না যেতেই আবার দ্বিভঙ্গ। ভারতের স্বাধীনতার তপস্যাও একদিন সফল হবে, আমিও তোমার মতো বিশ্বাস

করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও করি যে কোনো একজন সর্বজনমান্য নেতা না হলে এই বিচিত্র দেশ ছত্রভঙ্গ হতে পারে। গান্ধীজী কি চিরদিন থাকবেন? সংগ্রাম চলছে বলেই তাঁর নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন আছে। সংগ্রাম সারা হলে কী প্রয়োজন? এর মধ্যেই তো তাঁকে মানতে চাইছে না লীগপন্থী মুসলমান, মহাসভাপন্থী হিন্দু, বামপন্থী কংগ্রেসী। ইংরেজ যখন বিদায় হবে তখন জাপানী কি আসবে না বিভেদের সুযোগ নিয়ে? ব্রিটিশ রাজত্বই যে সব চেয়ে বড়ো ইভিল এটা সত্য নয়। সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা তার চেয়েও বড়ো ইভিল। আরো বড়ো ইভিল বর্ণভেদ ও জাতিভেদ।" মানস বলে চিন্তাকুল ভাবে।

"যা বলেছ সব ঠিক। কিন্তু ঐ যে বলে, প্রথম জিনিসগুলি প্রথমে। বিদেশীর ছত্রছায়ায় বাস করলে কোনো দিনই আমরা মানুষ হব না। আগে তো ওরা বিদায় হোক, তার পরে দেখা যাবে কতদিন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি, এক থাকতে পারি। মুক্তির জন্যেই ভারতের অন্তরাত্মা ব্যাকুল। এই সত্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভারতের অদ্বিতীয় উপায় অহিংসা। গান্ধীজী সফল না হলেও এ সংগ্রাম চলবে। কারণ, প্রথম জিনিসটি প্রথমে। ভারত তখন যে-কোনো উপায় অবলম্বন করবে। খণ্ড খণ্ড হলেও যদি স্বাধীন হওয়া যায় তাও সই। অখণ্ড পরাধীনতার চেয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতাও শ্রেয়। যেখানে সত্যিকারের ঐক্য নেই সেখানে শিকলে বাঁধা একত্ব নিয়ে আমরা কী করব! বিভেদের সুযোগ নিয়ে জাপানী ঢুকবে? ঢুকলে তার সঙ্গেও লড়ব। অহিংসভাবে সম্ভব না হয়, সহিংসভাবে। ইংরেজকে এবার আমরা হটাবই। যদি না ওরা মানে মানে হটে যায়। গান্ধীজী ওদের মানে মানে হটে যাবার জন্যে একটা রাস্তা খোলা রেখেছেন। কিন্তু সেটারও একটা সময়সীমা আছে সীমা পার হয়ে যাচ্ছে দেখলে তিনি সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। ফলাফল ভগবানের হাতে। হেরে যেতেও পারি। মরে যেতেও পারি। কিন্তু বসে থাকতে পারিনে। লগ্নের প্রতীক্ষা করে বসে থাকা নয়।" সৌম্য দৃঢ়তাব সঙ্গে বলে।

"প্রথম জিনিসটি প্রথমে।" মানস বলে, "কিন্তু তোমার আমার কাছে যেটি প্রথম আমাদের মুসলমান বন্ধুদের কাছে সেটি প্রথম নয়। তাঁরা বলেন, আগে হিন্দু মুসলমানের একতা, তার পরে ভারতের স্বাধীনতা। একতা যদি পেছিয়ে যায় তো স্বাধীনতাও পেছিয়ে যাবে। একতা যদি এগিয়ে আসে তো স্বাধীনতাও এগিয়ে আসবে। একতার আগেই যদি স্বাধীনতা চাও তো মুসলমানরা সরে দাঁড়াবে ও বাধা দেবে। ওদের চোখে ইংরেজরা যেমন বিধর্মী হিন্দুরাও তেমনি বিধর্মী। বিধর্মীরা শাসনে ওরা বাস করবে না এতদিন যে বাস করেছে সেটা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে।

নয়তো ওরাই তো রাজত্ব করত। স্বদেশী বিদেশীর প্রশ্ন ওদের কাছে বড়ো নয়। কারণ ওরাও তো বিদেশীব বংশধর। বিদেশীকে বিদায় করতে হলে ওদেরও তো বিদায় কবতে হয়। ইংরেজদেব তবু ফিরে যাবার একটা স্থান আছে, ওদের ফিরে যাবার স্থান কোথায়? আরবে ইরানে মধ্য এশিয়ার কেউ ওদেব স্থান দেবে না। সেইজন্যে ওরা ভারতেরই একাংশকে বানাতে চায় পাকিস্তান। এটা যদি মেনে নাও তো ওরা স্বাধীনতার প্রশ্নে বাদ সাধবে না। নয়তো ওরা স্বরাজকে বলবে হিন্দুরাজ আব ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

"যা বলেছ সব ঠিক। কিন্তু কোনো শর্তেই ওরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবে না। ওরা মানে লীগপন্থী মুসলমানরা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও খান্ আবদুল গফ্ফার খানের মতো মুসলমানরা আমাদের সঙ্গে আছেন। লীগপন্থীরা সংগ্রামে যোগ না দিয়েই সংগ্রামের ফল ভোগ করবে, কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের ভোগ করতে দেবে না। ওরা নাকি মুসলমানদের প্রতিনিধিই নয়। এমন কি খাঁটি মুসলমানই নয়। শোন কথা! আজাদ খাঁটি মুসলমান নন, বাদশা খান্ খাঁটি মুসলমান নন। খাঁটি মুসলমান কিনা মহম্মদ আলী ঝীণাভাই খোজানী, যাঁর পিতৃনামের ইংরেজী সংস্করণ জিন্না। যাঁর পিতামহ হিন্দু। আমরা এখন আমাদের সংগ্রামী কমরেডদের তাঁদের ভাগ থেকে বঞ্চিত করি কী করে? তা যদি করি তবে অসমাপ্ত সংগ্রাম সমাপ্ত করার জন্যে ডাক দিলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কেন? অবশ্য বাদশা খান্ বা মৌলানার মতো লোক মন্ত্রিত্বের জন্যে লালায়িত নন। তাঁরা ডাক পেলে সংগ্রামে যোগ দেবেনই। কিন্তু আমাদেরও তো একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। যাঁরা আমাদের দুঃখের দিনের সাথী তাঁরা কি আমাদের সুখের দিনের সাথী হবেন না? যাঁরা কারাগারে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন তাঁরা কি মন্ত্রীর আসনে বসতে পাবেন না? কেন্দ্রে যদি সরকার পুনর্গঠন হয় জিন্নাও থাকবেন, আজাদও থাকবেন, কিন্তু আজাদ থাকলে জিন্না থাকবেন না, এটা হলো অন্যায় জেদ। এর দরুন দেশকে দু ভাগ করতে হবে, এটা তো পাগলের প্রলাপ। কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মুসলমান এমন প্রলাপ বকতে পারে না। দেশ দু'ভাগ হলে মুসলিম সম্প্রদায়ও দু'ভাগ হয়ে যায়। মুসলিম ঐক্য থাকে কোথায়? হিন্দু রাজত্ব এড়াতে চাইলে কতক মুসলমান তা পারবে, কিন্তু সব মুসলমান তো পারবে না। তবে, হ্যাঁ, ভারতের একাংশে মুসলিম রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, তা ঠিক।" সৌম্য স্বীকার করে।

"আরে, সেইটেই তো আসল।" মানস্ বলে, "ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী হবে কারা? কংগ্রেস বলবে, যাদের মেজরিটি তারা। কিন্তু তা হলে

তো হিন্দুরাই হবে উত্তরাধিকারী, যেহেতু তারাই মেজরিটি। তাদের সঙ্গে জনাকতক মুসলমান খ্রীস্টান পার্সী থাকলেও তারা মূলত হিন্দু। তাই লীগের বক্তব্য, লীগপন্থী মুসলমানদের বক্তব্য, ইংরেজ চলে যাবার আগেই স্থির করতে হবে যারা উত্তরাধিকারী হবে তারা কি মেজরিটির তথা মাইনরিটির সমান আস্থাভাজন, না কেবলমাত্র মেজরিটির আস্থাভাজন? সমান আস্থাভাজন বলতে বোঝাবে কংগ্রেস লীগ দুই দলই সমান শরিক, লীগ খাটো নয়। নয়তো লীগকে আলাদা উত্তরাধিকার দিতে হবে।"

সৌম্য এটা জানত। কিন্তু মানত না। হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকটি গ্রামে ও শহরে দুটি তারের মতো জড়িয়ে গেছে! বেশীর ভাগ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দুর সন্তান। ধর্ম ব্যতীত আর সব বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল। গোটাকতক চাকরিবাকরির জন্যেই কি তারা একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক পরিবার গঠন করবে? পারবে কি সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে? যারা থেকে যাবে তারা তো আরো ক্ষুদ্র মাইনরিটি হবে। ওদিকে হিন্দুরের দশা কী হবে?

সৌম্য বলে, "হিন্দু মুসলমানের বা কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া সত্যিই অত্যাবশ্যক। স্বাধীনতার আগেই হোক আর পরেই হোক এ সমস্যার সমাধান অবশ্যকর্তব্য। আমরা কেউ চাইনে যে হিন্দুরাই ইংরেজের পর সর্বেসর্বা হয়। মুসলমানদের আস্থা না পেলে কোনো সরকারই টিকবে না। দেখছ না বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলির দোটানা? লীগপন্থীদের বাইরে রাখলে তারা লোক ক্ষেপিয়ে দাঙ্গা বাধায়। দাঙ্গা থামাতে গেলে গুলি চালাতে হয়। অপর পক্ষে লীগপন্থীদের ভিতরে ঢুকতে দিলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বহিষ্কার করতে হয়! ফলে স্বাধীনতাসংগ্রাম দুর্বল হয়। কেন্দ্র নিয়েও একই দোটানা দেখা দেবে। স্বাধীনতাসংগ্রাম যদি অসমাপ্ত থাকে তবে তা দুর্বল হবেই। আগে তো স্বাধীনতা লাভ করি, তার পরে আমরা এ সমস্যার সমাধান উভয়পক্ষের শুভবুদ্ধির সাহায্যে করব।"

"ওরা যে বিশ্বাসই করতে চায় না ইংরেজ চলে গেলে রাজত্বটা ওদেরও রাজত্ব হবে, যদি না আগে থেকেই দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। তার মানে হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ দ্বৈরাজ্য। সেটা যদি অকার্যকর হয় তবে দুই শরিকের মধ্যে পার্টিশন। যেমন জমিদারির ক্ষেত্রে হয়।" মানস তার সহকর্মীদের কথা শোনায়।

"ভারত কি কারো জমিদারি? ভারত এক ও অবিভাজ্য। দেশরক্ষার দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। বাণিজ্যের দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। পররাষ্ট্রনীতির

দিক থেকে এক ও অবিভাজ্য। ইংরেজদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ। ইংরেজ রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা স্বতঃসিদ্ধই থাকবে। তারা বিদায় নিলেই এটা অসিদ্ধ হবে কী করে? ধর্ম এক নয় বলে? তা হলে তো খ্রীস্টান, শিখ, এদেরও এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দিতে হয়।" সৌম্য বলে।

"তোমারও কথা আমারও কথা। কিন্তু আমাদের কথাই তো চূড়ান্ত নয়। যেহেতু আমরাই মেজরিটি। ইংরেজরা যদি কারো হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সিংহাসন শূন্য রেখে যায় তবে যাদের যেখানে মেজরিটি তারাই সেখানে ক্ষমতাসীন হবে। কোথাও কংগ্রেস, কোথাও লীগ, কোথাও অন্য কোনো পার্টি। ভারত এক ও অবিভাজ্য থাকবে কিসের জোরে? ব্রিটিশ বেয়োনেটের জোরে নয়। কংগ্রেস বেয়োনেটের জোরে নয়। অহিংসার জোরে তো নয়ই। কন্‌স্টিটিউশনের জোরেও না, কারণ ইংরেজের দেওয়া কন্‌স্টিটিউশন আমরা মেনে নিইনি। নিজেদের একটা কন্‌স্টিটিউশন রচনা করার অধিকারও আমাদের অন্যতম দাবী। আর ধর্ম অনুসারে দেশভাগ ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আয়ারলণ্ডে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতেও হলে আশ্চর্য হবার কী আছে? ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্ট যদি এক নেশন হতে না পারে হিন্দু মুসলমান এক নেশন হবে কোন্ তপোবলে? নানক, কবিরের সাধনার ফলে কি দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে? গান্ধীজীও কি পেরেছেন বন্ধ করতে? কংগ্রেস মন্ত্রীরা গদী ছেড়ে দিলেই সেটা বন্ধ হবে? না দিলে নয়? গদী ছেড়ে দিলে শাসন চালাবে কে? ওই ইংরেজ? তা হলে ইংরেজকেই চিরকাল আটকে রাখতে হয়। যাদের দুই হাতে আটক করবে তাদের সঙ্গে দুই হাতে লড়বে কী করে?" মানস সুধায়।

"না, না, ওদের আটক করা আর নয়। ওরা যদি নিরপেক্ষ হতো তা হলেও বা কথা ছিল। ওরা মুসলিম লীগের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে মিতালি পাতিয়েছে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"ইঙ্গ-মুসলিম মিতালির কথা যদি বল তবে সেটা মুসলিম লীগের বেলা খাটে, কিন্তু জিন্নার বেলা নয়। এই সেদিনও তিনি ছিলেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা, তাঁর দলের সদস্যরা কেউ হিন্দু, কেউ পার্সী। কখনো এঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতেন, কখনো ইংরেজের পক্ষে। জিন্না সাহেব সরকারী খেতাবও পাননি, পদও নেননি। একদা কংগ্রেসের নেতা ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি তাঁর মতবিরুদ্ধ বলে তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এসেছেন। মুসলিম লীগেও তাঁর স্থান ছিল, নইলে তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভোটের জোরে

জিততে পারতেন না। দুই নৌকায় পা রেখে তিনি কংগ্রেস লীগ চুক্তির ঘটকালিও করেছিলেন। সেটা মহাত্মা গান্ধীর উদয়ের পূর্বে। এমন মানুষ কেমন করে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগের সর্বময় নেতা হলেন ও নিজের হিন্দু ও পার্সী সহকর্মীদের ত্যাগ করলেন সে এক রহস্য। তা বলে যে তিনি সরকারের ধামা ধরলেন তাও নয়। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সময় মাইনরিটির প্রতিনিধি-দেরও আসন দিতে হবে, এটাই শাসনতন্ত্রের নির্দেশ। কংগ্রেস এ নির্দেশ পালন করেছে নিজের দলের মুসলিম সদস্যদের দিয়ে। তার আগে তাঁদের স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জিতিয়ে দিয়েছে। জিন্নার দলের মুসলিম সদস্যরা মন্ত্রী হতে পারেননি, বহু কেন্দ্রে জিততেও পারেননি। বোম্বাই শহরে তাঁর বাস, অথচ বোম্বাই প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁর দলের লোক নেই। এ দুঃখ কি ভোলা যায়? তাঁর মতে এটা কংগ্রেসের মহা অপরাধ। এ অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়? তাঁর লক্ষ্য দ্বিতীয় এক কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। যে চুক্তির জোরে মুসলিম মন্ত্রীদের মনোনয়ন করবে মুসলিম লীগ, লীগপন্থীদের স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচন কন্দ্রে জিতিয়ে দেবে মুসলিম লীগ। কংগ্রেসপন্থী মুসলিমরা সরে দাঁড়াবেন। সেই লক্ষ্যে তিনি অটল। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তিনি কংগ্রেসের শত্রু বা ইংরেজের মিত্র। এই পর্যন্ত বলা যায় যে তিনি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিকে কখনো কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করবেন, কখনো ইংরেজের পক্ষ। তিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।" মানস যতদূর জানে।

"আহা, সেইখানেই তো কাঁটা! দেশ যখন দুই শিবিরে বিভক্ত তখন কংগ্রেসের শিবির আর ইংরেজের শিবির এর মাঝামাঝি বা এর বাইরে তৃতীয় একটা শিবির মেনে নেওয়া যায় কি? ইংরেজরাও কি মেনে নেবে? এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ না নিলে বাংলাদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীতে লীগ সদস্যদের কারো আসন পাকা নয়। জিন্না ধরে নিয়েছেন যে কংগ্রেস তার অসহযোগের প্রতিজ্ঞা বরাবরের মতো ভুলে গেছে। তা নয়। কংগ্রেস আইনসভা দখল করেছে আর-কাউকে দখল করতে না দিতে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিয়েছে আর-কাউকে মন্ত্রী হতে না দিতে। কংগ্রেস যদি যুদ্ধে মতভেদের দরুন মন্ত্রিত্ব বর্জন করে তা হলেও আর কোনো দল মন্ত্রিত্ব করতে পারবে না, কারণ আর-কোনো দলেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। এ পলিসি কি জিন্না সাহেব মেনে নিতে রাজী হবেন? তাঁর শিবিরটি তো সঙ্কটের মুহূর্তে ইংরেজের পক্ষে, কংগ্রেসের বিপক্ষে। কংগ্রেস তা হলে কেমন করে তাঁর সঙ্গে চুক্তি করবে? তা ছাড়া তাঁর দাবীরও কি অন্ত আছে? মন্ত্রীমণ্ডলীতে তিনি চাইবেন ওয়েটেজ। তিনি চাইবেন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। ইংরেজদের সঙ্গে যাঁদের গাঁটছড়া বাঁধা

তেমন সব নাইট ও নবাবকে কি কংগ্রেস ট্রয়ের ঘোড়ার মতো দুর্গের ভিতর ঢুকতে দেবে? তা হলে হিন্দু মডারেটরা কী দোষ করলেন?" সৌম্য তর্ক করে।

মানস হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "জিন্নাকে বাদ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হতে পারে না, সৌম্যদা। যদি হয় তবে নির্ঘাত গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধে যদি কংগ্রেসের রুচি না থাকে তবে একভাবে না একভাবে আপস করতেই হবে। জিন্নার সঙ্গেও, ইংরেজের সঙ্গেও। শেষ তাসটা মুসলিম মাইনরিটির হাতেই।"

সৌম্য ব্যথিত স্বরে বলে, "মুসলিম মাইনরিটি মানে কি মুসলিম লীগ? তার হাতেই শেষ তাস মানে কি মুসলিম লীগেব হাতেই ভীটো? কিংবা তার মিতা বড়লাটের হাতেই ভীটো? তা হলে তো আমাদের সংগ্রাম এ শতাব্দীতে শেষ হবে না। আমবা চাই নিখাদ স্বাধীনতা। তার সঙ্গে খাদ মেশালে তো খোদ ইংরেজদের সঙ্গেই আপস হতে পারত। অসহযোগ আন্দোলনের বা আইন অমান্যের দরকারটা কী ছিল? মহাত্মা একদিন মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথাবর্তায় নাজেহাল হয়ে বলেন, এঁদের সঙ্গে মিটমাটের চেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাটে পৌছনো আরো সহজ। হিন্দু মুসলমানের একতা মহাত্মার চেয়ে কে বেশী চায়? কিন্তু তার অর্থ কি এই যে প্রত্যেকটি মাইনবিটিকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিয়ে মেজরিটি তার নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে? তেমন গভর্ণমেণ্ট চালানোর দায়িত্ব নেবার চেয়ে অপোজিশনে থাকার ও সত্যাগ্রহ চালাবার সিদ্ধান্ত অধিক শ্রেয়। আপস করতে হয় কংগ্রেস করতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী কখনো না। তাঁর লক্ষ্য নিখাদ স্বাধীনতা। তাই তিনি কারো সঙ্গে কোনো রকম শর্তে রাজী হবেন না। কংগ্রেস নেতারা হয়তো বড়ো বড়ো পদেব টোপ গিলতে হাঁ করে বঁড়শীর কাঁটাও গিলবেন, গান্ধীজীর কিন্তু তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। নিজের জন্যে তিনি রাজক্ষমতাও চান না। তাঁকে গৃহযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। উচ্চতম পদের লোভ দেখিয়ে তো নয়ই।"

মানস চিন্তান্বিত হয়ে বলে, "কিন্তু এটা তো তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে একদিন না একদিন দেশের নেতাদের উপরেই দেশের শাসন পরিচালনার দায় বর্তাবে। ইংরেজরাও এটা স্বীকার করে। তবে ব্যালান্স অব পাওয়ার হাতে রাখতে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যালান্স রক্ষার জন্যেই মুসলিম লীগের সৃষ্টি। কংগ্রেসকে একভাগ দিলে মুসলিম লীগকেও একভাগ দিতে হয়। একপ্রকার না একপ্রকার কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে ওদের বেসিক পলিসি। আর লীগপন্থী মুসলমানরাও এটা উত্তমরূপে বোঝেন যে তাঁদের স্বার্থ ইংরেজদের হাতেই নিরাপদ। এখন কথা হচ্ছে তাঁরাই কি

মুসলিম মাইনরিটির একমাত্র প্রতিনিধি ? এটা নির্ভর করছে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ভোটের উপরে। আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হবে তখন মুসলিম লীগ প্রত্যেকটি আসন জিতে নিতে পারে। তখন কংগ্রেসের মন্ত্রীমণ্ডলীতে একজনও মুসলিম মন্ত্রী থাকবেন না। কেন্দ্রেও এ রকম হতে পারে। সেখানেও কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী বলতে বোঝাবে মুসলিম মাইনরিটিবর্জিত মন্ত্রীমণ্ডলী। তার হাতে ক্ষমতা সম্প্রদান করলে সেটা হয়তো নিখাদ স্বাধীনতা হবে, কিন্তু যার পেছনে মুসলিম ভোট নেই একা মৌলানা আজাদের কল্যাণে সেটা হিন্দু মুসলমানের যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী হবে না। সেদিন জিন্নার গুরুত্ব আজাদের চেয়ে বেশী। জিন্না বিমুখ হলে মুসলিম মাইনরিটি বিমুখ হবে। মুসলিম মাইনরিটি বিমুখ হলে সংঘর্ষ বেধে যাবে। মুসলিম সৈন্যদলও আসরে নামতে পারে। ইংরেজ না থাকলে কংগ্রেস একা এত বড়ো একটা দেশকে সামলাতে পারবে কি ? আর ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে মদত দেয় তবে সে কি তার মাশুল আদায় করে নেবে না ? মাশুলটা লীগের জন্যে একভাগ।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে গান্ধীজীর হাতেও আছে আরো একখানা তাস। কংগ্রেসকে তিনি পরামর্শ দেবেন পদত্যাগ করতে। ইংরেজ যদি একা সামলাতে পারে তবে সেই ভালো। যদি লীগকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে তাকে মদত দেয় সেও ভালো। কংগ্রেসকে হতে হবে সর্বপ্রকার শক্তি জোটের চেয়ে আরো শক্তিমান। দারুণ এক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সবাইকে। তাদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরাও থাকবে। কংগ্রেসকে ওরা ছাড়বে না। কংগ্রেসও ওদের ছাড়বে না। ওরা ছাড়পত্র না দিলে লীগ নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের নিষ্পত্তি হবে না। তখন ইংরেজদের দেখতে হবে ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের নিষ্পত্তি হবে কেমন করে। সেদিন গান্ধীজীর সঙ্গেই বড়লাটের চুক্তি। আর-একটা গান্ধী আরউইন প্যাক্ট।" সৌম্য নিঃসংশয়।

"আর-একটা গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ইংরেজরাও হতে দেবে না, মুসলিম লীগপন্থীরাও না। উভয়েরই পূর্ব শর্ত আর-একটা কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। তার মানে গান্ধী-জিন্না চুক্তি। তবে তার সঙ্গে আরো একটা শর্ত রয়েছে। যুদ্ধে সহযোগিতা।" মানস জানায়।

"তা হলে কাজ নেই অমন চুক্তিতে। দৈত্যের সঙ্গে বামনের চুক্তির গল্প মনে আছে ? যুদ্ধ করতে বেরিয়ে দৈত্যের একখানা হাত কাটা পড়ে তো বামনের দু'খানা হাতই। দৈত্যের একটা পা কাটা পড়ে তো বামনের দু'দুটো পা-ই। যুদ্ধে হার হবে না, জিৎ হবে, কিন্তু ইংরেজের এই বাড়-বাড়ন্ত থাকবে না, ভারত তো আরো কাঙাল

হবে। অমনধারা চুক্তি না করাই ভালো। বড়লাটের সঙ্গে যদি চুক্তি না হয় জিন্না সাহেবের সঙ্গে চুক্তি কেন? কে না জানে তাঁর মনের অভিপ্রায়? তিনি চান প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন, অথচ সংগ্রামের দিন কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন না। সংগ্রামের দিন তিনি ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখবেন। দেশের স্বার্থে নয়, মুসলমানের স্বার্থে। যেন মুসলমানের স্বার্থ ইংরেজের হাতেই নিরাপদ।" সৌম্য বিশ্বাস করে না।

"তুমি তো মুসলিম আফসার শ্রেণীর সঙ্গে মেশো না। মিশলে বুঝতে ওঁরা এখন কোন্ লাইনে ভাবছেন। ইংরেজ যে চিরদিন থাকবে না এটা ওঁরা এতদিনে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস যে ইংরেজের শূন্যস্থান একাই পূর্ণ করবে এটা তাঁদের কাছে আনন্দের না হয়ে আতঙ্কের বিষয়। গান্ধীজীকে তারা শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু নিরপেক্ষ মনে করেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে গান্ধীজী হিন্দু পুনরুজ্জীবনের প্রতীক। তাঁর অহিংসাও হিন্দুর স্বকীয় সাধনা। তাঁর জাতীয়তাবাদও হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তাঁর গণতন্ত্রেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সুতরাং মুসলমানকে তার স্বতন্ত্র নিয়তির সন্ধান করতে হবে। সম্ভব হলে ভারতের ভিতরে। নয়তো ভারতের বাইরে। অর্থাৎ যে ভারত হিন্দুপ্রধান সে ভারতের বাইরে।" মানস সুস্পষ্ট করে।

"অর্থাৎ পাকিস্থানে।" সৌম্য আরো খোলসা করে। "তোমার অফিসার বন্ধুদের সঙ্গে না মিশলেও লীগপন্থী মুসলমানদের সঙ্গেও তো আমি মিশি। তাঁদের মধ্যেও আমার খেলাফতী দোস্ত আছেন। একসঙ্গে জেলও খেটেছি আমরা। কেমন করে যে তারা খেলাফতী থেকে পাকিস্তানী হলেন সে এক ঘোরালো ইতিহাস। আসলে ওটা প্যান-ইসলামিজমের অধুনাতন প্রকাশ। ইসলাম যেদিন ভারতে এসেছে সেইদিন থেকেই সেই স্রোতটি প্রবহমান। মুসলমানের স্বার্থ ও ভারতের স্বার্থ এক ও অভিন্ন নয়, মুসলমানের স্বার্থ ও বিশ্ব-মুসলিমের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় আমরাও এটা মেনে নিয়েছিলুম। নয়তো ওঁরা আমাদের স্বরাজের আন্দোলনে যোগ দিতেন না। দুই আন্দোলন জুড়ে গিয়ে যুগ্ম আন্দোলন হয়। পরে তুরস্ক থেকেই খেলাফতের উচ্ছেদ ঘটে। খেলাফৎ আন্দোলন বিফল হয়। স্বরাজ আন্দোলন থেকে ওঁরাও সরে যান। ব্যতিক্রম মৌলানা আজাদ ও বাদশা খান্। এখন খেলাফতের মানসিকতা রূপ নিয়েছে স্বতন্ত্র মুসলিম বাসভূমিতে। জিন্না এটা চাননি। তিনি খেলাফতী ছিলেন না। তিনি চান হিন্দু মুসলমানের দ্বৈত শাসন। কেউ গরিষ্ঠ নয়, কেউ লঘিষ্ঠ নয়। কংগ্রেস যদি এতে রাজী হয় তো তিনি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাইবেন না। নয়তো চাইবেন। কিন্তু সব দাবী

মেনে নিলেও তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেবেন না। ইংরেজই তাঁর শেষ ভরসা। হিন্দুদের বিশ্বাস কী? ওরা কেড়ে নিতেও পারে। ঠকাতেও পারে।" সৌম্য আক্ষেপ করে।

"এর মূল কোথায়, জানো? সিপাই বিদ্রোহে। হিন্দু দৈত্য আর মুসলিম বামন মিলে যে লড়াইটা করে তার ফলে হিন্দুর কম ক্ষতি, মুসলমানের সর্বনাশ। তার বাদশাহী যায়। তার তালুক মুলুক ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে ও রাজভক্ত হিন্দুদের দেয়। তখন থেকেই মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল অবিশ্বাস। একমাত্র গান্ধীজীকেই ওরা বিশ্বাস করেছিল। এখন তাঁকেও বিশ্বাস করে না। সেইজন্যে ওদের দাবী দিনকের দিন বাড়ছে। মেটাবে কে? ওই গান্ধীজী। যদি তিনি না মেটান তবে মেটাবে ইংরেজ।" মানস আফসোস করে।

সৌম্য ব্যথা বোধ করে। "মুসলমানরা একদা ভারত জয় করেছিল, সেই থেকে তাদের সকলের না হোক অনেকেরই ধারণা হিন্দুরা চিরদিন দুর্বল, দুর্বল বলেই অহিংসার বুলি আওড়ায়, গণতন্ত্রের খেলা খেলে। এরূপ ধারণা হিন্দুদেরও অনেকের আছে। দুই দিকেই বলপরীক্ষার জন্যে অর্থহীন ব্যাকুলতা। মেরে কেটে মেজরিটিকে কোনোদিন মাইনরিটি করা যাবে না। অথবা মাইনরিটিকে কোনোদিন নির্মূল করা যাবে না। মিলে মিশেই থাকতে হবে। বিবাদের বিষয়গুলো আপসে মিটিয়ে নিতে হবে। যেকালে মুসলমান ছিল না, হিন্দুই কেবল ছিল, সেকালে কি বিবাদ বিসংবাদ ছিল না? সব মুসলমানকে বিদায় করলেও বিবাদ বিসংবাদ থাকবে। তেমনি, মুসলমানের হাতে যখন রাজ্যভার ছিল তখন কি মুসলমানে মুসলমানে হানাহানি ছিল না! নবাব বাদশাদের কি হিন্দুর সাহায্য নিতে হয়নি? ইকনমিক পাওয়ার ছিল হিন্দু ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদারদের হাতেই। হিন্দুরাই করত রাজস্ব আদায়। সব হিন্দুকে বিদায় করলেও মুসলমানে মুসলমানে মারামারি থাকবেই। নতুন মোগলরাও পুরনো মোগলদের মতো রাজসিংহাসনের জন্যে লড়তে লড়তে সর্বনাশ ডেকে আনবেন। বাইরে থেকে আসবে একদল বিদেশী বণিক। তারাই নতুন এক পলাশীর যুদ্ধে জিতবে। হিন্দুরা যে মেজরিটি হয়েছে এটার জন্যে দায়ী ইতিহাস। ইতিহাসকে উলটিয়ে দেবার সাধ্য আছে কার! সেইজন্যে ভূগোলকে পালটিয়ে দেবার কথা উঠেছে! ভারতের একটা অংশ কেটে নিয়ে তাকেই বানাতে হবে মুসলমানের বাসভূমি। যেন সমস্তটাই তার বাসভূমি নয়। সে যেন আর-সব জায়গার বিদেশী। এতে রাজী হলে আমাকেও বলতে হবে বাংলাদেশে বিদেশী। কলমের এক খোঁচায় কোটি কোটি মানুষ হবে নিজ বাসভূমে পরবাসী। কত বড় অন্যায় বলো দেখি।

এই মূল্য না দিলে নাকি একদিন গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। আমরা এখন তার জন্যে তৈরি হতে পারছিনে, কারণ স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, সমগ্র শক্তি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধেই নিয়োগ করতে হবে। আগে তো এই অধ্যায় সারা হোক। তার পরে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বলপরীক্ষার অধ্যায়। অর্ধেক মুসলমান আমাদের দিকেই থাকবে। তাদের উপর আমরা হিন্দু রাজত্ব চাপাব না। মুসলিম লীগ বল সংগ্রহ করবে কোন্ উৎস থেকে? ওই ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকেই। মুসলিম মিতাদের ক্ষমতার এক ভাগ পাইয়ে না দিয়ে ওরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর করবে না। আর শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরই হলো কংগ্রেস নেতাদের লক্ষ্য। ইংরেজের মিতাদের দেওয়া মানে ইংরেজকেই পরোক্ষ দেওয়া। তা হলে আর স্বাধীনতা হলো কী করে?"

"তা হলে শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের লক্ষ্য ত্যাগ করতে হয়। তার পরিবর্তে লক্ষ্য হবে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার আসন অধিকার। গান্ধী নেতৃত্বে এটা সম্ভব নয়। সেইজন্যে নেতাবদলের প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রশ্নের উত্তর সুভাষচন্দ্র। জবাহরলালের ভিতরে একটা দোনোমনো ভাব আছে। তিনি বিপ্লবী নায়ক নন। কে জানে ইতিহাস কোন্ অভিমুখে যাচ্ছে? শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের না বৈপ্লবিক ক্ষমতা অধিকারের? কিন্তু হিন্দু প্রভুত্ব হলে মুসলিম বিদ্রোহকে তুমি এড়াবে কী করে? তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় মিউটিনি? কতকগুলো প্রদেশ বা অঞ্চল ওরা ক্যাপচার করবেই। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে চাই হিন্দু মুসলিম দ্বৈত প্রভুত্ব। সেইটাই বা কেমন করে সম্ভব? ইংরেজকে বিদায় করার আগে দশবার ভাবতে হবে বিকল্প রাজত্বের কথা। চান্সের উপর সেটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কমিউনিস্টরাও ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারে। বিপ্লবের থিয়োরি ওদের মুখস্থ। কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিকদের মধ্যে ওদের কর্মীরা সক্রিয়। আপাতত সুভাষচন্দ্রকে তুলে ধরলেও ওরা পরে নিজেদের লোককে গদীতে বসাবে। ওদের দলে মুসলমানও আছেন। তাঁদের বসিয়ে মুসলমানদেরও মন পাবে।" মানস যেন সবজান্তা।

সৌম্য একপ্রকার যন্ত্রণা বোধ করে। "ভাই মানস, আমরা বুঝি শুধু একটি কথা। স্বরাজ। আমাদের শুধু একটি লক্ষ্য। সারা ভারতের সার্বজনীন মুক্তি। আমাদের শুধু একটি পন্থা। অহিংস অসহযোগ। যার চরম পর্যায় গণসত্যাগ্রহ। এর কোনো শর্ট কাট নেই। লক্ষ্যের মধ্যপথে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে পৌঁছতেই আমাদের সতেরো বছর লেগে গেল। তা হলে হিসেব করে দেখতে পারো পূর্ণ স্বাধীনতায় পৌঁছতে কতকাল লাগবে। আরো সতেরো বছর লাগলেও আশ্চর্য হবার

কিছু নেই। গান্ধীজীরই তো সব চেয়ে অধীর হবার কথা। কারণ তাঁরই বয়স সকলের চেয়ে বেশী। সত্তর বছর। বাইবেলে লিখেছে সত্তর বছরই মানুষের পরমায়ু। ইতিমধ্যেই তিনি কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর উপর যাঁদের আস্থা নেই তাঁরা ইচ্ছা করলেই অন্য পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। অন্য নেতা বরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর সঙ্গী বেছে নিয়ে সঙ্ঘ গঠন করবেন। কেন তা হলে তাঁকে নিয়ে দুই দলের টাগ অভ ওয়ার? কেন একদল তাঁকেই পাঠাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে? যাতে আর এক-দফা সংগ্রাম নিবারিত হয়, জেলে যেতে না হয়, প্রাণ বিপন্ন করতে না হয়। জমি বাজেয়াপ্ত করা না হয়। সম্পত্তি ক্রোক করা না হয়। জরিমানায় সর্বস্বান্ত হতে না হয়। তাও যদি নিশ্চিত জানতেন যে জনগণ তাঁদের এই সংগ্রামে সবাই মিলে ঝাঁপ দেবে। নিয়মিত কুচকাওয়াজ না করে কোনো দেশের সৈন্যদল যুদ্ধে ঝাঁপ দেয় কি? লেনিনের বোলশেভিকরাও কি ১৯০৫ সালের বিপ্লবে সফল হয়েছিলেন? বারো বছর তাঁকে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল। বিপ্লব যখন ঘটে তখন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে। লেনিনের জন্যে বা দলের জন্যে অপেক্ষা করে না। দেশে ফিরে অক্টোবর মাসে তিনি জারের বিরুদ্ধে নয়, মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটান। আমাদের বামপন্থীরা বিপ্লবের জন্যে অধীর। কিন্তু সেই ভুলটি তাঁরা করবেন ১৯০৫ সালে লেনিনপন্থীরা যেটি করেছিলেন। কমসে কম বারোটি বছর নির্বাসনে কাটাতে হবে। ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন বিপ্লব ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। দেশে ফিরে এসে তাঁরা দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটাতে চাইবেন। সেটা নাও ঘটতে পারে। ক্ষমতার আসন জুড়ে যারা বসে থাকবেন তাঁরা মেনশেভিকদের চেয়ে আরো হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে পারেন। ইতিহাসে রুশবিপ্লবের পুনরাবৃত্তি হবার নয়। সেটাও ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি নয়। ইতিহাস আমাদের উপর ভার দিয়েছে নতুন এক পরীক্ষার। সেটা যুদ্ধের তথা বিপ্লবের নৈতিক বিকল্প আবিষ্কারের। যাকে বলে মরাল ইকুইভালেণ্ট। আমরা অন্যের পুনরাবৃত্তি করব না, নিজেরাই নজীর রেখে যাব। বহু দেশ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। গান্ধীজীর কাছে পাঁচ মহাদেশ থেকে চিঠি আসে। মরাল ম্যান ইন্ অ্যান ইমমরাল ওয়ার্ল্ড। অথচ তাঁর সঙ্গে ক'জন আছেন? তাঁদের পাঁচ আঙুলে গোনা যায়। বাপু আমাকে ডেকেছেন। যাচ্ছি দেখা করতে। ফেরার পর তোমার এখানে আসব।"

"সৌম্যদা", মানস ধরা গলায় বলে, "গান্ধীজীকে আমার বিনম্র প্রণাম জানিয়ে শুধু এই কথাটি বোলো যে ব্রিটিশ শাসন যদি তাঁর মতে একটা ইভিল হয়ে থাকে

তবে তার চেয়ে শতগুণ ইভিল নাৎসী ডিকটেটরশিপ, যেটা অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধে যদি ইংরেজ হারে, হিটলার জেতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত স্বাধীন হবে এটা আদর্শ-বাদীদের স্বপ্ন হতে পারে, বাস্তববাদীদের কাণ্ডজ্ঞান নয়। তিনি আমাদেরও বাপু। আমরাও চরকা কাটি, খদ্দর পরি, হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর জন্যে যথাসাধ্য করি, বাড়ীতে মুসলমান খানসামা, মগ বাবুর্চি। নিরামিষ খাই, মদিরা স্পর্শ করিনে, সত্যে মতি আছে, সাধ্যমতো অহিংসাও মানি, কিন্তু ব্রহ্মচর্য! এই ভরা যৌবনে? শিরসি যা লিখ, মা লিখ, চতুরানন।

দুই বন্ধুতে মিলে হাসাহাসি করে। মজা দেখতে বাচ্চারা ছুটে আসে। তারাও হাসে

॥ দশ ॥

চায়ের টেবিল থেকে যূথিকার ডাক আসে। দুই বন্ধুতে আবার তর্ক করতে করতে খাবার ঘরে যায়। যূথিকাও তাদের কথাবার্তায় যোগ দেয়।

"আচ্ছা, সৌম্যদা," যূথিকা বলে, "সমুদ্রমন্থনে কি শুধু অমৃত উঠেছিল? গরলও কি ওঠেনি? একরত্তি ক্ষমতা হাতে আসতে না আসতেই অমনি বেধে গেছে অন্তর্বিবাদ। কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে মুসলিম লীগের, মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের, কংগ্রেসের ডান হাতের সঙ্গে বাঁ হাতের, ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের। এর পরে যখন কেন্দ্রেও ক্ষমতা আসবে তখন কি বাধবে না মিলিটারির সঙ্গে সিভিলের, দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে প্রাক্তন ব্রিটিশ ভারতের, বাংলার সঙ্গে বিহারের, গুজরাটের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের, তামিলের সঙ্গে তেলুগুর, হিন্দীর সঙ্গে উর্দুর, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর? অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠে আসবে। সে গরল পান করবেন কে? নীলকণ্ঠ হবেন কে? কেউ যদি সে গরল পান না করেন তবে সারা দেশ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।"

সৌম্য চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রাখে। কী উত্তর দেবে স্থির হয়ে ভাবে। তার পর বলে, "সব ঠিক, কিন্তু স্বাধীনতার পথে এতদূর এগিয়ে এসে চলার মোমেণ্টাম থামাই কেমন করে? আমাদের নিয়তি আমাদের পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বিবাদ তো আগে থেকে মেটানো যায় না। বিয়ের আগে কি দাম্পত্য কলহ মেটানো যায়? গান্ধীজীকে তো কাছে থেকে দেখেছি। তাঁর বুকে সমস্তক্ষণ স্বাধীনতার আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে বইছে ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতধারা। মুসলমান, খ্রীস্টান সকলেই তাঁর ভাই। এমন কি ইংরেজও পর নয়। অ্যাণ্ড্রুজকে আর মীরাবেনকে তিনি কত ভালোবাসেন। আমাদের সংগ্রাম যদি অহিংসভাবে সারা হয়,

আমাদের জয় যদি অহিংসার জয় হয়, তবে অমৃতবণ্টনের একটা অহিংস পদ্ধতি পাওয়া যাবেই। আমরাই আমাদের ভাগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করব। তবে তার আগে নিশ্চিত হব যে স্বদেশের স্বার্থই সকলের উপরে। সম্প্রদায়ের স্বার্থ নয় বা প্রদেশের স্বার্থ নয় বা শ্রেণীর স্বার্থ নয়। বিদেশের স্বার্থ তো নয়ই।"

মানস হেসে বলে, "একেই বলে কাউনসেল অভ পারফেকশন। প্রথমেই ধরে নিয়েছ যে অহিংসার জয় হবে। তার পরে ধরে নিয়েছ যে কংগ্রেসের ভাগ কংগ্রেস স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে। তার পরে ধরে নিয়েছ যে স্বদেশের জন্যে যারা বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেনি তারা স্বদেশের স্বার্থকে সম্প্রদায়ের বা প্রদেশের স্বার্থের উপরে স্থান দেবে। তোমরা ন্যাশনালিস্ট বলে কি সবাই ন্যাশনালিস্ট? তোমরা অহিংস বলে কি সবাই অহিংস?"

"আমরাও কি অহিংস?" সৌম্য হেসে বলে, "আমাদের ক'জন অহিংস তা আঙুলে গোনা যায়। সেই ক'জনকে নিয়ে গান্ধী সেবাসঙ্ঘ গড়তে গিয়ে দেখছি তাতেও ভেজাল ঢুকেছে। না, ভাই, আমরা অহিংস নই, তবে আমরা আমাদের কর্মপদ্ধতি থেকে হিংসা প্রতিহিংসা বাদ দিয়েছি। আর ন্যাশনালিস্ট বলতে আমরা এইটুকু বুঝি যে আমরা সকলেই পরাধীন ও আমাদের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ সে দেশও পরাধীন। পরাধীনতা একটা ইভিল। তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু সেই জাতীয়তাবোধ কোথায় যা আমাদের একসূত্রে বাঁধবে? পরাধীনতার বন্ধনই হয়েছে একমাত্র সূত্র। বন্ধন খুলে গেলে আমরা মুক্ত হব ঠিকই, কিন্তু মুক্ত হওয়া আর যুক্ত হওয়া কি এক? ঐক্যের সাধনাও স্বাধীনতার সাধনার মতো একটা অবশ্যকরণীয় সাধনা। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, বাঙালী বিহারী প্রভৃতি বিভেদ সম্বন্ধে যেমন সচেতন ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে তেমন সচেতন নই। ইংরেজ চলে গেলে জাতীয়তাবাদ কতদূর পজিটিভ আর কতদূর নেগেটিভ তার পরীক্ষার সময় আসবে। আশ্চর্য হব না যদি দেশটা তুর্কদের অপসরণের পর বলকান হয়ে ওঠে। বলকান দেশগুলোও স্বাধীন, কিন্তু তাদের রাষ্ট্র এক নয়, কেন্দ্র এক নয়, পলিসি এক নয়, বাণিজ্য এক নয়। সেটা কি ভালো? না মন্দ?"

"তা হলে, সৌম্যদা, তুমি নিজেই স্বীকার করলে যে সেটা মন্দ। ইংরেজরা আর কিছু না করুক এ দেশে একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেছে। ইণ্ডিয়ান আর্মি, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান পুলিস, ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস, ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস থেকে শুরু করে ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ, ইণ্ডিয়ান পোস্টস অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফস প্রভৃতি ভারতকে এমন এক সংহতি দিয়েছে যা আমরা নিজেরা

গড়ে তুলতে পারতুম বলে মনে হয় না। ওরা হয়তো সেটা নিজেদের জন্যেই করেছে, কিন্তু আমরাও কি তার থেকে উপকৃত হচ্ছিনে? ওদের তৈরি কাঠামো যদি ওদের অবর্তমানে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায় তা হলে আমরা কি সেই টুকরোগুলোকে জুড়ে জুড়ে একাকার করতে পারব? তেমন সামর্থ্য, তেমন শুভবুদ্ধি, তেমন সদ্ভাব কি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর আছে? ক্ষমতা হাতে পেলে যে যার নিজের রাজত্ব স্থাপন করবে। তার খানিকটে কেটে নিয়ে স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে না। কেন্দ্রকেই সেটা জোর করে কেটে নিতে হবে। গণতন্ত্রের বিচারে ওটা হয়তো ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। কিন্তু জাতীয়তাবাদের দিক থেকে ওটা অত্যাবশ্যক। মুশকিল হচ্ছে এইখানে যে মৌলানা আজাদকে মোসলেম ভারত আপনার বলে গ্রহণ করছে না ও করবে না। মোসলেম ভারতের আনুগত্য চাইলে আজাদের জায়গায় জিন্নাকে নিতে হবে। নইলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কেন্দ্রীয় হাই কমাণ্ড হতে পারবে না। কেন্দ্রকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। ইংরেজ শাসনের শূন্যতা বহু পরিমাণে পূরণ করতে পারবে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। সত্যাগ্রহ তখন কোন্ কাজে লাগবে?" মানস সংশয় প্রকাশ করে।

"কংগ্রেস হাই কমাণ্ড একটা পার্টি হাই কমাণ্ড। তাতে জিন্নার স্থান হবে কী করে? তিনি তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে অন্য পার্টির নেতৃত্ব করছেন। যদি তিনি কংগ্রেসে ফিরে আসতেন তা হলে অবশ্য তাঁর কথা ভাবা যেত। তেমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি? তবে দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড সম্প্রসারিত হয়ে ন্যাশনাল হাই কমাণ্ড হবে। তাতে জিন্না সাহেবকেও নিতে পারা যাবে। কিন্তু আজাদকে বাদ দিয়ে নয়। হ্যাঁ, এইখানেই মুশকিল। জিন্না আজাদকে বর্জন করতে বলবেন। আজাদকে কংগ্রেস পার্টি বর্জন করবে না। সংগ্রামী কমরেডকে কেউ কখনো বর্জন করে? ইংরেজও কি রাজী হবে লীগপন্থী মিত্রদের বাদ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করতে? কংগ্রেস যদি গঠন করে ওরা কি স্বীকৃতি দেবে? এটা এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর দিতে না পারলে মোসলেম ভারত স্বতন্ত্র হতে চাইবে। এখন থেকেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সব মুসলমান চাইবে না, জানি। কিন্তু যারা চাইবে তারা যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তবে তাদের উপর গুলি চালাবে কে? ইংরেজও না, কংগ্রেসও না। সে এক অসহনীয় পরিস্থিতি। উদ্ধারের উপায় এক কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় অযোধ্যা ত্যাগ করে নির্বাসনে যায়। কিন্তু তা যদি হয় তবে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করবে কে?" সৌম্য ভেবে পায় না।

"ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট আর কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট এক জিনিস নয়। মুসলিম

রেজিমেন্টগুলো কংগ্রেস গভর্নমেন্টের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবে না। কংগ্রেস গভর্নমেন্টের নিশানকে সেলাম করবে না। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা সরকারও কেন্দ্রের কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে মান্য করবে না। যতদিন বড়লাট ও ইউনিয়ন জ্যাক, যতদিন ব্রিটিশ বেয়োনেট ততদিন শান্তি। তার পরেই বিস্ফোরণ। অযোধ্যা ত্যাগ করে নির্বাসনে গেলে তো সৈনিকে সৈনিকে লড়াই, জনতায় জনতায় দাঙ্গা। স্বাধীনতা মানে কি অরাজকতা? অরাজকতা কোনো দেশ সহ্য করতে পারে না। যে শাসন করতে পারবে তাকেই সে রাজা করবে। হলোই বা বিদেশী।" মানস বলে।

"সব ঠিক, কিন্তু বিদেশীকে কেউ ডেকে আনবে না। অহিংসার নিয়ম যদি লোকে মানে তবে দেশ অরাজক হবে না। যদি না মানে তবে গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধই নির্ধারণ করবে দেশের ভবিষ্যৎ। যে জিতবে সে-ই রাজত্ব করবে। পরাজিত প্রতিপক্ষকে ডেকে এনে সে রাজত্বের একভাগ দেবে।" সৌম্যর মতে এই হচ্ছে সমাধান।

"গৃহযুদ্ধ?" মানস আঁতকে ওঠে। "এক একটা গৃহযুদ্ধে কত লোক মরে, জানো? আর সে যুদ্ধ কতকাল ধরে চলে, জানো? জার্মানীর ত্রিশ বছরের যুদ্ধে লোকসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। তোমরা তো যুদ্ধবিরোধী। আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধ রোধ করতে চাও। গৃহযুদ্ধ নিশ্চয়ই রোধ করবে।"

"করব নিশ্চয়ই! গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মতো শহীদ হতে হবে। মহাত্মার মনেও তেমনি শহীদ হওয়ার সংকল্প। গৃহযুদ্ধের দিন আমরা দুই আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শান্তির জন্যে প্রয়াস চালিয়ে যাব।" সৌম্য প্রতিশ্রুতি দেয়।

"কিন্তু আরোগ্যের চেয়ে নিবারণ শ্রেয় নয় কি?" মানস তর্ক করে। "গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত যেতে হবে কেন? প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠন করো। তার পরে কেন্দ্রেও তার অনুসরণ করো। কংগ্রেস লীগ একমত হলে ইংরেজ কতদিন ঠেকাতে পারবে? তার জন্যে আর এক দফা সত্যাগ্রহ করতে হবে কেন?" মানস জানতে চায়।

"মনে হচ্ছে এটা তোমার মুসলিম বন্ধুদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি।" সৌম্য মুচকি হাসে। "কিন্তু তেমন কোয়ালিশন ক'টা বিষয়ে একমত হতে পারবে? এই ধরো না কেন, যুদ্ধে যোগদান। শর্তে না বনলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। লীগ মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন কি? তাঁরা যেখানে যেখানে আছেন তাঁরা সেখানে সেখানে থাকবেন। ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে অসহযোগ মুসলিম লীগ পলিসি নয়। তাঁদের পলিসি পারস্পরিক সহযোগিতা। ইংরেজরা মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

মুসলমানরা ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এরাও মাইনরিটি। ওরাও মাইনরিটি। মাইনরিটিকে মাইনরিটি রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে? ইংরেজ চলে গেলে মুসলিম মাইনিরিটির কী দশা হবে? ইংরেজ থাকতে কংগ্রেসের ভূমিকা হচ্ছে অপোজিশনের ভূমিকা। লীগের ভূমিকা তা নয়। ইংরেজ যখন থাকবে না তখন লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের সময় আসবে। নেহাৎ যদি প্রতিনিধিত্বের চড়ায় আটকে না যায়। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এ দাবী মেনে নিতে কংগ্রেস কখনো রাজী হবে না। হলে তার নিজেরই প্রতিনিধিত্ব কেবলমাত্র হিন্দুদের হয়ে দাঁড়ায়। লীগ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন কংগ্রেস ছিল। বিশ একুশ বছর ধরে সে হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছিল। লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব সংকীর্ণ হয়ে গেল? কংগ্রেস কি সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমবর্জিত হলো? কই, না। জিন্না সাহেব যেমন কংগ্রেসে ছিলেন তেমনি কংগ্রেসে রয়ে গেলেন। অধিকন্তু লীগেও যোগ দিলেন। জিন্নার কংগ্রেসত্যাগ অসহযোগের পরবর্তীকালে। গান্ধী এসে অসহযোগের সূত্রপাত না করলে জিন্না কংগ্রেসের ঘরের পিসী ও লীগের ঘরের মাসী হয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন করতেন। নীতির সঙ্গে নীতির বিরোধ তো মডারেটদের সঙ্গেও হয়েছে। তা বলে কেউ তো কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাননি। কোয়ালিশন যদি কোনোদিন হয় তবে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উপেক্ষা করেই হবে। যেমন হয়েছে কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে মুসলিম লীগের। হক সাহেব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উনিও এককালে কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগেও ছিলেন। সেকালে এটা দোষের কথা ছিল না। গান্ধীজী যদি না আসতেন, কংগ্রেস যদি সহযোগিতার নীতি ত্যাগ না করত, কোয়ালিশন অনেকদিন আগেই সম্ভব হতো। জিন্নাই হতেন তখন কংগ্রেসের প্রতিভূ। এখন যেমন আজাদ। কিন্তু ইংরেজ থাকতে কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্তন করবে না। গান্ধীজী থাকতেও না।"

"আমাদের ছেলেবেলায় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের একটা চুক্তি হয়েছিল। জিন্নার মধ্যস্থতায়ই সেটা সম্ভব হয়েছিল। তখন নামে না হোক কার্যত মুসলিম লীগ হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও কংগ্রেস অমুসলমান সম্প্রদায়বর্গের। ইংরেজরা সেইভাবে নির্বাচকমণ্ডলী ভাগ করেছিলেন। একভাগে মুসলমান, অপর ভাগে অমুসলমান। শিখরা বাদে। কংগ্রেস সেটা মেনে নিতে নারাজ হয়েছিল, কিন্তু লখনউতে ১৯১৬ সালে রাজী হয়। এর পরে ওঠে ওয়েটেজের প্রশ্ন। হিন্দুদের

যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেসব প্রদেশে মুসলমানরা চায় সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন আইনসভায়। মুসলমানদের যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেসব প্রদেশে অমুসলমানরা চায় সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন আইনসভায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলে এ প্রশ্নের ফয়সালা করে অমুসলমানের ভাগ থেকে কেটে মুসলমানকে ওয়েটেজ দিয়ে ও মুসলমানের ভাগ থেকে অমুসলমানকে ওয়েটেজ দিয়ে। বলা বাহুল্য অমুসলমান মানে প্রধানত হিন্দু। পরে তার জায়গায় বসানো হয় 'জেনারল'। ওয়েটেজের এই আদানপ্রদান শাসনসংস্কারের সামিল হয়। কথা হচ্ছে এতদূর এসে তোমরা পিছিয়ে যাবে কোন যুক্তিতে? অসহযোগই করো আর সহযোগিতাই করো তোমরা অমুসলমানদের তরফ থেকে ওয়েটেজ দিয়েছ ও পেয়েছ। ওরাও মুসলমানের তরফ থেকে ওয়েটেজ পেয়েছে ও দিয়েছে। মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী থেকে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা জয়ী হয়েছে বলেই কি কংগ্রেস মুসলমানদের তরফ থেকেও আদানপ্রদানের অধিকারী হলো? আদানপ্রদানটা হবে কার সঙ্গে কার, যদি কংগ্রেসই হয় দুই তরফের প্রতিনিধি? আর লীগ হয় মুসলমানের ক্ষুদ্র একটি বিভাগের? কংগ্রেস একাই সকলের হয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবে, দেশের জন্যে স্বাধীনতা আদায় করে নেবে? উত্তম। কিন্তু সংবিধান রচনার সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়ে সেফগার্ড দাবী করবে কারা? কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা বা লীগপন্থী মুসলমানরা? এই প্রশ্নে মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট পড়বে কাদের দিকে বেশী? জিন্নাকে তাঁর পাওনা দিতে হবেই। তিনি সায় না দিলে ইংরেজ সায় দেবে না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টই তো আইন পাশ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তবে তোমরা যদি গায়ের জোরে মসনদ দখল করতে পারো সেকথা আলাদা। গায়ের জোরে তোমরা বিশ্বাসই করো না। তবে কি আত্মার জোরে দখল করবে?" মানস হাসে।

"প্যারালাইজ করব। দিল্লীর হুকুম দিল্লীর বাইরে পৌঁছবেই না। কলকাতার হুকুম কলকাতার বাইরে পৌঁছবেই না। জেলার সদরের হুকুম সদরের বাইরে পৌঁছবেই না। মহকুমার সদরের হুকুম মহকুমা সদরের বাইরে পৌঁছবেই না। গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে থানা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে মহকুমা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে জেলা পঞ্চায়েৎ। তার ঊর্ধ্বে প্রদেশ পঞ্চায়েৎ। সকলের ঊর্ধ্বে দেশ পঞ্চায়ৎ। সব চেয়ে কম ক্ষমতা সকলের ঊর্ধ্বে। সব চেয়ে বেশী ক্ষমতা সকলের নিচে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি স্বীকৃতি না দেয় কী আসে যায়? আমাদের সংবিধান আমরাই রচনা করব। সে সময় পঞ্চায়েতী পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে মুসলমান

সদস্যরাও থাকবেন। সেফগার্ড যদি চান, যা চান আপসে মেনে নেওয়া হবে। সর্ব স্তরেই তাঁদের উচ্চস্থান থাকবে। তবে তাঁরা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না হয়ে সাধারণের প্রতিনিধি হবেন। সেইজন্যে ওয়েটেজ ইত্যাদির প্রশ্ন উঠবে না। যদি ওঠে তখন পারস্পরিক আদানপ্রদান হবে। তবে কেন্দ্রে মুসলমানরা কেমন করে ওয়েটেজের প্রতিদানে ওয়েটেজ দেবেন বলতে পারছিনে। একটাই তো কেন্দ্র। সেখানে এক মাইনরিটিকে ওয়েটেজ দিলে অন্যান্য মাইনরিটিদেরও ওয়েটেজ দিতে হবে। সেটা দিতে গেলে মেজরিটির ভাগে কতটুকু বাকী থাকে?" সৌম্য সংশয়ান্বিত।

"এই নিয়েই বিরোধ বেধে যাবে, সৌম্যদা। সেটা যেন জার্মানীর মতো প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের সশস্ত্র যুদ্ধে না গড়ায়। হিন্দু মুসলমান তো প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের চেয়ে আরো বেশী ফারাক। দুটো সম্প্রদায় বললে ঠিক বোঝানো যায় না। দুটো নেশন বললেও ভুল বোঝানো হয়।" মানস ভেবে পায় না কী বলে বোঝানো যায়।

যুথিকা কণ্ঠক্ষেপ করে। "নেশন বললে কি ভুল হবে?"

"আলবৎ।" মানস উত্তর দেয়। "মুসলমান তো আফগান, ইরানী, তুর্ক এরা সবাই। তা হলে সবাই মিলে এক নেশন? তা নয়, চীনা মুসলমানরা চীনা, ইন্দোনেশিয়ান মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়ান, ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয়। তবে তারা হিন্দু নয়। যেমন আইরিশ প্রটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিক নয়। তা সত্ত্বেও বার্নার্ড শ আইরিশ, য়েটস আইরিশ, এ. ই. যাঁর ছদ্মনাম সেই জর্জ রাসেল আইরিশ। আইরিশ নেতা পার্নেলও ছিলেন প্রটেস্টাণ্ট।"

"কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল আইরিশরা স্বাধীন হয়ে এক নেশন রইল না। প্রটেস্টাণ্টরা পৃথক হয়ে গেল।" যুথিকা বলে। "উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্টরা আর আইরিশ বলে পরিচয় দেয় না। ওরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেই ওদের সদস্য পাঠায়। নেশন বলতে ওরা বোঝে ব্রিটিশ নেশন। যে নেশন প্রধানত প্রটেস্টাণ্ট। ধর্মভেদ থেকে নেশনভেদ বিংশ শতাব্দীতেও অপ্রচলিত হয়নি। ভারতীয় মুসলমানরা যদি ভারতীয় বলে পরিচয় দেয় তবে ওরা আলাদা নেশন হতে পারে না। আর যদি আলাদা নেশন বলে পরিচয় দেয় তবে ওরা ভারতীয় থাকতে পারে না। ওদেরকেই মনঃস্থির করতে হবে। ওদের সিদ্ধান্তটাই আমরা আপসে মেনে নেব। গৃহযুদ্ধ বাধতে যাবে কেন?"

"তুমি তো বেশ বললে!" মানস বিরক্ত হয়। "আলাদা নেশন হলে আলাদা নেশনকে আলাদা ভূমি দিতে হবে। ওরা যদি দিল্লী চায় তা হলে কি আমরা ওদের

দিল্লী ছেড়ে দেব? কুরুক্ষেত্র বাধবে না? ওরা যদি বলে কলকাতা ওদের আমরা কি কলকাতা ছেড়ে দেব? লঙ্কাকাণ্ড বাধবে না? আবার শিখরাও তো বলবে লাহোর ওদের, অমৃতসর ওদের, নানকানা সাহেব ওদের। ওরাও তো বলবে ওরাও আলাদা এক নেশন, ওদেরও আলাদা বাসভূমি। মুসলমানরা কি তাতে রাজী হবে? বেধে যাবে না চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ? মুসলমানরা যে প্রত্যেকবারে জিতবেই এমন কী কথা আছে? যেটুকু ওরা বিনা দ্বন্দ্বে পাবে সেটুকুই ওদের। আর সেটুকু কি ওদের মনে ধরবে? ওতে কি ওদের পেট ভরবে?”

সৌম্য মৌনভঙ্গ করে। “গ্যাখ, মানস, মুসলমানরা বেশীর ভাগ আমাদেরই ঘরের ছেলে। এক একটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা তরু দত্ত। ওরা যদি আলাদা নেশন হয় তো আরবী নামকরণের মোহেই হবে। আলাদা বাসভূমি যদি চায় তবে সেটাও হবে মোহবশে চাওয়া। পুরুষানুক্রমে যদি চাইত তা হলে জানতুম যে ওরা দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিবেচনা করে ও রকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেখেছে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রসঙ্গ সবে উঠতে শুরু করেছে। তার সংজ্ঞা যে কী তাও কেউ বলতে পারছেন না। লীগপন্থীদের ওয়েটেজ, ভীটো ইত্যাদি দাবী মিটলে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনেই রাজী হবেন। তবে এটাও তাঁদের প্রত্যাশা যে আবার যখন নির্বাচনের সময় আসবে তখন একই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিযোগিতায় নামবে না। কংগ্রেসকেই মুসলিম আসনের দাবী ছেড়ে দিতে হবে। এখন থেকেই কংগ্রেসপন্থী মুসলিমদের কোয়ালিশন থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস কখনো তার সংগ্রামী কমরেডদের বর্জন করবে না। লীগ যদি অবুঝ হয় তো কোয়ালিশন সুদূরপরাহত। অগত্যা আলাদা একটা রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠবেই। সব মুসলমান সে প্রস্তাব সমর্থন করবে না। করবে যারা তারা সেপারেটিস্ট। এদের সংখ্যা কত, প্রভাব কত তা বলা শক্ত। যদি খুব বেশী হয় তবে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ হিন্দুরা কেউ তেমন প্রস্তাবে রাজী হবে না, শিখরাও না, কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরাও না। গোটা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নারাজ হবে। লীগপন্থীরা যদি মনে করে থাকেন যে সেই মর্মে আপস হবে তা হলে তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন। ইংরেজরাও যদি মনে করে থাকেন যে তাঁরা সে রকম একটা রোয়েদাদ চাপিয়ে দিয়ে যাবেন তা হলে তাঁরাও নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন।”

“আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গুরুজনদের মুখে শুনতুম ভারতের আদর্শ হচ্ছে সর্ব ধর্ম সমন্বয় আর হিন্দু মুসলিম ঐক্য।” মানস বলে। “কিন্তু আমাদের চোখের সুমুখেই হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠছে। আমরা যতই বলি না

কেন তৃতীয় পক্ষ এর জন্যে দায়ী, আমাদের দুই পক্ষের মনেই পরস্পরের প্রতি ভয় আর অবিশ্বাস, ঈর্ষা আর দ্বেষ। যেন অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতাই হচ্ছে মোক্ষ। যার আছে সে কিনা হ্যাভ। যার নেই সে কিনা হ্যাভ-নট। এদের মধ্যে ঐক্য কেমন করে সম্ভব? আর সমন্বয় বলতে কি বোঝায় প্রার্থনা সভায় যে যার মতে প্রার্থনা করা? ওটার নাম সমন্বয় নয়, সহ-অবস্থান। সহনশীলতা।"

"তিক্ততা যে দিন দিন বাড়ছে তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু সেটা কি ধর্মের সঙ্গে ধর্মের মিল নেই বলে? সাধারণ মানুষ এ নিয়ে একটা বোঝাপড়ায় পৌছেছে। সেটা সমন্বয় নয়, কিন্তু 'লিভ অ্যাণ্ড লেট লিভ'। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি। এইভাবে বহু শতাব্দী ধরে শান্তি রক্ষিত হয়েছে। ক্রুসেডও বাধেনি, ত্রিশ বছরের যুদ্ধও বাধেনি। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দাঙ্গা বেধেছে। তাও ধর্ম নিয়ে নয়, গোহত্যা নিয়ে। মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। কিন্তু আজকের দিনে যে অশান্তি দেখছ এটা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। কোন্ সম্প্রদায়ের ভাগে ক'টা চাকরি পড়বে, ক'টা আসন পড়বে, ক'টা মন্ত্রীপদ পড়বে এই নিয়ে রেষারেষি। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষায় পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে চাকরিবাকরিতে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত পেয়েছে। পঞ্চাশ বছরের পথ মুসলমানরা পাচ বছরে অতিক্রম করবে কী করে? জার্মানী আর জাপান যেমন চাইছে ইংলণ্ড আমেরিকার শিল্পায়নের দেড়শো দু'শো বছরের প্রগতিকে পঞ্চাশ ষাট বছরে অতিক্রম করতে। পাল্লা দিয়ে পারছে না। তাই যুদ্ধ করছে। হ্যাঁ, যেমন ওদেশে তেমনি এদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাই হচ্ছে মোক্ষ! তার জন্যে ওরা যুদ্ধ করছে, বিপ্লব করছে। আমরা করছি ধর্মের নামে দাঙ্গা। হ্যাভ আর হ্যাভ-নট যদি বলো, শতকরা ক'জন হিন্দু হ্যাভ্! বেশীর ভাগই তো হ্যাভ-নট। আর মুসলমানদের মধ্যেও কি হ্যাভ নেই? ভারতের সব চেয়ে ধনী মানুষটিই তো মুসলমান। হায়দরাবাদের নিজাম। ধনসম্পদের অসম বণ্টন তো সম্প্রদায় অনুসারে হয়নি। হয়েছে পরিবার বা গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অনুসারে। এর মধ্যে সম্প্রদায়কে টেনে আনা হচ্ছে যারা স্টার্ট পায়নি তাদের স্বার্থে। তারাই কি তাদের সম্প্রদায়ের শতকরা একশো জন? জনগণের এতে লাভ কতটুকু হবে? তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। অথচ তারাই মরছে দাঙ্গাহাঙ্গামায়। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য আমরা সমস্ত অন্তরের সঙ্গে কামনা করি! তা না হলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ থাকতে দাবীদাওয়ার শেষ নেই। তৃতীয় পক্ষই অলক্ষ্যে দর বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারা আরো বেশী দিতে পারে এই বিশ্বাস থেকে উঠছে অতিরিক্ত দাবী।" সৌম্য বলে।

"তৃতীয় পক্ষকে কথায় কথায় জড়াতে চাও কেন? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে

জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান? তার মানে হিন্দু হ্যাভ, মুসলমান হ্যাভ্‌-নট। সাম্প্রদায়িক রূপ নিলেও আসলে এটা শ্রেণীসমস্যা। শ্রেণীসংঘর্ষ এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূর্তি ধরতে পারে। অন্য দেশে যারা কমিউনিস্ট এদেশে তারা কমিউনালিস্ট। কিন্তু উদ্দেশ্য একই। জমিদারি বিলোপ। মহাজনী বারণ। যাদের স্বার্থহানি হবে তারা হিন্দুধর্মের নাম করে বাধা দেবে। কংগ্রেসও যে বাধা দিচ্ছে না তা নয়। আইনসভায় দেখা যাচ্ছে মুসলিম লীগই প্রগতিশীল, কংগ্রেস প্রগতিবিরোধী। বাংলার কথাই বলছি। কংগ্রেস যে কেবল মধ্যবিত্ত মুসলমানদের আস্থা হারাচ্ছে তাই নয়, প্রজা ও খাতক শ্রেণীর মুসলমানেরও বিশ্বাস হারাচ্ছে? ওরা দেশের স্বাধীনতার মহিমা বোঝে না। বোঝে কম খাজনা ও বিনা সুদের মর্ম।" মানসও সহানুভূতিশীল।

"যারা কমিউনিস্ট হতে পারত তারা কমিউনালিস্ট হচ্ছে। এটা আমিও লক্ষ করেছি। এইভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা হচ্ছে। এই খেলা খেলছে হিন্দু মহাসভা। হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করতে। বাংলার কংগ্রেস যদি দূরদর্শী হতো জমিদার মহাজনদের স্বার্থের চেয়ে প্রজা ও খাতকদের স্বার্থের উপর আরো জোর দিত, যেমন দিচ্ছে মাদ্রাজের কংগ্রেস। এই অর্থনৈতিক বিরোধটাকে কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারছে না দলের সংহতি রাখতে গিয়ে। এই ইস্যুতে যদি দল ভেঙে যায় তো স্বাধীনতার জন্যে লড়বে কে? প্রথম কাজটি প্রথমে। একমুঠো জমিদার লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু সেটা এখন নয়, স্বাধীনতার পরে। মহাজনদের হটানো আরো শক্ত, কারণ ওরাই গ্রাম অঞ্চলের ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের বিস্তার না হলে অভাব অনটনের সময় লোকে যাবে কার কাছে? মানছি ওরা এক একটি শাইলক আর ওরা হয় হিন্দু নয় কাবুলী মুসলমান। সাধারণ মুসলমান ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে। সুদ নেওয়াকে মনে করে হারাম। ডাকঘরে যাদের আমানত আছে তারা সুদের টাকা তুলবে না। ও টাকা জমতে জমতে আসলকে ছাড়িয়ে যায়। এইখানেই ইসলামের জোর। এমন জোর তো আর কোনো ধর্মের নেই। যদিও কুসীদবৃত্তির নিন্দাবাদ আছে খ্রীস্টধর্মেও। হিন্দুধর্মেও ওটা গর্হিত। যেসব ব্রাহ্মণ কুসীদজীবী তারা ছোট ব্রাহ্মণ। আমি অবাক হই ভেবে ইসলামের কঠোর হস্ত কাবুলীদের বেলা নরম কেন? কাবুলীদের উৎপাতে বাঙালী হিন্দুরাও তো কমিউনাল হতে পারত। কিন্তু হয় না। তা হলে সাহা মহাজনদের উৎপাতে মুসলমানরা কমিউনাল হবে কেন?" সৌম্য বিস্মিত হয়।

"তবে কি তুমি বলতে চাও ওরা কমিউনিস্ট হবে? কংগ্রেসী হয়ে তো কোনো

লাভ নেই। তোমরা পরাধীন থাকতে প্রতিকার করবেও না, করতে দেবেও না। মন্দ কী, যদি ওরা কমিউনিস্ট হয়ে প্রতিকার খোঁজে?" মানস ইচ্ছে করে খোঁচায়।

"কমিউনিস্টদের প্রতিকারের উপায় তো আগে রাষ্ট্র দখল করা, তার পরে অন্যায় দূর করা। রাষ্ট্র দখল করা কি আজ এখনি সম্ভব? কমিউনিস্টরা বিপ্লবের জন্যে তোড়জোড় করবে। তাদের শাস্ত্রে বলে বিপ্লব না হলে রাষ্ট্র দখল করা যায় না। তোড়জোড় করতে করতেই লগ্ন অতীত হবে। যে লগ্নে গণ সত্যাগ্রহ করে প্রশাসনকে প্যারালাইজ করা সম্ভবপর। তুমি দেখবে ওদের আগেই আমরা লগ্ন জেনে জয়যাত্রায় বেরোব ও জয়যুক্ত হব। তার পরে আসবে সামাজিক যত অন্যায়ের প্রতিকার। মেরে কেটে নয়, বিনা রক্তপাতে আমরা সব রকম শোষণ রদ করব। কমিউনিস্ট বা কমিউনালিস্ট না হয়েও অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়, মানস। যদি তার আগে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি। আপাতত আমাদের এক লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদ করতেই হবে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।" সৌম্য উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃতি দেয়।

"আমার কী জানি সন্দেহ হয় যে কংগ্রেস হবে ভারতের কুওমিনটাং। মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে সান ইয়াৎ সেনও তো কত বড়ো বড়ো কথা বলেছিলেন। জীবনে দেখে যেতে পারলেন না তাঁর সাধু সংকল্পের রূপায়ন। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, দরিদ্ররা আরো দরিদ্র। ওদেশেও সমাজ-বিপ্লবের জন্যে তোড়জোড় চলছে। মাওপন্থীরা লং মার্চ করে একটা অঞ্চল দখল করে ফেলেছে। ওরাও কমিউনিস্ট, তবে ঠিক লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। কংগ্রেস যদি কুওমিনটাং হয়ে ওঠে এদেশেও চীনদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, সৌম্যদা। এটা গরিব লোকদেরই দেশ। দেশকে মুক্ত করলে কী হবে, গরিবকে মুক্তি দিতে হবে। সুদ থেকে, খাজনা থেকে, মুনাফা থেকে, বেগার থেকে, বেকারি থেকে, জাতপাত থেকে, ধর্মান্ধতা থেকে। যদি সম্ভব হয়, বিনা রক্তপাতে। নয়তো- "মানস শেষ করে না। চোখ বোজে।

"ক্ষমতা হাতে পেলে চরিত্রভ্রংশ ঘটে এটা কংগ্রেসের বেলাও যে সত্য হতে পারে না তা নয়। আমরা তো এর জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। কংগ্রেসের অধঃপতন দেখলে আমরা কংগ্রেস থেকে সরে যাব ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সত্যাগ্রহ করব। কংগ্রেসের বিনাশ নয়, তার সংশোধনই আমাদের কাম্য হবে। কংগ্রেস যদি গান্ধীনির্দিষ্ট পন্থায় চলে তবে সুদ, মুনাফা, খাজনা প্রভৃতির দুর্বহ ভার থেকে দেশের শোষিত জনগণ মুক্তি পাবে। মার্কসবাদীদের মতো আমাদেরও

লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ। যেটা ওদের কল্পনার বাইরে সেটাও আমাদের ধ্যানে আছে। শাসনমুক্ত রাষ্ট্র।" সৌম্য বলে যায়।

"কেন, ওরাও তো বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। ধরো, একশো বছর পরে।" মানস মুখ টিপে হাসে।

"আমরা কিন্তু আরো আগে লক্ষ্যভেদ করব আশা করি। ধরো, পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে। হাসছ যে! বিশ্বাস হয় না?" সৌম্যও হাসে।

"বিশ্বাসে মিলয়ে গান্ধী, তর্কে বহুদূর।" যূথিকা ফোড়ন কাটে।

"দেখবে তোমরা, আগে স্বরাজটা তো হোক। সঙ্গে সঙ্গেই বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে যাবে। সেই প্রক্রিয়া যখন সারা হবে তখন দেখবে দেশের জনগণ আর প্রত্যেকটি বিষয়ে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নয়। লোকে যদি রাষ্ট্রের মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকে তবে রাষ্ট্রকেই বা পুছতে যাবে কেন? রাষ্ট্র তবু থাকবে। তার কাজ হবে কো-অর্ডিনেশন। নয়তো ভারতের সাত লক্ষ গ্রাম পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" সৌম্য আশঙ্কা করে।

"তা হলেও কংগ্রেসের মতো একটি সংগঠন বা গান্ধীসেবাসঙ্ঘের মতো একটি সঙ্ঘ আবশ্যক হবে পরিচালনার জন্যে বা সমলোচনার জন্যে বা প্রতিরোধের জন্যে। তা ছাড়া একটা বাহিনী তো আবশ্যক হবেই দেশরক্ষার জন্যে। উচ্চতম বিচারশালাও আবশ্যক হবে। যত ক্ষুদ্র হোক না কেন; একটা ব্যুরোক্রাসীও আবশ্যক না হয়ে পারে না। সকলের উপরে আবশ্যক হবে একটা কনস্টিটিউশন। গান্ধীজীকেও এসব কথা ভেবে দেখতে হবে।" মানস বলে।

"গান্ধীজীর মতে সব কিছু গড়ে উঠবে নিচের থেকে উপরে।" সৌম্য বোঝায়।

"কিন্তু কার্যত সব কিছু নামছে উপরের থেকে নিচে। গান্ধীজী, তাঁর নিচে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড, তাঁর নিচে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, মায় কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলে বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী। এর পরে হয়তো কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সদস্যগণ। আপাদমস্তক নয়, মাথা থেকে পায়ের নখ।" মানস টিপে টিপে বলে।

"এটা হচ্ছে সংগ্রামের অনুরোধে। আমাদের তো আর কোনো সৈন্যদল নেই। ঐ কংগ্রেসই আমাদের সৈন্যদল। আর গান্ধীজীই আমাদের প্রধান সেনাপতি। তাঁর নিচে সৈন্যদলের হাই কমাণ্ড। সংগ্রামের পর এর প্রয়োজন থাকবে না" সৌম্য যেন সব জানে।

"আমার তো মনে হয় এ ব্যবস্থা থাকতে এসেছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে সেকালের ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে স্টেটের।

গান্ধীজীই হবেন পোপ। পোপ যেমন সম্রাটের উর্ধ্বে তিনিও তেমনি রাষ্ট্রপতির উর্ধ্বে। পরে একসময় ঘটবে উভয়ের সংঘর্ষ।" মানস অনুমান করে।

"রাজনীতি যদি নীতির অনুশাসন মেনে চলে তা হলে সংঘর্ষের উপলক্ষ থাকবে না। কংগ্রেস যদি কেবল রাজনীতি নিয়ে মত্ত থাকে, নীতি নিয়ে মাথা না ঘামায় তবে দেশের যিনি সব চেয়ে বিবেকবান পুরুষ তিনি বিবেকের বাণী শোনাবেন। না শুনলে সংঘর্ষ বাধবে। গান্ধীজী পোপও হতে চান না, চার্চও গড়তে চান না। তোমার ও সন্দেহ অযথা। পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম যতদিন কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ততদিন। আবার যখন সত্যাগ্রহের ডাক আসবে তখন গান্ধীজীই হলেন একমাত্র কমাণ্ডার। হাই কমাণ্ড কেউ নয়। কেন ওঁদের অত গুরুত্ব দেওয়া? ওঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা?" সৌম্য উপেক্ষা করে।

॥ এগারো ॥

"দাদা," যূথিকা আর এক পেয়ালা চা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "এই মানুষটির সঙ্গে কী করে ঘর করি, বলতে পারো? সারা রাত ইনি পায়চারি করবেন। এঁর ওই একই চিন্তা, একই ধ্যান। গেল, গেল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম গেল। গেল, গেল, লুভর মিউজিয়াম গেল। ভীনাস ডি মাইলো, তোমাকে কি আর দেখতে পাব? মোনা লিসা, তোমাকে কি আর দেখতে পাব? বিশ্বমানবের কী অপূরণীয় ক্ষতি! আমি কি নীরব দর্শক হতে পারি? বলুন দেখি দাদা, নীরব দর্শক না হয়েই বা আমরা কী হতে পারি। সশস্ত্র যোদ্ধা? তাতে কি ক্ষতি কমবে না বাড়বে? ইংরেজ ফরাসীরাও পাল্টা দিতে গিয়ে রোম মিউনিক ড্রেসডেন ধ্বংস করবে। ইউরোপে যদি যাই আমি কি দেখতে পাব রাফেলের আঁকা সিস্টিন মাডোনা? মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মোজেস?"

"বোন, ওটা আমারও জিজ্ঞাসা।" সৌম্য ব্যথিত হয়ে বলে, "হিংসা এখন বিশ্ব জুড়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে হিংসার সঙ্গে বলপরীক্ষা করতে। মানুষই মানুষের হাতে গড়া সভ্যতাকে বোমা ও গোলা দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করবে। শহরকে শহর জ্বালিয়ে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে। প্রাণের প্রতিও বিন্দুমাত্র মমতা নেই। নিরীহ নারী ও শিশুর প্রাণ যাবে। যুদ্ধ যেদিন শেষ হবে সেদিন আবার শুরু হবে আরো এক যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। সেদিন যদি মানস বেঁচে থাকে তাকে সেই একই প্রশ্ন সারারাত জাগিয়ে রাখবে। আমি যদি বেঁচে থাকি আমাকেও। এর একটিমাত্র উত্তরই সম্ভব। হিংসা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে অহিংসাও তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ হবে। হিংসার সঙ্গে একদিন অহিংসার বলপরীক্ষা হবে। তাতে যদি অহিংসার জয় হয় তবেই মানুষ এ পৃথিবীতে আরো কয়েক হাজার বছর বাঁচবে। তার সভ্যতাও নিষ্কণ্টক হবে। নয়তো এই

শতাব্দীতেই ইউরোপ আত্মঘাতী হবে, ভারতকেও নিজের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে সহমরণে নিয়ে যাবে। আমাদের সব চেয়ে জরুরি কাজ এখন নিজেদের ছাড়িয়ে নেওয়া ও সঙ্ঘবদ্ধ হিংসার প্রতাপকে সঙ্ঘবদ্ধ অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করা। তা সে ইংরেজেরই হোক আর জার্মানেরই হোক আর জাপানীরই হোক। বিশ্ব এখন ভারতের কাছেই এর পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখবে বলে অপেক্ষা করছে। আমরা কি প্রস্তুত? হার জিৎ আমাদের হাতে নয়, ঈশ্বরের হাতে। হেরে গেলেও আমরা অপরের জন্যে দৃষ্টান্ত রেখে যাব। গান্ধীজীই যে অহিংসার শেষ প্রোফেট তা নয়। আমরাও যে শেষ সাধক তাও নয়। কিন্তু আজকের জগতে এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা। না, আমরা নীরব দর্শক নই। এই দাবানলের দমকল বাহিনী যদি কোথাও থাকে তবে তা ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ অহিংসাবাদী মণ্ডলী। কংগ্রেস বলতে পারলে গর্বিত হতুম, কিন্তু সে গর্ব আমাদের সাজে না। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ বলতে পারলে আরো গৌরব বোধ করতুম, কিন্তু সেখানেও সুবিধাবাদীর ভিড়।"

মানস তা শুনে বলে, "সভ্যতার সঙ্কট ক্রমেই ঘনিয়ে আসবে, সৌম্যদা। হিটলার হয়তো পোলাণ্ডের পর স্টালিনের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়াকেই আক্রমণ করবে। প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে রুশ বিপ্লবকে পরাভূত ও বিপর্যস্ত করবে। আমি নিজে কমিউনিস্ট না হলেও ওদের ওই বিরাট পদক্ষেপের ট্র্যাজিক পরিণাম কামনা করিনে। সব লাল হয়ে যাবে না বলে বহু দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, কিন্তু সব কালো হয়ে যাবে এটাও কম অস্বস্তিকর নয়। এটা হবে আরো বড়ো ট্র্যাজেডী। কে জানে হয়তো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণশীলরা হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসরণ করবেন।"

"তাই যদি হয় তো ব্রিটেন ফ্রান্স বেঁচে গেল। ওরাই তো তোমার বিশ্বমানব। ওদের নিয়তিই তোমার মানবনিয়তি।" সৌম্য পরিহাস করে।

"আহা! তুমি বুঝতে পারলে না? জার্মানীর সঙ্গে সংগ্রামে রাশিয়া যদি জেতে বিপ্লব দেশে দেশে ছড়াবে। ভারতও লাল হয়ে যাবে। আর জার্মানী যদি জেতে তবে বিপ্লব রুশদেশেই ব্যর্থ হবে। দুনিয়ার কোনোখানেই সফল হবে না। নাৎসীবাদ দিকে দিকে ছড়াবে। বিপ্লব বলো প্রতিবিপ্লব বলো উভয়েরই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে রুশ জার্মান রণক্ষেত্রে। এ যুদ্ধ কি কেবল আলসাস লোরেন আর উপনিবেশের জন্যে হচ্ছে? পোলাণ্ড থেকে হিটলার পূব মুখেও এগিয়ে যেতে পারে, পশ্চিম মুখেও মোড় ঘুরতে পারে। বিশ্বমানব বলতে আমি রুশদেরও বুঝি। ইতিহাসে ওরা একটা নতুন পরীক্ষা চালাচ্ছে। ওদের গুরু মার্কস লেনিন। যেমন আমাদের এদেশে চলছে অহিংসার পরীক্ষা। যার গুরু গান্ধীজী। আমার সবতাতেই ইণ্টারেস্ট

আছে। তবে সব চেয়ে বেশী লিবারল ডেমোক্রাসীতে। সুতরাং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায়।" মানস বিশদ করে।

"ভাই মানস, ওদের ওই লিবারল ডেমোক্রাসী অক্ষয় হোক। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। ইংরেজ বা ফরাসী হলে আমিও ওর জন্যে প্রাণ দিতুম, তবে প্রাণ নিতে আমার বিবেকে বাধত। কিন্তু আমাদের এদেশে ও জিনিস আমদানী করা বৃথা। যেমন বৃথা রুশদেশের সোভিয়েট সমাজতন্ত্র। আমাদের ঐতিহ্য অন্যরূপ। তাই আমাদের পক্ষে অন্য ব্যবস্থাই শ্রেয়। যার নাম রাখতে পারি পঞ্চায়েতী গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র। এর পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে দেশ স্বাধীন হলে।" সৌম্য আশ্বাস দেয়।

"সেটাও একপ্রকার সোশিয়াল ডেমোক্রাসী। জার্মানীতে যার পরীক্ষা হিটলারের দৌরাত্ম্যে অকালে অসমাপ্ত থেকে গেল।" মানস আক্ষেপ করে।

"আমাদের এদেশে আমরা এমনভাবে গোড়াপত্তন করব যে চূড়ায় উঠে কেউ ভিৎ পর্যন্ত টলিয়ে দিতে পারবে না। চূড়া ভেঙে দিলেও কেউ গোড়া ভেঙে দিতে পারবে না। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ রাজ অবাধে কাজ করে যাবে। গ্রামগুলো হবে অন্নে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের রাজধানী বেহাত হলেও গ্রামের রাজধানী বেহাত হবে না। কোনো ডিকটেটরই সাত লক্ষ পঞ্চায়েতের উপর গায়ের জোর খাটাতে পারবে না। ওদের সবাইকে বশ করাও অসম্ভব। অসহযোগের দ্বারা, সত্যাগ্রহের দ্বারা ওরা যে কোনো ডিকটেটরের শাসনকে অচল করে দিতে পারবে। সেইভাবে যে-কোনো শোষণকারীর শোষণকেও।" সৌম্য অভয় দেয়।

"সাধু! সাধু!" মানস হাততালি না দিয়ে শান্তিনিকেতনী কেতায় বলে, "সাধু! সাধু!" কিন্তু তর্ক না করে থাকতে পারে না। "তুমি ধরে নিয়েছ যে দেশটা ভারত বলে আর-দশটা দেশের বেলা যেটা সত্য তার বেলা সেটা সত্য নয়। সর্বত্র দেখা যাচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে উঠছে যন্ত্রশিল্পপ্রধান। তাই গ্রামপ্রধান না হয়ে নগরপ্রধান। জার্মানীর ভারকেন্দ্র সত্তর বছর আগে ছিল গ্রাম, এখন নগর। ব্রিটেনে সেটা আরো আগে থেকে হয়েছে। তার প্রধান কারণ ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যকে কৃষিভিত্তিক রেখে নিজেকে করেছে যন্ত্রশিল্পভিত্তিক। ভারত যেন একটা গ্রামসমষ্টি আর ব্রিটেন যেন একটা নগরসমষ্টি। বিরোধ অনিবার্য। ভারতেরও চাই যন্ত্রশিল্প। সে আর কাঁচা মাল রপ্তানি করবে না, নিজের কলকারখানায় ব্যবহার করবে। তার যন্ত্রশিল্পের যতই প্রসার হবে তার নগরসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে, নাগরিকসংখ্যাও ততই স্ফীত হবে। জার্মানীর বেলা সত্তর বছর, ভারতের বেলা

হয়তো পঞ্চাশ বছর। কংগ্রেস নেতারা এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো প্ল্যান আঁটছেন। যাতে আরো সময়সংক্ষেপ হয়। সত্তরের জায়গায় পঞ্চাশ নয়, বিশ কি পঁচিশ বছর। এঁদের কথামতো যদি কাজ হয় তবে দেশ হয়তো স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, কিন্তু গ্রাম কদাপি নয়। বিরোধ অনিবার্য। কেবল যে ইংরেজদেব সঙ্গে তা নয়, এই দেশেরই টাটা বিড়লাদের সঙ্গে। প্রাইভেট ক্যাপিটাল থাকতে সত্তর বছরকে বিশ বছরে পরিণত করা যায় না। আর প্রাইভেট ক্যাপিটালকে স্টেট ক্যাপিটালে পরিণত করতে গেলে সোশিয়াল ডেমক্রাসীকেও পরিণত করতে হয় কমিউনিজমে। জার্মানীতে এই রূপান্তরটাই ঘটতে ঘটতে ঘটল না। নাৎসীরা এসে এক হাতে সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের, অন্যহাতে কমিউনিস্টদের হটিয়ে দিল। আফসোসের কথা সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের জন্যে কেউ অশ্রুবর্ষণ করছে না। কমিউনিস্টদের জন্যেও না। অথচ কেউ যে নাৎসীদের পছন্দ করছে তাও নয়। আমি ব্রিটেন ফ্রান্সের দিক থেকেই বলছি।" মানস যতদূর জানে।

"ভাই মানস," সৌম্যর কণ্ঠস্বরে বিষাদ, "আমি ঘর ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছিলুম উনিশ বছর আগে একবছরের মধ্যে স্বরাজ জিতে নিতে। জয় এখনো হয়নি। ইংরেজরা জাঁকিয়ে বসে আছে। আমাদের যা দিয়েছে তা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। স্বরাজ পেতে আরো উনিশ বছর লাগবে কি না কে বলতে পারে? যে দেশ রাশিয়ার মতো স্বাধীন নয় সে দেশ লেনিনের মতো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। বিপ্লবের পরেও কমিউনিস্টদের দশবছর কেটে গেল মনঃস্থির করতে রাশিয়াকে কলকারখানা দিয়ে শিল্পায়িত করা সমীচীন হবে কি না। সেই পদক্ষেপটি নেওয়া যখন হলো তখন দেখা গেল গ্রাম ছেড়ে মানুষ চলে আসছে শহরে, চাষের জন্যে ক্ষেতমজুর বিরল। ফসল যা ফলে সরকার তা জোর করে কেড়ে নিয়ে আসেন, চাষীকে ধরিয়ে দেন কাগজের নোট। তা দিয়ে সে কম দামে পরনের কাপড় কিনতে পারে না। জুতো কিনতে পারে না। নুন কিনতে পারে না। কেরোসিন কিনতে পারে না। চাষী তাই যেটুকু তার খোরাকের জন্যে প্রয়োজন সেইটুকুই ফলায়। ফলে শহরের খোরাকে টান পড়ে। শ্রমিকরা খেতে পেলে তো গতর খাটাবে। দুর্ভিক্ষে বহু লোক মারা যায়। এটা কিন্তু মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। লেনিন হলে শিল্পায়নে ঢিলে দিতেন। এক কদম পেছিয়ে যেতেন, যাতে পরে দুই কদম এগোনো যায়। কিন্তু কর্তা এখন লেনিন নন, স্টালিন। তিনি পেছোবার পাত্র নন। ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়াই তাঁর নীতি। এক পরিকল্পনার পর আরেক পরিকল্পনা। এই হলো তাঁর রীতি। সাথীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি চাষের জমিকেই চাষীর হাত

থেকে কেড়ে নিলেন। এখন থেকে খামার হলো খাসমহলের খামার বা এজমালী খামার। চাষীদের পরিণত করা হলো মজুরে। নারাজ হলো যারা তাদের চালান করা হলো হাজার হাজার মাইল দূরে। সেখানে তারা বেগার খাটে, খাল কাটে। বাড়তি লোকজনকে সৈন্যদলে ভর্তি করে নেওয়া হয়। এমনি করে হয় বেকার সমস্যার সমাধান। অপোজিশন বলে কোনো পদার্থই নেই। যারাই অপোজ করবে তারাই কোতল হবে। হলোই বা তারা সর্বত্যাগী বিপ্লবী কমিউনিস্ট। এই যদি হয় ত্বরিত শিল্পায়নের মূল্য তবে এ মূল্য দিতে স্বাধীন ভারত কি রাজী হবে? আকাশে কেল্লা গড়ে কার কী লাভ? এত দলাদলিই বা কেন?"

"এখন থেকেই পরস্পরকে বলা হচ্ছে, আমরা রেভোলিউশনারী, তোমরা রিফরমিস্ট। অথচ কাজ দিয়ে বোঝানোর এখনো অনেক দেরি। না, ইংরেজরা স্বেচ্ছায় যাচ্ছে না। বড়লাট চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুদ্ধে যারা যোগ দিতে চায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে না, ভারতেই যে যার কর্মস্থলে থাকবে ও শাসন-কার্য চালিয়ে যাবে। সেবারকার যুদ্ধে তো বহু ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। তাদের জায়গায় ভারতীয় অফিসারদের বসানো হয়। এবার কিন্তু ওরা আরো জাঁকিয়ে বসবে।" মানসের খেদ।

"দেখলে তো? ওঁরাও তোমারি মতো নীরব দর্শক। শেফার্ড আর বার্লো। যত রাজ্যের ভাবনা যেন তোমার একার। সেই যে বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। বিপদটা তো বিলেতের। দুর্ভাবনাটা ভারতের।" যূথিকা কটাক্ষ করে।

মানস তা স্বীকার করবে কেন? বলে, "বিপদটা বিবাহসূত্রে ভারতেরও। বিবাহবিচ্ছেদ তো হয়নি, কেউ চায়ও না। চাইলে এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। চাইছেন যেটা সেটা ব্রিটেনের সঙ্গে ডিভোর্সও নয়, সেপারেশনও নয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরের ধাপ, কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। বাকীটা যুদ্ধজয়ের পর। কিন্তু যুদ্ধে যদি হার হয় তখন কী হবে? টার্কি আর ইরানের ভিতর দিয়ে জার্মানরা এসে হাজির হবে। তখন বিপদটা কার?"

"সে রকম দুর্ভাগ্য যদি হয় তবে আমরা সেই মুহূর্তেই স্বাধীনতা ঘোষণা করব ও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা।" সৌম্যর কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়।

"তখন তোমাদের অহিংসা কোথায় থাকবে?" মানস জেরা করে।

"দেশের লোক যদি হিংসা দিয়ে হিংসাকে রুখতে না পারে তবে অহিংসা দিয়ে প্রতিরোধ করবে। তার জন্যে জনগণকে তৈরি থাকতে হবে।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"অহিংসা কি অব্যর্থ?" মানস মানতে চায় না।

"রাশিয়ার জনগণ যদি একজোট হয়ে নেপোলিয়নের সৈন্যদলকে রাশিয়া থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করে থাকতে পারে তবে হিটলারের সৈন্যদলকেও ভারতের জনগণ ভারত থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারবে। জনগণের অসাধ্য কী আছে, যদি ওরা একজোট হয়? যদি একজোট হয়ে শহরকে শহর গ্রামকে গ্রাম খালি করে দিয়ে যায়, খাক করে দিয়ে যায়? জার্মানরা কার কাছে সহযোগিতা আশা করবে, সবাই যদি অসহযোগী হয়?" সৌম্যও তর্ক করে।

"কার্যক্ষেত্রে দেখবে সবাই একজোট নয়, অনেকেই সহযোগিতা করতে রাজী। না, সৌম্যদা, ভারত রাশিয়া নয়। যে ভুলটা কমিউনিস্টরা করছে সেই ভুলটা তোমরাও করছ। এ দেশটা কেবল যে পরাধীন তাই নয়, জরাজীর্ণ ও দুর্বল। তার উপর জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে শতধা বিভক্ত। বাইরে থেকে জোড়াতালি দেওয়া এক, আর ভিতব থেকে একতাবদ্ধ করা আরেক। তার লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। হঠাৎ একদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেবে এটা হলো বিশ্বাসের কথা। তুমি বিশ্বাস কর, আমি করিনে। হিসাব নিলে দেখবে বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করে না।" মানস সুনিশ্চিত।

"যারা এখন করে না তারাও ক্রমে ক্রমে করবে, যখন দেখবে যে কতক লোক বিশ্বাসের জোরে অকুতোভয়।" সৌম্যও সুনিশ্চিত।

যূথিকা বলে, "এখন থেকে এ নিয়ে তর্ক করে কার কী লাভ? ইংরেজদের হারতেও অনেক দেরি, জিততেও অনেক দেরি। ওদের হাবভাব দেখে মালুম হয় না যে ওরা একটুও বিচলিত। ওরা ভালো করেই জানে যে পেছনে মামা আছে। শুনছি নাকি চার্চিলকেই প্রধানমন্ত্রী কবা হবে। আমেরিকা তাঁর মামাব বাড়ী।"

সৌম্য তা শুনে খুশি হয়। "তা হলে জমবে ভালো। ভারতের অত বড়ো অকপট বন্ধু আর নেই। খোলাখুলি জানিয়ে দেবেন যে স্বাধীনতা তিনি থাকতে হবে না। আর যুদ্ধকালে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে ইংরেজদের মনের জোর জোগাবে? চার্চিল থাকতে আমাদের মুক্তি নেই জানলে আমাদেরও মোহভঙ্গ হবে, আমরাও সহযোগিতায় মুক্তি নেই জেনে অসহযোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাব। হিটলারের সঙ্গে নয়, চার্চিলের সঙ্গেই সংগ্রাম।"

মানস আঁতকে ওঠে। "কিন্তু এটা কি তোমরা বুঝতে পারছ না যে চার্চিল যার দুশমন হিটলার তার দোস্ত? আর হিটলার যার দোস্ত হিটলারের পরাজয়ে তারও

পরাজয়? হিটলার যদি জেতে তা হলেও ভারতের ক্ষতি। হিটলার যদি হারে তা হলেও ভারতের ক্ষতি। এই সঙ্কটে পলিসি নির্ধারণ করা একেবারেই সহজ নয়। ইংরেজরা হেরে গেলেও ওদের জাহাজগুলো ওরা কিছুতেই হিটলারের হাতে পড়তে দেবে না। কানাডা অস্ট্রেলিয়ায় চালান করে দেবে। সেগুলো হাতে পেলে জার্মানরা সমুদ্রপথে বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতায় এসে হাজির হতো। তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলত ভারতকে। কোন্ দিকে তোমরা পালাতে? কোন্ দিকটা খালি করে দিতে, খাক করে দিতে? সমুদ্রে ইংরেজের হার নেই, সে তার নৌবলের সাহায্যে আবার তার রাজ্য উদ্ধার করবে। জার্মানরা যদি টার্কি ও ইরান পেরিয়ে আসে জাহাজের অভাবে বেকায়দায় পড়বে। জার্মানদের হাত থেকে ইংরেজরাই আমাদের রক্ষক। তোমরা যা করতে চাও যুদ্ধের পরে কোরো। যুদ্ধকালে চলুক তার প্রস্তুতি। কিন্তু প্রয়োগ নয়।"

"তোমার কথাগুলো মডারেটদের মতো শোনাচ্ছে। ওঁরাও মন্ত্রণা দিচ্ছেন সেই মর্মে। কংগ্রেসে এখন নানা মুনির নানা মত। এক মুনি বলছেন, এই তো সুযোগ এ সুযোগ হাতছাড়া করলে আর কখনো ফিরবে না। যুদ্ধে জিতে ইংরেজ জগদ্দলের মতো চেপে বসবে। তখন তাকে হটাতে হলে আরো দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাতে হবে, আরো কতবার জেল যেতে হবে, আরো কত লোককে প্রাণ দিতে হবে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। আরেক মুনি বলেছেন, হিটলার যদি মরে তো মরণকামড় দিয়ে মরবে। ইংরেজের নখ দাঁত ভেঙে দিয়ে যাবে। তখন সে স্বাধীনতা দিতে সহজেই রাজী হবে। নয়তো তখন আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম। আরো এক মুনি আছেন, তিনি বলেছেন, হিন্দু মুসলমান যদি এক হয় তো স্বাধীনতা পেতে কতক্ষণ! যদি এক না হয় তো ইংরেজ চলে গেলেই গৃহযুদ্ধ। তাকে ধরে রাখাই সুবুদ্ধি। মুসলমানদের যা মনোভাব তা স্বাধীনতার প্রতিকূল। এত বড়ো একটা সম্প্রদায়কে সঙ্গে না নিয়ে সংগ্রামে নামতে যাওয়া যেন অকূলে ঝাঁপ দেওয়া। সমুদ্র থেকে অমৃত উঠে আসবে না গরল উঠে আসবে কে জানে?" সৌম্যও চিন্তিত।

"ভাবনার কথা বইকি।" মানস বলে, "আমার তো মনে হয় প্রকৃষ্ট পলিসি হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে চলা। তার জন্যে যদি সাত বছর অপেক্ষা করতে হয় তো সাত বছর অপেক্ষা করাই সমীচীন। লীগপন্থী মুসলমানরাই যে একমাত্র মুসলমান তা অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না। তা বলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরাই যে একমাত্র মুসলমান তাও নয়। মোটের উপর বলতে গেলে মুসলমানরা মনে করে ইংরেজরা বিদায় নিলে হিন্দুরাই তাদের শূন্য স্থান পূরণ করবে, মুসলমানরা যে তিমিরে সেই

তিমিরে। তাদের বক্তব্য শূন্য স্থান পূরণ করবে দুই পক্ষ মিলে, সুতরাং দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই একটা মিটমাট চাই। তা যদি সম্ভব না হয় তবে দুই পক্ষেই একটা সেপারেশন চাই। তাদের মতামত উপেক্ষা করে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে তাদেরও জড়াতে গেলে তারাও আপত্তি করবে যেমন আপত্তি করছে কংগ্রেস, ভারতীয়দের মতামত উপেক্ষা করে ব্রিটেন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে ভারতকেও জড়িয়েছে বলে।"

"এইখানে একটু সংশোধন দরকার। ব্রিটেন ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়েছে বলে কংগ্রেস আপত্তি করছে তা নয়, ভারতের জনগণকেও যুদ্ধে জড়িয়েছে বলে। ভারতীয়রা কেন রিক্রুট হবে, কেন ট্যাক্স দেবে, কেন খাদ্য পরিধেয় বিদেশে পাঠিয়ে ভাতকাপড়ের অভাবে কষ্ট পাবে? এটাই হলো হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বসাধারণের বক্তব্য।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে।

"মুসলমান বন্ধুরা বলছেন কংগ্রেস যদি ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে নামে তাঁদেরও তো জড়াবে। এই ধরো, তোমরা যদি মন্ত্রিত্ব বর্জন কর ওঁদেরও তো মন্ত্রিত্বের আশা ছাড়তে হবে। কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি যদি বন্ধ থাকে তবে ওঁরাও তো সেখানে ঢুকতে পারবেন না, লোকসান দেবেন।" মানস বলে।

সৌম্য দুঃখিত হয়ে বলে, "এর মধ্যেও হিন্দু মুসলমান! সরকার যদি কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান তো মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে যাবেনই বা কেন? আর কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি বন্ধ হবেই বা কেন? মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের দরজা তো খোলাই থাকবে, যদি না তাঁরা ডাক্তার খান্ সাহেব, রফি আহমদ কিদোয়াই, সৈয়দ মাহমুদ প্রভৃতি কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বর্জন করার জন্যে জেদ ধরেন। যদি সরকারের সঙ্গে মিটমাট না হয় তবে কংগ্রেসকে আবার বনবাসে যেতে হবেই, মন্ত্রীদেরও শ্রীঘরবাস অবধারিত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। কাউন্সিল অ্যাসেম্বলি বন্ধ হলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমান সদস্যদেরও কম লোকসান হবে না। উপরন্তু তাঁরাও জেলে যাবেন। তাঁরা আমাদের সুখদুঃখের সাথী। আর এঁরা তো কেবল কোয়ালিশনের বেলায়ই আমাদের সঙ্গে, জেলযাত্রার বেলায় নয়।"

এর পরে ওঠে গান্ধীজীর প্রসঙ্গ। "তুমি যাচ্ছ তবে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে?" মানস সুধায়।

"না গিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছিনে। উনিই আমাদের দেশের বিবেক। আমাদের যুগেরও। কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে তাঁর কাছে চিঠি আসে। জিজ্ঞাসুরা উদ্‌গ্রীব। এই সঙ্কটে তাঁর কী নীতি ও পন্থা? তাঁদের মধ্যে যাঁরা অহিংস তাঁদেরই বা করণীয়

কী? যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত, না যুদ্ধ প্রতিরোধ করা উচিত? স্বাধীন দেশের নাগরিক যাঁরা তাঁরাও চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে নারাজ। তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন যে যুদ্ধ ব্যাপারটা একেবারে মিটে যাবার নয়। পঁচিশ বছর আগেও তো বেধেছিল, বলা হয়েছিল যে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। কিন্তু একটা শেষ হতে না হতেই বিশ বছর ব্যবধানে আর একটা শুরু হয়েছে। এবারেও শোনা যাচ্ছে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। বিশ্বাস করা শক্ত। মূল কারণগুলো যদি একই রকম থাকে তবে যুদ্ধ বার বার বাধবেই। আর মূল কারণগুলো কাইজার বা হিটলার বা অন্য কোনো ডিকটেটরের অস্তিত্ব নয়, সভ্য মানুষ পড়ে গেছে ধনপতি আর রণপতিদের ফাঁদে। ধনপতিরা সৃষ্টি করেছেন অর্থনৈতিক সঙ্কট। গণপতিরা সে সঙ্কটে দিশাহারা হয়ে রণপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ করছেন। অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করলেই নাকি বাজার তেজ হবে, মন্দা দূর হবে, কেউ বেকার থাকবে না, কাজের সঙ্গে সঙ্গে খোরাকও জুটবে। কিন্তু সবাই যদি অস্ত্রবৃদ্ধি করতেই থাকে যুদ্ধ একদিন আপনা আপনি বেধে যাবে, যে-কোন একটা উপলক্ষে। তখন তারস্বরে চিৎকার উঠবে, ওরাই বাধিয়েছে, আমরা বাধাইনি। আমরা ধোয়া তুলসী পাতা। এস, ঝাঁপ দাও, না দিলে কনস্‌ক্রিপশন। সভ্য মানুষ এখন মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেকসের হাতের পুতুল। কোথায় তার স্বাধীনতা। ইংলণ্ড ফ্রান্সও স্বাধীন নয়। তাদের স্বাধীনতাও যন্ত্রচালিতের স্বাধীনতা। তেমন স্বাধীনতা নিয়ে আমরা করবই বা কী? তাদের মতো যুদ্ধ? এই তো? আমরা চাই যুদ্ধ না করার স্বাধীনতা। ভারতের মতো একটা বৃহৎ দেশ যদি বেঁকে বসে তা হলে ধনপতি ও রণপতিদের খেলা মাৎ। ইতিহাসে একটা নতুন যুগ আরম্ভ হবে। ভারত তার নেতা। গান্ধীজী তার প্রোফেট। সভ্যতারও হবে নয়া মোড়। সমাজেরও নতুন শৃঙ্খলা। আমরা নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছিনে, মানস। আমরা ওদের ওই মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেকসের থেকে সরে থাকতে চাই। ওটা একটা মারাত্মক প্লেগ। যার থেকে ওরা নিজেরাও ভুগছে, আমাদেরও ভোগাচ্ছে। এরোপ্লেন দেখে উচ্ছ্বসিত হচ্ছ। জানো, ওইসব বিমান রাতারাতি বোমারু বিমানে রূপান্তরিত হবে? মোটরগাড়ীর কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবে ট্যাঙ্ক। জাহাজের ইয়ার্ড থেকে সাবমেরিন বার টর্পেডো। কেন, তোমার রেলপথও তো মিলিটারির জন্যে তৈরি। যুদ্ধ বাধলে প্রত্যেকটাই হবে সৈন্য চলাচলের পথ। তেমনি তোমার টেলিগ্রাফের তার।" বলতে বলতে সৌম্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ওদিকে টর্পেডোর উল্লেখ থেকে যূথিকারও ভাবান্তর। সে বলে ওঠে, "বেচারি মিলি! ভালোয় ভালোয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি!"

ইতিমধ্যে মিলি এডেন থেকে কেবল করে তার বাবাকে জানিয়েছিল যে কনভয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তার জাহাজ সুয়েজ হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপটেন মুস্তাফী কেবল পেয়ে ছুটে এসেছিলেন মানস আর যুথিকাকে দেখাতে। খবরটাতে কে না খুশি হবে! তবু একটু 'কিন্তু' থেকে যায়। সেই কিন্তুর নাম 'মুসোলিনি'। তিনি এখনো যুদ্ধে নামেননি। গড়িমসি করছেন। যুদ্ধে নামলে তাঁর নিজের সাগরপারের উপনিবেশগুলির জলপথও টর্পেডোসঙ্কুল হবে। তিনি যতদিন দেরি করবেন ততদিনে মিলি ও সুকুমারও সাগর পার হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি হঠাৎ হিটলারের নির্দেশে যুদ্ধে নামেন? সুতরাং না আঁচালে বিশ্বাস নেই। যুদ্ধ জিনিসটাই সারপ্রাইজে ভরা। কারো সাধ্য নেই যে ভবিষ্যদ্বাণী করে বা করলে তা ফলে।

"ওরা পৌঁছে যাবে ঠিক।" মানস আশ্বাস দেয়। "কনভয় আছে কী করতে? বিজ্ঞান যেমন মারণাস্ত্র বানিয়েছে তেমনি তার মুশকিল আহ্‌সানও বাতলে দিয়েছে। বোমারু বিমানও যেমন হানা দেয় বিমানবিধ্বংসী কামানও তেমনি আসমান থেকে ওদের পেড়ে আনে। মজা করে দেখবে ওসব দত্তবিশ্বাস, কিন্তু দেখবে কী করে, যদি গর্ত খুঁড়ে আশ্রয় নেয়?"

'মজা!' যুথিকা শিউরে ওঠে, "তোমার কাছে মজা! আর ওদের কাছে জীবন মরণ সমস্যা।"

সৌম্য এইবার বিদায়ের উদ্যোগ করে। বলে সেগাও থেকে ফিরে আবার দেখা করবে। ইতিমধ্যে মিলিদের নিরাপদে পৌঁছনোর খবর এসে থাকবে। যাবার আগে সে একবার মুস্তাফীদের ওখানে ওর খোঁজ খবর নেবে।

"দাদা," যুথিকা পই পই করে বলে, "কলকাতায় জুলির সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না। ওকে যেমন করে হোক বিপ্লবের পথ থেকে নিবৃত্ত করা চাই।"

"উল্টো ফল হবে, বোন। জুলি এমন মেয়ে যাকে বাধা দিলে অবাধ হয়, বোঝাতে গেলে অবুঝ হয়, নিবৃত্ত করলে প্রবৃত্ত হয়। সাঁকো নাড়িসনে বললে সাঁকো নাড়ে। আমার চেয়ে ওর বিপ্লবী দাদাদের উপরে ওর আরো বেশী বিশ্বাস। ওঁরা মনে করেন বিপ্লবের দিন ঘনিয়ে আসছে, গণ অভ্যুত্থান আসন্ন, জুলিও তাই মনে করে। বেশ তো, ওঁদের কথাই সত্য হোক। আমাদের দিন আসবে, যখন সরকারের সঙ্গে কথাবার্তার পালা সাঙ্গ হবে। যখন কংগ্রেস এক হয়ে মহাত্মার পেছনে দাঁড়াবে। যখন মহাত্মা অহিংসার পরীক্ষা নেবেন, পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হবেন, তার পরে সংগ্রামের সঙ্কেত দেবেন। জুলিকে এসব বোঝানো যাবে না, বোন। তা হলেও আমি যাব ওকে দেখতে, ওর মাকেও দেখতে! ওঁরা আমার আপন জন।" সৌম্য আবেগের সঙ্গে বলে।

"হ্যাঁ, তোমার মতো আপন জন আর কে আছে ওঁদের! তুমিই শেষ ভরসা। কিন্তু তোমার তো দুশ্চর তপস্যা। সিদ্ধিলাভ না হলে তপোভঙ্গ করবে না। রম্ভা মেনকাও পরাস্ত হয়। জুলি তো তেমন সুন্দরী নয়। রূপে তোমায় ভোলাবে না। পারে তো একদিন ভালোবাসায় ভোলাবে। ভালোবাসা ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা। কিন্তু ওর বৈধব্যের সংস্কার আরো প্রবল।" যূথিকার প্রত্যয়।

"আমার মনে হয় ওটা বৈধব্যের সংস্কার নয়, পাতিব্রত্যের সংস্কার। পতির মৃত্যু হলেও নারী পতিব্রতা থাকে। তা ছাড়া জুলি ওর স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। সে ভালোবাসা তো স্বামীর অবর্তমানে পাত্রান্তরিত হতে পারে না। আমি ওর সমস্যাটা বুঝি বলেই নীরব থাকি।" সৌম্য বলে আবেগভরে।

"আচ্ছা, সৌম্যদা, এটা কী করে সম্ভব! দুলাল আর জুলি প্রেমে পড়ে বিয়ে করেনি, করেছে পিতামাতার নির্বন্ধে। বিয়ের পরে স্বামীস্ত্রী সম্পর্কও পাতায়নি। তার আগেই দুলাল বিলেত চলে যায়। জুলি যখন ওদেশে যায় তখন মায়ের সঙ্গেই থাকে। স্বামীর সঙ্গে নয়। তা হলে ভালোবাসা জন্মায়ই বা কী করে, বৈধব্যের দশ বছর বাদেও বেঁচে থাকেই কিসের জোরে? আমার তো মনে হয় ওটা নিছক হিন্দু সংস্কার, ব্রাহ্ম মেয়েরাও তার থেকে মুক্ত নয়।" মানস রায় দেয়।

"এমন না হলে ইনটেলেকচুয়াল!" সৌম্য পরিহাস করে। "নারীর হৃদয় কি পুরুষেয় মস্তিষ্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়? যূথিকা তোমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে। মেয়েদের ভালবাসা দেহধর্মের অপেক্ষা রাখে না। তা যদি বলো, পুরুষের ভালোবাসাও কি দেহধর্মের অপেক্ষা রাখে? প্লেটোনিক প্রেম একটা কথার কথা নয়, এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে! এটা বিয়ের পর স্বামীস্ত্রীতেও হতে পারে। গান্ধীজীও বিশ্বাস করেন যে বিবাহের পর এটাই আদর্শ। তিনি তো তাঁর শিষ্যদের বিয়ে করতে বারণ করেন না, যদি সে বিবাহ প্লেটোনিক হয়। আমরা অবশ্য তেমন কোনো অঙ্গীকার করতে পারিনে। একতরফা অঙ্গীকারের মূল্য কতটুকু। দুই তরফের অঙ্গীকারও ক্ষণভঙ্গুর।"

তিনজনেই হাসে। দীপক আর মণিকা একটু দূরেই খেলা করছিল। তারা জানতে পায় না কারণটা কী। কেন এত হাসি। সৌম্যকে উঠতে দেখে ওরা দু'জনেই ছুটে আসে।

মণি জেঠুর কোলে লাফিয়ে ওঠে। দীপক গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে, "জ্যাঠামশাই, তুমি এবার আমার জন্যে কী আনবে?"

"তুমিই বলো কী আনলে তুমি খুশি হবে?" সৌম্য তাকে জড়িয়ে ধরে।

"আমি ভাবছি একটা সার্কাসের দল করব। তাতে থাকবে হাতী ঘোড়া বাঘ

বানর ডালকুত্তা টিয়াপাখী পায়রা এমনি সব জীবজন্তু। সত্যিকার নয় কিন্তু। কাচের বা চীনেমাটির। তোমার জন্যে আমি একটা নক্‌শা তৈরি করছি। তাতে দেখাব বাঘের সঙ্গে হাতীর লড়াই। আচ্ছা, জ্যাঠামশায়, বাঘের সঙ্গে যদি হাতীর লড়াই হয় কে জেতে আর কে হারে ?" দীপকের প্রশ্ন।

"বাঘই জিতবে। বাঘ হলো রয়াল বেঙ্গল টাইগার।" সৌম্যর উত্তর।

"কিন্তু যদি ঈগলপাখীর সঙ্গে বাঘের লড়াই হয় তা হলে কে জিতবে কে হারবে ?" দীপক আবার প্রশ্ন করে।

"সেইটেই তো বাধতে যাচ্ছে, বাবা। জার্মান ঈগলের সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের লড়াই। সিংহ বলছে, ভাই হাতী, এস, তুমিও আমার হয়ে লড়ো। হাতী বলছে, তুমি যে আমাকে হারিয়ে দিয়ে দাবিয়ে রেখেছ, আগে আমার পিঠ থেকে নামো দেখিনি। সিংহ এখন কী করবে ? হাতীর পিঠ থেকে নামবে ? না হাতীর পিঠে চেপেই ঈগলের সঙ্গে লড়বে ?" সৌম্য বলে ধাঁধার মতো করে।

দীপক ভাবনায় পড়ে। চট করে উত্তর দিতে পারে না। তার মা তাকে উৎসাহ দেয় নিজের বুদ্ধি খাটাতে। আর তার বাবা উৎকর্ণ হয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

"হাতীর সঙ্গে বাঘের যদি বন্ধুতা না হয়, শত্রুতা চলতে থাকে তা হলে ঈগল এসে ছোঁ মেরে দুটোকেই ধরে নিয়ে যাবে, গরুড় যেমন করেছিল গজ আর কচ্ছপকে। তার পর এক পর্বতের চূড়ায় বসে একটার পর একটাকে খাবে।" দীপক উত্তর দেয়।

মানস বলে ওঠে, "সাবাস !" সৌম্য একেবারে চুপ। যূথিকা মনে মনে গর্বিত হয় ওইটুকু ছেলের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখে।

মণিকে ঘাড় থেকে নামিয়ে চুমু খেয়ে সৌম্য দীপককে ছাড়া দিয়ে বলে, "হাতীর ইচ্ছা নয় লড়তে, সে চায় লড়াই থামিয়ে দিয়ে স্বাধীন হতে।"

॥ বারো ॥

টেনিস র‍্যাকেট হাতে মানস বেরিয়ে পড়ে ক্লাবের অভিমুখে। সৌম্যকে বলে, "তোমাকে আমি এগিয়ে দিই। আমাকে তুমি এগিয়ে দাও।"

"লণ্ডনে থাকতে যেমন আমরা প্রায়ই করতুম। আচ্ছা, মানস, তোমার কি মনে আছে ত্ব'জনেই আমরা লীগ অভ নেশনস ইউনিয়নের সভ্য হয়েছিলুম? একবার কি ত্ব'বার গিয়ে তুমি ছেড়ে দাও। আমি নিয়মিত ওদের সভায় যেতুম। কোয়েকারদের সঙ্গেও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সম্পর্ক এখনো ছিন্ন হয়নি। ওঁরা কেউ চাননি যে আবার মহাযুদ্ধ বাধে। মাহুষের পক্ষে যা সম্ভব ওঁরা তা করে এসেছেন। ওই ধরনের শান্তিবাদী জার্মানীতেও ছিলেন ও আছেন। অসিয়েৎস্কি তো বিদেশ থেকে প্রচারকার্য চালানোর চেয়ে দেশে ফিরে এসে কারাবাসের ঝুঁকি নিলেন। বললেন বাইরে থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ফাঁপা শোনাবে। যা ফাঁপা শোনায় তাতে কেউ কান দেয় না। কারাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। বেঁচে থাকলে তো তিনিও হতেন যুদ্ধকালে যুদ্ধবিরোধী কারাবাসী। সময় যখন আসবে তখন তুমি দেখবে আমিও নীরব দর্শক নই। আমাকেও কারাবাস করতে হবে। সেটা যদি দীর্ঘমেয়াদী হয় আমিও তো অসিয়েৎস্কির মতো চরম মূল্য দিয়ে কারামুক্ত হতে পারি। যমরাজ তাঁর দূত পাঠিয়ে আমাকে ব্রিটিশ রাজের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন।" সৌম্য ভাবে উচ্চস্বরে।

মানস ত্বঃখ পেয়ে বলে, "না, না, জেলখানায় তোমার উপর কেউ অত্যাচার করবে না। তবে তুমি যদি গান্ধীজীর মতো অনশন কর সেকথা আলাদা। তিনি তো তোমাদের সবাইকে বারণ করে দিয়েছেন অনশন করতে। একমাত্র তিনিই করতে হয় করবেন। তোমাকে জেলে যেতে হবেই বা কেন? কংগ্রেস যদি

কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেয় তবে তো কারো জেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে থাকতে কেই বা তোমাদের বন্দী করবে? কেনই বা করবে?"

"সেটা তুমি ইংরেজ ও কংগ্রেস এই দুই শিবিরের উপর ছেড়ে দাও। আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। গান্ধীজী কংগ্রেসের উপর কোনরকম চাপ দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন, আমাকে আমার পথে একলা চলতে দাও। তিনি একজন বিবেকচালিত সত্যাগ্রহী। তাঁর বিবেকের নির্দেশ পেলে তিনি সত্যাগ্রহ করতে পারেন। ভুলে যেয়ো না যে তিনি কেবল স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের নেতা নন। সারা বিশ্বের শান্তিবাদীরাও তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। তারা প্রত্যাশা করেন তাঁর কাছ থেকে বিবেকচালিত আপত্তিকারীর চেয়ে কিছু বেশী। তিনি যার নাম দিয়েছেন সত্যাগ্রহ। যার প্রথম পদক্ষেপ অহিংস অসহযোগ। তিনি কি তাদের সেইভাবে মনের জোর জোগাবেন না? সঙ্কটকালে তিনি কি তাঁদের হতাশ করবেন? তাঁর মতো শান্তিসংগ্রামের নেতা তাঁরা পাবেন কোথায়? স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতার অভাব হবে না, সব দেশেই তেমন নেতা আছেন। কিন্তু শান্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে পারেন একমাত্র গান্ধীজী। সেক্ষেত্রে তিনিই এক ও অদ্বিতীয়। কংগ্রেস যদি-বা তাঁকে ছাড়ে আমি কিন্তু তাঁকে ছাড়ব না। আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তির সংগ্রামই স্বাধীনতার সংগ্রাম, যুদ্ধকালে। শান্তির বিনিময়ে যে স্বাধীনতা সেটা সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস যুদ্ধকালে সরকার চালিয়ে সেটা ঠেকে শিখবে। তোমারও চোখ ফুটবে। হিটলারকে হিটলার না হয়ে কেউ হারাতে পারবে না। নাৎসীদের নাৎসী না হয়ে কেউ সায়েস্তা করতে পারে না। ইংরেজ ফরাসীও সমান হিংস্র হয়ে উঠবে, তাদের সঙ্গে জুটে কংগ্রেসীরাও। ইংরেজের সঙ্গে আবার যদি বিরোধ বাধে তখন আর সত্যাগ্রহের পথ খোলা থাকবে না। ডাক দিলে জনগণ সাড়া দেবে না।" সৌম্য জানিয়ে রাখে।

"আচ্ছা, সৌম্যদা," মানস প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "মিস ম্যানিংকে তোমার মনে আছে? যাঁর বান্ধবী মুরিয়েল লেস্টারের ভাই কিংসলীর নামে কিংসলী হল। যেখানে গান্ধীজী উঠেছিলেন। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময়।"

"মনে আছে বইকি! কোয়েকারদের সভায় তো প্রায়ই ওঁর সঙ্গে দেখা হতো। কালেভদ্রে এক আধখানা চিঠিও তো পাই। হাতে বোনা কাপড়ের পোশাক পরতেন, হাতে গড়া চামড়ার জুতো পায়ে দিতেন, হাতে তৈরি ব্রাউন ব্রেড খেতেন। ভারতের বন্ধু ও গান্ধীজীর ভক্ত। লীগ অভ নেশনস ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী। আর কী শুনতে চাও?"

"বলতে পারতে জার্মানীরও বন্ধু ও জার্মান সঙ্গীতের ভক্ত। সেই তিনি আমাকে সেদিন লিখেছেন তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় হিটলারই বাইবেল বর্ণিত অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। অতএব ধরো অস্ত্র করো যুদ্ধ। তাঁর মতো শান্তিবাদীও এ যুদ্ধের সমর্থক। বাইবেল কী লিখেছে বলতে পারো?" মানস জিজ্ঞাসু হয়।

"লিখেছে পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে। তার আগে কে জানে কোন্‌খানে থেকে আসবে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। খ্রীস্টের প্রতিপক্ষ ও প্রবল শত্রু। কিন্তু বিয়াট্রিস এ তত্ত্ব বিশ্বাস করবেন এটা আমার কাছে সংবাদ। এ যেন সেই, 'হে অর্জুন, যুদ্ধ করো।' হিন্দুর মুখে মানায়, কিন্তু খ্রীস্টানের মুখে নীতিবিরুদ্ধ। যীশু যে অনুজ্ঞা দিয়ে গেছেন, "শত্রুকেও ভালোবাসবে।', যুদ্ধকালে ভালোবাসতে পারাটাই অনুজ্ঞার অগ্নিপরীক্ষা। জার্মানদের বিয়াট্রিস ভালোবাসেন, একথা আমারও জানা। কিন্তু হিটলারের হিংস্রতার জন্যে কি তাঁকে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট বলে তার জাতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করতে হবে? স্টালিনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি না করে যুদ্ধে নামলে কি তাঁকে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট না বলে প্রো-ক্রাইস্ট বলা হতো? খ্রীস্টকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন? আমি ভাবছি যুদ্ধকালীন প্রোপাগাণ্ডা কত নিচে নামতে পারে। সত্য যেমন অহিংসার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত অসত্য তেমনি হিংসার! যুদ্ধের উত্তেজনায় মানুষ মিথ্যা প্রচার করে, মিথ্যায় বিশ্বাস করে, মিথ্যাকে বেদীতে বসিয়ে পূজো করে। মহাত্মাকে বলা হবে অ্যান্টি-ক্রাইস্ট, যদি তিনি যুদ্ধকালে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যদিও সেটা পুরোপুরি অহিংস।" সৌম্যর সন্দেহ।

এর পরে ওরা ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মানস বলে, "চল না কয়েক-জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দেখবে আমার বন্ধুরা কেউ অ্যান্টি-গান্ধী নন। তবে আইন অমান্য তাঁরা সমর্থন করেন না। একবার যদি লোকের মাথায় ঢোকে যে আইন অমান্য করলে বাহবা মেলে তা হলে স্বরাজের পরে সে পোকা মাথা থেকে বেরোবে না। প্রশাসন অচল হয়ে যাবে। কেরানীরা অফিসারদের মানবে না, সিপাইরা পুলিশ কর্তাদের মানবে না, জওয়ানরা সেনাপতিদের মানবে না। দেশ অরাজক হবে। তা বলে তোমাদের কেউ নিষ্ক্রিয় হতে বলছেন না। গদী ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারো। আসন ছেড়ে দিয়ে আবার সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারো। জেলে না গেলে কি নয়? তবে আর একটা পোকাও মাথায় ঢুকছে। জেলফেরৎ না হলে মন্ত্রী হওয়া যায় না, নির্বাচনে জেতা যায় না। গ্রেপ্তার না হয়ে তোমাদের গতি নেই। এর জন্যে একদিন পশতাতে হবে। ক'জনই বা মন্ত্রীপদ পাবেন আর ক'জনই বা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস টিকিট? জেলফেরৎদের মধ্যেও অসন্তোষ ঘনাবে।"

সৌম্য অন্যমনস্ক থাকে। অর্ধেক কথা ওর এক কান দিয়ে ঢোকে, আর-এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। "হ্যাঁ। কী বলছিলে? অ্যান্টি-গান্ধী? শোন, মানস, তুমি পরিহাস ছলে যে কথাটা বললে, সেটা একদিন সত্যি সত্যি ফলে না যায়। আমার অনেকদিন থেকে সন্দেহ যে, ইংরেজরা নয়, মুসলমানরা নয়, কমিউনিস্টরা নয়, তাঁর স্বধর্মীরাই তাঁকে একদিন সরাবে। সরাবে হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রত্যক্ষ করে। সেইভাবেই তারা প্রমাণ করতে চাইবে যে অহিংসার চেয়ে হিংসা বলবান। কিন্তু ফল হবে ঠিক উল্টো। গান্ধীর জন্যে সারা দুনিয়া কাঁদবে। ভারতকে তো অনন্তকাল অশৌচ পালন করতে হবে। আমাদের হেঁট মাথা যাঁর জন্যে উঁচু হয়েছিল তাঁর প্রতিপক্ষ অ্যান্টি-গান্ধীর জন্যেই আবার হেঁট হবে। বছর কয়েক আগে আমার এক মামাতো ভাই জাপান থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসে। গান্ধীজীর অসুখের খবর পড়ে অচেনা অজানা জাপানীরা এসে তার কাছে খোঁজ নিত গান্ধী কেমন আছেন। গান্ধীর জন্যে ওদের এত মাথাব্যথা কেন জানতে চাইলে বলত, গান্ধী যে গরিবের মা বাপ। পরে জিজ্ঞাসা করত, আচ্ছা, কে বড়ো? গান্ধী না মিকাডো? আমার ভাই পাল্টা প্রশ্ন করত, গান্ধী কেমন করে মিকাডোর চেয়ে বড়ো হবেন? মিকাডো যে মহাশক্তিমান সম্রাট, সূর্যদেবীর বংশধর। মিকাডোই বড়ো। ওরা মাথা নাড়ত। না, না, গান্ধীই বড়ো। উনিই এ যুগের বুদ্ধ। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা। বুদ্ধ সর্বত্র পূজ্যতে।"

ভাবাবেগের আতিশয্য অমন একজন সংযত পুরুষের মধ্যেও থাকতে পারে মানস এতে বিস্মিত। সৌম্য আপনাকে সামলে নিয়ে বলে, "না, ভাই, আমার কাজ আছে। তোমার ক্লাবে আজ আসতে পারছিনে বটে, কিন্তু সময় যখন হইবে তখন আসিব, বাসবদত্তা। হবেই একদিন, যেদিন ওখানে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়বে, আর মদ বন্ধ হবে। প্রতি বিশ বছর অন্তর অন্তর একবার করে যদি মহাযুদ্ধ বাধে আর চার পাঁচ বছর ধরে চলে তা হলে তো মানব জাতটাই নির্বংশ হয়ে যাবে। এখন আর শুধু নিঃক্ষত্রিয় নয়, এখন সবাই মারণাস্ত্রের নির্মাণে নিযুক্ত, সবাই মারণাস্ত্রের লক্ষ্য। এখন নির্ব্রাহ্মণ, নির্বৈশ্য, নিঃশূদ্র। এসব কথা যখন মনে আসে তখন বুঝতে পারি যে মিলিটারিজম থাকতে শান্তি নেই, আর শান্তি না থাকলে কিছুই গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠলেও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ইংলণ্ডের মিলিটারিস্টরাও অ্যান্টি-ক্রাইস্ট। কিন্তু দোহাই তোমার, বিয়াট্রিসকে একথা লিখো না, লিখলে আমার উল্লেখ কোরো না। উনি ঠাওরাবেন আমরাও নাৎসী বনে গেছি। জার্মানদের পক্ষ নিয়েছি। ভুল, ভুল, তেমন ধারণা সত্যের বিপরীত। ওঁরা যদি বিশ্বাস না করেন তবে বাপুকে আবার অনশন করতে হবে।"

সৌম্য জোর কদমে পা চালিয়ে দেয়। মানস ক্লাবের লনে গিয়ে টেনিসের জন্যে অপেক্ষমানদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। একদলের পালা সাঙ্গ হলে আর একদলের পালা আসবে। দুটি কোর্টে আটজন খেলোয়াড়। একজন মাত্র মহিলা। হাফ-প্যান্ট পরা বাঙালী মেমসাহেব। কিছুক্ষণ পরে মানসের পালা আসে।

খেলার সময় খেলা। তার পরে মেলা। ক্লাব বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যে যার পছন্দমতো পানীয় অর্ডার দেয়। কেউ-বা নিজের খরচে কেউ-বা পরের খরচে। দু'একজন তার আগেই বাড়ী চলে যায়, দু'একজন বিলিয়ার্ড খেলতে আসে। রকমারি খোশগল্পের মধ্যে যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কথাও ওঠে। কংগ্রেস কী করবে এটাও একটা জল্পনার বিষয়! সরকারী কাজকর্মের প্রসঙ্গ ওঠে। আর ওঠে বদলীরও প্রসঙ্গ, প্রমোশনেরও প্রসঙ্গ। ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, একজন বাদে। ছেলেটি খাঁটি মুসলমান। যদিও গান্ধীভক্ত।

স্টেশনে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে আটজনই ভারতীয়, তাঁদের মধ্যে চারজন হিন্দু আর চারজন মুসলমান। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির প্রশাসনিক গঠন মোটামুটি এইরকম। ইংরেজরা ইতিমধ্যেই কলকাতায় বা দিল্লীতে জড়ো হয়েছেন। হিন্দুদেরও গতি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে। মুসলমানদের মধ্যে তিনজনই পশ্চিমা মুসলমান। তাঁদের প্রবণতাও পশ্চিমমুখী, অথচ তাদের জোর করে পদ্মাপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কারণ অফিসার মহলে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা কম। উচ্চতর পর্যায়ে তো নিশ্চয়ই, নিম্নতর পর্যায়েও।

"ফ্রেণ্ডস, রোমানস অ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন" এই বলে হঠাৎ ভাষণ দিতে শুরু করেন, ক্লাবের সেক্রেটারি খোন্দকার জাফর হোসেন, "লেণ্ড মী ইয়োর ইয়ার্স।"

"ভুল করলেন, খোন্দকার" বাধা দেন হায়দার, "রোমানরা আজ কেউ উপস্থিত নেই। শেফার্ড এখন যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আর বার্লো তো প্রায়ই ফাঁসীর হুকুম দিয়ে দূরবীণ নিয়ে বসেন আসমানের তারা গুনতে।" বলেন তিনি ইংরেজীতে।

"অল রাইট। ফ্রেণ্ডস, আই. সি. এস. মেন অ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন", হায়দার, মল্লিক প্রভৃতির উপরে কটাক্ষ করেন পুলিশম্যান, "টু বী আর নট টু বী দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। না, না, বাধা দেবেন না, মল্লিক, আমি জানি এটা 'জুলিয়াস সীজার' থেকে নেওয়া নয়, 'হ্যামলেট' থেকে নেওয়া, আমরা বিলেত যাইনি বটে, কিন্তু কলেজে তো পড়েছি।" এসব কথাও ইংরেজীতে। নইলে পশ্চিমারা বুঝবেন না।

"গো অন, গো অন" উস্কে দেন বক্সী, "হীয়ার, হীয়ার।"

জাফর হোসেন যা বলেন তার মর্ম। "এই ক্লাব আর বেশীদিন চলবে বলে মনে হয় না। লোকে বলে, আদাব ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কী? আদা তো বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় না। জাহাজ না এলে আদার দামও বাড়ে না। কিন্তু যুদ্ধের দরুন জাহাজ চলাচল অনিয়মিত হলে হুইস্কির দাম হু হু করে বেড়ে যায়, ব্রাণ্ডিব দাম হু হু করে বেড়ে যায়, বীয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। সেই কারণে ক্লাবের খরচও হু হু কবে বেড়ে যায়। এখানে সাচ্চা মুসলমান যাঁরা আছেন তাঁরা সরাব স্পর্শ না করলেও তাঁদের বিল আকাশ স্পর্শ করবে, যদি তাঁরা তাঁদের দোস্তদের ড্রিঙ্কস অফার করেন। আমি নিজে একজন পাক্কা মুসলমান, তবু আমাকেও আমার উপরওয়াদের ড্রিঙ্কস অফার করতে হয়। তাঁরা কিছু মনে করতে পারেন বলে গেলাসে গেলাস ঠোকাঠুকি করতে হয়। তারপর অলক্ষ্যে সরিয়ে রাখি। হলফ করে বলতে পাবব না যে মুখেও একফোঁটা লাগে না। শ্যাম্পেন যদি কেউ অফার করেন, যেমন লাটসাহেবের টেবিলে, আমি এমন কিছু মোল্লা মৌলভী নই যে, নরকের ভয়ে পেছিয়ে যাব। চরম অভদ্রতা হবে তা যদি আমি করি। রিপোর্ট যাবে যে লোকটা চৌকষ হলে কী হয় সামান্য কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। সাহেব মেমসাহেবদের প্রকাশ্যে অপমান করে। না, বন্ধুগণ, আমার অতো বড়ো বুকের পাটা নেই। চাকরিতে কর্মদক্ষতাই কি সব? শুধু কর্মদক্ষ বলেই কি কারো প্রমোশন হয়? রোমে না যাই রোমানদের সঙ্গে তো কাজ করেছি। রোমানদের সঙ্গে বোমানদের মতোই আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই তো জেলা পুলিশের ভার পেতে পেরেছি। কিন্তু যুদ্ধ যদি চার পাঁচ বছর গড়ায়, জাহাজ যদি নিয়মিত চলাচল না করে, সব ক'টা মদের ব্যাপারীকে জেলে পুরলেও আমি মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে অক্ষম। অভাবে স্বভাব নষ্ট। ওদের মধ্যে যারা সাধু তারাও অসাধু হবে। আর আমাদের মধ্যে যারা নেশাখোর তারাও অসাধু হবে। সেটা তো ভালো নয়। বিল মেটাতে না পারলে ক্লাব ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু বেশীর ভাগ মেম্বর ক্লাব ছেড়ে দিলে বা বিল চুকিয়ে দিতে গড়িমসি করলে ক্লাব থেকে মদের পাট উঠিয়ে দিতেই হয়। তা হলে এটা আর ইউরোপীয়ান ক্লাব থাকবে না, হয়ে উঠবে ইণ্ডিয়ান ক্লাব। তা যদি হয় তবে ইউরোপীয়ানরা আর এ মুখো হবেন না, তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ইণ্ডিয়ানদের হবে না, হাফিজকে দেখা যাবে চরকা কাটতে আর নামাজ পড়তে। আর মল্লিক তো এখন থেকেই শাকাহারী, ডিনার পার্টি কি তা হলে আমিষবর্জিত হবে? যে যার ওয়াইফকে নিয়ে আসার রেওয়াজ এমনিতেই বিরল, কারণ ইউরোপীয়ানরা বিরল, হিন্দুরা তবু তাদের শূন্যতা কতকটা পূরণ করেছেন, কিন্তু

মুসলমানদের বেলা কড়া পর্দা। মহিলারা বড়ো একটা আসেন না, এলেও পান করেন না।"

মানসের বরাত ভালো। মিসেস মল্লিকের না আসার জন্যে কেউ কৈফিয়ৎ চান না। সকলেরই জানা আছে তিনি এখনো শোকাহত।

হোসেন বলে যান, "আমাদের এখন হ্যামলেটের মতো দোটানা। ক্লাব থেকে ড্রিঙ্কস তুলে দেওয়া ইংরেজ আমলে হবে না। হবে কংগ্রেস আমলে বা লীগ আমলে। বড়ো বড়ো পদগুলো হিন্দু মুসলমানদের দেওয়া হলেও মাঝে মাঝে ইউরোপীয়ান জজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবেনই। তাঁদের সৃষ্টি যে ক্লাব তাকে বিলুপ্ত করবে কে? ক্লাব থাকছে, কিন্তু আয় যথেষ্ট না হলে টেনিস, বিলিয়ার্ড্স, ডিনার ইত্যাদি একে একে বন্ধ হচ্ছে। স্টাফ ছাঁটাই করতে হবে। সেক্রেটারি যদি বলেন যে সেই অপ্রিয় কাজটি তাঁকে দিয়ে হবে না তবে তাকে অব্যাহতি দিলে কেমন হয়? আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি ক্লাব কোনো মতে বেঁচে থাকবে, কিন্তু মেম্বর হতে বিশেষ কারো আগ্রহ থাকবে না, কারণ চাঁদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমেনিটি কোথায়? আপনারা কি বর্ধিত হারে চাঁদা দিতে প্রস্তুত? না আপনারা ব্যবসাদার শ্রেণীর লোকদের অবাধে প্রবেশ করতে দেবেন? তারা টাকা ঢালবে আর ফেভার চাইবে। সেটা আমি থাকতে নয়। ফেভার আমি কখনো কাউকে দেখাইনে। আমি জানি আপনারা এ বিষয়ে একবাক্যে একশব্দে 'না' বলবেন।"

"না।" "না।" "না।" "না।" না।" "না।"

হোসেন তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। এটা হলো অফিসারদের ক্লাব। তাও উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের। জমিদার শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সৌজন্য এর পুরাতন ঐতিহ্য। তাও বিশিষ্ট জমিদার না হলে নয়। যাঁরা রাজা কিংবা নবাব। তাঁরা বড়লোক বলে নয়, তাঁরা অভিজাত বলে। তবে হ্যাঁ, ইউরোপীয় প্ল্যান্টারদের বেলা অন্য নীতি। তাঁরা রাজা রাজড়া না হলেও রাজার জাত তো বটে। বিলেতফের্তা বলে ব্যারিস্টারদেরও প্রবেশ আছে, কিন্তু বিলেতফের্তা না হলে উকিলদের নয়। ডাক্তারদেরও নয়, অধ্যাপকদেরও নয়। আগে ছিল এটা ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, এখন শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগত প্রাধান্য নেই, কিন্তু প্রভাব অসামান্য। প্রেসিডেণ্ট হন সাধারণত কলেকটর অথবা জজ। তাঁদের একজন অন্তত ইউরোপীয়। সেক্রেটারি হন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট অথবা সিভিল সার্জন। আজকাল দু'জনেই ভারতীয়। একদা সিভিল সার্জন ছিলেন বলে মুস্তাফীকেও মেম্বর করা হয়েছে। তিনি বিলেতফের্তা না হলেও যুদ্ধফের্তা। সেই সুবাদে একজন যুদ্ধফের্তা মুসলিম ডেপুটিকেও

নেওয়া হয়েছে। যাতে মুসলমানদের অনুপাত বাড়ে। তিনি বাঙালী হলেও তাঁর বেগম লখ্‌নৌয়ের তালুকদার ঘরানা। ইসাবেলা থোবার্ন কলেজে পড়েছেন। ক্লাবে আসেন, নাচেরও পার্টনার হন। কিন্তু কদাচিৎ। স্বামীর সঙ্গে কেউ নাচতে চান না বলে তাঁর মলিন মুখ দেখে বেগমও লজ্জিত।

ক্যাপটেন লাহা জানতেন যে প্রথা অনুসারে সিভিল সার্জনকেই এ দায় নিতে হবে, যদি পুলিশম্যান সত্যি সত্যি সেক্রেটারি থাকতে নারাজ হন। তিনি বলেন, "খোন্দকার সাহেব, আপনি ধরে নিয়েছেন যে ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যেখানে আঙুর ফলে, যার থেকে ব্রাণ্ডি হয়। আর জার্মানীই একমাত্র দেশ যেখানে বার্লি আর হপ থেকে বীয়ার বানায়। আর স্কটল্যাণ্ডই একমাত্র দেশ যেখানে মণ্ট ইত্যাদি থেকে হুইস্কি চোলাই করে। এই বিশাল ভারতে এর প্রত্যেকটির উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থ তার অন্তরায়। তাই সাত সমুদ্র পার থেকে আমদানী করতে হয়। আমদানী বন্ধ হলে গোরা অফিসারদের অসুবিধা আরো প্রবল হবে। মূলধন খাটাতে তো মাড়োয়ারীরাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে, অবশ্য গোরা কোম্পানীর বেনামীতে। ওদের ভয় কেবল এই যে কংগ্রেসের প্রোহিবিশন নীতি হবে আরো বড়ো অন্তরায়। আর মুসলিম লীগ প্রভৃতি মুসলমানদের দলগুলিও এই একটি বিষয়ে একমত। কে এত টাকা এসব ব্যবসায় খাটাতে সাহস পাবে?"

"ক্যাপটেন ল," জাফর হোসেন বলেন, "আপনি তো যুদ্ধক্ষেত্র দেখে এসেছেন পানী ছাড়া মীন যেমন বাঁচে না পানীয় ছাড়া মিলিটারি তেমনি বাঁচে না। তেষ্টায় ওদের বুক ফেটে যাবে, লড়বে কী করে? এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান ভেদ নেই। সরবরাহ বজায় রাখার জন্যে গভর্নমেণ্টকে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেই হবে। মাড়োয়ারীদের চেয়ে পার্শীরাই এগিয়ে আসবে, কারণ এটা ওদের নিত্য নৈমিত্তিক পানীয়। ওদের বিয়ের ভোজেও পানীর গেলাসের সঙ্গে পানীয়ের গেলাস থাকে। তাতে পানীয় ঢেলে দিয়ে যায় উপবীতধারী পার্শী ব্রাহ্মণ, পদবী পাণ্ডে। ওরাই সত্যিকার আর্য বংশধর। আর্য যুগের সোমরস ওরাই সংরক্ষণ করে এসেছে। শুধু কি সোমরস? বৎসতরী ভক্ষণও। বৌদ্ধ জৈনদের প্রভাবে পড়ে সেটাও আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন। বরং আরো কঠোরভাবে বন্ধ করেছেন। নৈতিক জয় হয়েছে বৌদ্ধ জৈনদেরই। আপনারা নৈতিক অর্থে পরাজিত। এখন পার্শীদের কথা হচ্ছিল, ওরা সোমরস বর্জন করবে না বলে স্বদেশ থেকেই চিরবিদায় নিয়েছে। ওদের উপর প্রোহিবিশন জারি করলে ওরা এদেশ থেকেও চিরবিদায় নিয়ে আর্যদের সংস্কার সংরক্ষণ করতে ইউরোপে আমেরিকায় গিয়ে

বসবাস করবে। অথচ ভেবে দেখুন ইণ্ডাস্ট্রি এদেশে যে ক'টি গড়ে উঠেছে সে ক'টি ওদেরই উদ্যোগে। মার্কিন গৃহযুদ্ধের মরসুমে ওরাই প্রথম কটন মিল পত্তন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের মওকায় প্রথম ইস্পাতের কারখানাও ওদেরই উদ্যোগিতায়। অভয় দিলে ওরাই প্রথম ভারতীয় হুইস্কি আর ব্রাণ্ডি, জিন আর বীয়ার উৎপাদন করবে। কিন্তু আপনি তো ভালো করেই জানেন যে ইংরেজ থাকতে ওরা অনুমতি পাবে না, বিলেতের কায়েমী স্বার্থ বাধা দেবে, ওদের মিতা ফ্রান্সের কায়েমী স্বার্থও। যুদ্ধ শেষ হলে সন্ধিসূত্রে জার্মান কায়েমী স্বার্থও। ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে যায় কংগ্রেসও বাধা দিবে, গান্ধী বেঁচে থাকতে কংগ্রেসের এত সাহস হবে না যে মহাত্মাকে অমান্য করবে। আর লীগ দলপতি কায়েদে আজম জিন্না সাহেব যদিও আর সব বিষয়ের মতো সুরাপানেও সাহেব তবু তিনিও তাঁর সম্প্রদায়ের ভোট পাবার জন্যে তাঁর জিন্নৎবাসিনী পার্শী পত্নীর সঙ্গে যা নিত্য সেবন করতেন তার বেলা পার্শীদের সঙ্গে নয় মোল্লা মৌলভীদের সঙ্গে সুর মেলাবেন। মসজিদ থেকেই মসনদ, আলাদা একটি মসনদ, এটাই তো পাকিস্তানের বিবর্তনের সূত্র। এ বিবর্তন রোধ করবে কে?"

প্রসঙ্গটা রাজনীতির দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ক্যাপটেন নিতাইচাঁদ লাহা শঙ্কিত হয়ে বলেন, "খোন্দকার, এই একটি জিনিস আছে যা হিন্দু মুসলমান পার্শী খ্রীস্টান শিখ একসঙ্গে বসে পান করতে পারে। এই একটি জায়গা আছে যেখানে সেটা সম্ভব। সুতরাং ক্লাব যাতে বাঁচে তাই হোক আমাদের ভাবনা। যুদ্ধ কি চিরকাল চলতে পারে? চার বছর বাদেই হোক, পাঁচ বছর বাদেই হোক একদিন না একদিন থামবে। তখন আবার জাহাজ চলাচল নিয়মিত হবে, আবার জার্মানী থেকে বীয়ার আমদানী হবে, ফ্রান্স থেকে ব্রাণ্ডি, স্কটল্যাণ্ড থেকে স্কচ। আপনার আমার বদলীর চাকরি, বরাবরের জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের কর্ম নয়। আপনি সেক্রেটারি থাকতে নারাজ হলে আমিই তো সেক্রেটারি হব। আমি এই মহামানবের সাগরতীরে সবাইকে মেলাব ও সবার সাথে মিলব। মার্কার, পুছো।"

মার্কার তখন জনে জনে সুধায় কে কী খেতে চান। বিল তো মেটাবেন ডাক্তার তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের আয় থেকে। হোসেন বলেন, "ডাক্তারকে চটালে নিশ্চিত পরলোক। কল দিলে প্রেসক্রাইব করবেন ব্রাণ্ডি। তখন তো তাঁর আজ্ঞা মানতেই হবে। মেডিকাল লীভ চাইলে তিনিই তো রেকমণ্ড করবেন। যদি না করেন তা হলে তো প্রিভিলেজ লীভ নিতে হবে। মার্কার, ছোটা পেগ।" বলা বাহুল্য হুইস্কির।

মানসের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে যুথিকা খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিল। মানস তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে যায়। শোনে ক্যাপটেন মুস্তাফী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

"মাফ করবেন, ক্যাপটেন মুস্তাফী, পুলিশের কবলে পড়েছিলুম, শেষে ডাক্তার এসে আমাকে উদ্ধার করেন।" মানস হাসতে হাসতে বলে।

"অ্যাঁ!" মুস্তাফী চমকে উঠে বলেন, "জজকে ধরতে আস্পর্ধা হয় পুলিশের! এমন বিচিত্র কাহিনী তো কখনো শুনিনি।"

"শোনাব। শোনাব। তার আগে শুনতে চাই মিলির খবর। কিন্তু আরো আগে শুনতে চাই কী খাবেন?" মানস যুথিকার দিকে তাকায়।

"সেটা কি এতক্ষণ বাকী আছে নাকি? যূথী মা আমাকে কি অমনি বসিয়ে রেখেছেন? হ্যাঁ, মিলির খবর দিতেই আজ আমার আসা। মিলি পোর্ট সেড থেকে কেবল করে জানিয়েছে যে মেডিটেরানিয়ান দিয়েই মার্সেলস যাচ্ছে। কোনো ভয় নেই। সব ভালো। এডেন থেকে এয়ার মেলে চিঠিও পেয়েছি। তাতে আপনাদের দু'জনকে ওদের দু'জনের প্রীতি নমস্কার জানাতে বলেছে। জাহাজে যাত্রীর সংখ্যা এত কম যে সকলেই সকলের চেনা। সাহেব মেমদেরও অন্য চেহারা। যেচে আলাপ করেন। সব সময় কুশল প্রশ্ন করেন। লিখেছে আমি কি জানতুম যে ওরা 'হাউ ডু ইউ ডু' বললে আমাকেও তার উত্তরে বলতে হবে 'হাউ ড় ইউ ডু'? আমি বলি, 'নট ভেরি ওয়েল, আই ফীল সিক।' কথাটা সত্যি, কিন্তু ইংরেজদের স্বভাব হচ্ছে ওরা মুখ ফুটে ওকথা জানায় না। চেপে রাখে। অন্তরঙ্গতা জন্মালে কথাপ্রসঙ্গে বলে। আর আমরা তো সম্পূর্ণ অপরিচিতকে রোগের খুঁটিনাটি বিবরণ শোনাই। কিংবা বলি, 'আমি ভালো আছি। আপনি?' তখন হয়তো শুনতে হয় আধিব্যাধির বিশদ বর্ণনা। যাত্রীদের সবাইকে ক্যাপটেন সাহেব নিজের টেবিলে বসান, আমাদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেন। খাবারও পাই প্রথম শ্রেণীর। তবে ক্যাবিনের শ্রেণীভেদ মানতে হয়। ক্যাপটেন সাহেবের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে। একটা বাইনোকুলার ধার দিয়ে বলেছেন যতদিন খুশি রাখতে পারি, নামবার আগে ফিরিয়ে দিলেই চলবে। ডেক চেয়ারে বসে হাওয়া খাই আর বাইনোকুলার দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখি। এই অপূর্ব অনুভূতির জন্যে সমুদ্রযাত্রার আবশ্যক ছিল। আর সমুদ্রযাত্রার জন্যে বিবাহের আবশ্যক ছিল। আর বিবাহের জন্যে অমন একজন দেবদূতের আবশ্যক ছিল। কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না ভাবতে যে জুলির বরকে আমি ছিনিয়ে নিলুম। যূথীকে বোলো জুলিকে বোঝাতে

যে এর জন্যে জুলিই দায়ী। ও যদি ওর বরকে বার বার তিনবার প্রত্যাখ্যান না করত তা হলে উনিও আমাকে চাইতেন না, আমিও ওঁকে চাইতুম না। প্রজাপতির নির্বন্ধ ব্যতীত এর আর কী ব্যাখ্যা আছে ? তোমরা যতবার নির্বন্ধ করেছ ততবার ব্যর্থ হয়েছ। আমি তো চেষ্টাই করিনি। যাই হোক, বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে বিয়ে যাতে সুখের হয়। আমি ওঁকে অভয় দিয়েছি যে ওঁর জীবনে আমি যখন ছিলুম না তখন আর কেউ ছিলেন কি না, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে একটিও প্রশ্ন করব না। উনিও কথা দিয়েছেন কখনো প্রশ্ন করবেন না আমি সন্ত্রাসবাদীদের কোন্ দলে যোগ দিয়েছিলুম, আমার কমরেডদের কার কী নাম, কার কী ঠিকানা, কার কী কীর্তি বা অপকীর্তি, কোন জন সাচ্চা, কোন্ জন মেকী, কতবার সর্পতে রজ্জুভ্রম করেছি, কতবার রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি। আমাদের দু'জনের জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেছে, আমার তো সেই সঙ্গে গোত্রান্তর।"

চিঠিখানা তিনি পড়ে শোনান। তার পর মানস ও যূথিকার কাছে তাঁর সহধর্মিণীর ও তাঁর নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন।

তখন পুলিশ ও ডাক্তারের কাহিনী শুধু যূথিকাকেই শোনাতে হয়।

খুব একচোট হাসাহাসির পর যূথিকা বলে, "তোমরাও এবার নিশ্চিন্ত হলে। যে পথ দিয়ে মিলি গেছে সেই পথ দিয়ে হুইস্কি ব্রাণ্ডি আসবে। বীয়ার কিন্তু আসবে না। তার জন্যে হিটলারের সঙ্গে লড়তে হবে। তাকে হারাতে হবে। মিউনিকের সেই বীয়ারগার্টেনেই তো নাৎসী পার্টির সমাবেশ হয়।"

"ভেবো না, বীয়ার বাঁকা পথ দিয়ে আসবে ঠিকই। গোটা কয়েক নিরপেক্ষ দেশও তো থাকবে।" মানস আশ্বাস দেয়।

"বেল পাকলে কাকের কী ? আমি তো ক্লাবেও যাইনে, মদও খাইনে। যে দুটির ভার ভগবান আমাকে দিয়েছেন সে দুটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও মানুষ করে তোলাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ। বলতে পারতুম সব সময়ের কাজ, কিন্তু আমি তো কেবল মাতা নই, কেবল বধূ নই, আমি নারী। আমার নারীত্বের বিকাশ তো থেমে থাকতে পারে না। যেমন তোমার পৌরুষের বিকাশ। শোক আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকেও তো দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্যেই তোমার টেনিস খেলতে যাওয়া। আড্ডা দেবার জন্যে নয়। বেচারা ক্যাপটেন মুস্তাফী ! কতক্ষণ থেকে এখানে এসে বসে আছেন। বাড়ীতে ওঁর মিসেসও তো এমনি উতলা।" যূথিকা শুনিয়ে দেয়।

মানস নীরবে শুনে যায়। সত্যিই তো। ক্লাবে এত বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক

হয়নি। তবু মেম্বর মাত্রেরই ক্লাবের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। মদের অভাবে নয়, মেম্বরের অভাবে ক্লাব উঠে যেতে পারে। তখন কোথায় খেলতে যাবে টেনিস?

"ছেড়ে দাও। যা হবার তা হয়ে গেছে।" যূথিকাই আবার বলে, "এখন থেকে জুলির কথাটা একটু ভেবো। মিলির বিয়েতে ও দারুণ আঘাত পেয়েছে। বর ছিনিয়ে নিল বলে নয়, বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল বলে। যেত যদি রাশিয়া জুলি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরত। ধরে নিত যে বিপ্লবকে এগিয়ে দেবার জন্যেই যাচ্ছে। তখন মনে হতো বিয়েটা যেন রোজা লুকসেমবুর্গের বিয়ে। প্রেমের জন্যে নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। তা তো নয়, চলল কিনা বিলেত। যে দেশ আমাদের দেশকে বুটের তলায় পিষে মারছে। জনগণকে চুষে খাচ্ছে। না, না, এসব আমার নিজের উক্তি নয়, জুলির উক্তির পুনরুক্তি। আমি ওর মতো আঁধাবে ঝাঁপ দিতে চাইনে। ইংরেজ শুধু অনিষ্টই করেছে, ইষ্ট কি একটুও করেনি? বিপ্লব কি শুধু ইষ্টই করে, অনিষ্ট একটুও করে না?"

মানস বলে, "সামনে আসছে একটা ঘোরতর পরিবর্তন। সেটা বিপ্লবের রূপও নিতে পারে, জুঁই। সেটা ভালো কি মন্দ তা এককথায় চিহ্নিত করা যায় না। কারো মতে মন্দ, কারো মতে ভালো। সৌম্যদা চাইছে সেটাকে নির্জলা অহিংস রূপ দিতে। নির্জলা একাদশীর মতো সম্পূর্ণ কল্যাণকর। যেটা হবে সকলের মতে ভালো। আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমি কারো সঙ্গে একমত হতে পারছিনে। ইংরেজদের চাইতেও মন্দ আছে, তারা হিটলারপন্থী জার্মান। সেইজন্যে কংগ্রেস নেতারা বিপ্লবীদের মতো অন্ধ ব্রিটিশবিদ্বেষী নন। বিপ্লবের দিন তাঁরাও তো কোতল হবেন। বুর্জোয়া বলে তারাও তো রক্তশোষক। কংগ্রেস ভেঙে যাচ্ছে বাম দক্ষিণের কোঁদলে। বিকল্পে যে তেমনি একটা শক্তিমান সঙ্ঘ গড়ে উঠছে তা নয়। ক্ষমতার হস্তান্তর নির্বিবাদে না হলে চরম অরাজকতা। গান্ধীজীও বুঝতে পারছেন যে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। তিনিও তখন অসহায়। আর আমি? আমি নীরব সাক্ষী। তোমাদেরও যে প্রোটেকশন দিতে পারব সে ক্ষমতা আমার নেই। কে দেবে তাও জানিনে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ আমাকে ভাবায়, অথচ আগেকার মতো ভগবানে বিশ্বাস, তাঁর মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস আজ আমার নেই। সেটা আছে সৌম্যদার। ওর দৃষ্টি ধ্রুবতারার উপরে।"

॥ তেরো ॥

এর পরে যখন ক্যাপটেন লাহার সঙ্গে দেখা হয় মানস তাঁর করমর্দন করে বলে, "ক্যাপটেন, আপনি কি গালিলেও না নিউটন না আইনস্টাইন? সেদিন কত বড়ো একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করে শোনালেন!"

লাহা তো অবাক। "আমি নিউটন বা আইনস্টাইন! তত্ত্ব আবিষ্কার।"

"ওই একটি জিনিসই হিন্দু মুসলমান ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয়ান সবাইকে একসঙ্গে মেলায়। আর এই একটি জায়গাই মহামানবের সাগরতীর। কেন আপনাকে আই. এম. এস করেনি, তাই ভেবে আকুল হচ্ছি।" মানস গম্ভীরভাবে বলে।

"অমন করে আঁতে ঘা দিতে নেই, মল্লিক। আমি বিলেতে যাবার সুযোগ পাইনি। যুদ্ধে যাবার মওকা জুটেছিল। ফিরে এসে সরকারী চাকরি পেয়ে যাই। সেই থেকে ক্যাপটেন র‍্যাঙ্কটাও থেকে যায়। ফলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। ক্লাবে ঢুকতে চাইলে কেউ ব্ল্যাকবল করে না। সাহেব মেমদের সঙ্গে সমানে মিশতে পারি, তার জন্যে ওই জিনিসটি খেতে ও খাওয়াতে হয়, তবে মাসের শেষে বিল কত উঠবে তারও একটা হিসেব রেখে চলি। কোথাও সিভিল সার্জনের পদ খালি হলে, আই. এম এস দাবীদার না থাকলে আমাকেই অফিসিয়েট করতে ডাকে। চাকরিতে যারা আমার সীনিয়র তাঁদের এই বলে স্তোক দেওয়া হয় যে ওটা তো লীভ ভেকেন্সী। পার্মানেণ্ট ভেকেন্সী তো নয়। লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ছেদ পড়ে। সরকারী ডাক্তারেরা একস্থানে স্থির হয়ে না বসতে পেলে তাঁদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমে না। এই জন্যে অনেকে অস্থায়ী পদোন্নতি প্রত্যাখ্যানও করেন। তখন আমাকেই মনে পড়ে। আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মায়া কাটিয়ে প্রমোশনের মায়াবিনীর ফাঁদে পড়ি।" লাহা একটু রসিয়ে রসিয়ে বলেন।

মানস তা শুনে আরেক দফা করমর্দন করে। "নোবেল প্রাইজ। নোবেল প্রাইজ ফর মেডিসিন।"

"থামুন থামুন। এখনো তো সব কথা বলা হল না।" ডাক্তার সাহেব কানে কানে বলেন, "আপনাদের মতো আমরা তো বিলেতও যাইনি, কোমর জড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নাচবার সুযোগও পাইনি। আমাদের পক্ষে এই সেই বিলেত, এখানে যারা নাচতে জানে তারা ইণ্ডিয়ান হলেও অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কিন্তু কৃষ্ণাকেও সঙ্গে করে আনতে হয়। নইলে কৃষ্ণকে ওঁরা সন্দেহ করেন। আমি তো চিরকুমার, আমার কে আছে যে কাকে সঙ্গে করে আনব! আমার মতো ইউরোপীয়ানও তো আছেন। তাঁরা যদি মার্জনা পান আমিও কি পেতে পারিনে? আর ওই বেটা সাহনী ক্যাপটেন থেকে মেজর হয়েছে, মেজর থেকে লেফটনাণ্ট কর্নেল হয়েছে শুধু তাই নয়, আই. এম. এসও হয়েছে। কেন বলতে পারেন? ও হলো ক্রিশ্চান, মাইনরিটি সম্প্রদায়ভুক্ত। ওর নাকি ফরাসী মেমসাহেব। এ দেশ সহ্য হলো না, বাচ্চাকে মানুষ করার নাম করে প্যারিসে বসবাস করছেন। কেউ কখনও তাঁকে চক্ষে দেখেনি। ধাপ্পাও হতে পারে। তবু তাসের আসরে ওর বাঁধা আসন। মেম-সাহেবরা ওকেই পার্টনার পেলে ভরসা পান যে বাজীমাৎ করবেন। ব্রিজ খেলায় লোকটা পয়মন্ত। টাকা পায় ও পাইয়ে দেয়। অমন ভাগ্যবান পুরুষকে যে নাচের পার্টনার হতে দেওয়া হয় তার এটাও একটা হেতু। আমি কিন্তু তাসের আসরে লক্ষ্মীছাড়া। ওদিকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসেও হতভাগা। আমার বন্ধু মুস্তাফী কেমন জাঁকিয়ে বসেছেন দেখেছেন? এক স্টেশনে চিরস্থায়ী হতে চান বলে চাকরিটাই দিলেন ছেড়ে। উনি ভালো করেই জানতেন যে ওঁকে সিভিল সার্জন পদে পারমানেণ্ট করা হবে না, কেননা ওঁর মেয়ে একজন নাম-করা টেররিস্ট। এটাই বা কোন সুবিচার! মেয়ের অপরাধে বাপের প্রাণদণ্ড! মুস্তাফীর চেয়ে বিচক্ষণ কোন্ সাহেব ডাক্তার! ও বেটা সাহনী তো একটা মানুষমারা সার্জন। প্রাণদণ্ড দিতে হলে সাহনীকেই দিতে হয় সব আগে। যা বলছিলুম, আমি পড়ে গেছি আরো এক মায়াবিনীর ফাঁদে। ব্রিজে আমাকে কেউ পার্টনার করে না, সেদিক থেকে আমি পয়মন্ত নই। কিন্তু বল নাচে আমার পার্টনার হতে কেউ সাড়া না দিয়ে পারেন না। কেন বলতে পারেন?"

মানস নির্বাক। লাহা আরো চুপি চুপি বলেন, "খবরদার, ফাঁস করবেন না। তা যদি করেন আমার কপালে আছে বাঁদর নাচ। আপনি তো লেখেনও শুনেছি। কে জানে কোন্‌দিন নভেল কি নাটকে আমাকে দিয়ে বল নাচ নয়, বাঁদর নাচ নাচাবেন। দেশশুদ্ধ লোক হাসবে। লাহা পরিবারের মাথা হেঁট হবে।"

মানস তাঁকে অভয় দেয় যে তেমন কোনো অভিলাষ তার নেই। ক্যাপটেন লাহাকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তিনি একই ব্রাদারহুডের মেম্বর, যদিও একই সার্ভিসের নন। তেমন কাজ যদি করে তবে সবাই তাকে একঘরে করবেন। বলবেন সে একটা ক্যাড।

তখন লাহা রসিয়ে রসিয়ে বলেন, "শত্রুরা বলে আমার নাকি সেই জিনিসটি আছে বা রুডলভ ভালেন্টিনোর ছিল। আরো খোলসা করে বোঝাতে হবে? ওই শব্দটা কি মুখে না আনলে নয়? দুটি হরফ উহ্য রেখে বলি, এক্স্ অ্যাপীল।"

হো হো করে হেসে ওঠে মানস। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। পানের মাত্রা বোধ হয় বেশী হয়ে গেছে। ভদ্রলোক কৃষ্ণবর্ণ হলেও কৃষ্ণ নন। তাঁর সঙ্গে রাসলীলার জন্যে গোপীরা উদ্বাহু হবেন না। ক্লাবের মেম্বরমাত্রেরই তেমন সৌভাগ্য হয় না। "কোনো কোনো ভাগ্যবান নাচিবারে পায়।"

মানস কথা রাখে। এসব কথা আর কারো কানে যায় না। কিন্তু এখন বুঝতে পারে ইউরোপীয়ান ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে ইণ্ডিয়ানরা কেন লালায়িত আর তাঁদের মেম্বর করতে ইউরোপীয়ানরা কেন আতঙ্কিত। ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ানদের একজনকে মেম্বর করেও কেন পরে পুকুরের জলে পাতিহাঁসের মতো চোবানো হয়েছিল। অশালীন ভাষায় যাকে বলে "ডাকিং"।

ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে উধাও হন্। কয়েকদিন ক্লাবেই আসেন না। আবার যেদিন দেখা হয় সেদিন মাফ চেয়ে বলেন, "একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। না? সেদিন নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে হয়েছিল। শেফার্ডের হুকুম। কেসটা হয়তো আপনার কোর্টে পাঠানো হবে। আপনি যেমন নরম মানুষ আসামীকে হয়তো সন্দেহের অবকাশ দেবেন। তবে এসব কেস সাধারণত বার্লো নিজেই বিচার করেন ও আসামীকে ঝুলিয়ে দেন। যুদ্ধফের্তা ইংরেজরা মরণের মুখোমুখি হয়ে অসাড় হয়ে গেছে। শেফার্ড ও বার্লো দু'জনেই ফ্রন্টে গেছেন। গুলী চালাতে বা ফাঁসী দিতে তাঁদের বিবেকে বাধে না। আমিও ফ্রন্টে গেছি। কিন্তু আমার তো কর্তব্য আহতদের প্রাণ রক্ষা করা, তার জন্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করা। আমি অসাড় হয়ে যাইনি। তাই অপ্রিয় কর্তব্য করবার সময় একটু আধটু টানতে হয়। ওই বীভৎসতা কি নেশা না করলে সহ্য হয়! সেদিন তারই খোয়ারি ভাঙছিলুম। সেইজন্যে ওসব কথা আপনাকে বলতে সাহস হয়েছিল। এখন হাত পা কামড়াচ্ছি।"

মানস হেসে ওঠে। "হাত পা কামড়াবেন কেন? বন্ধু মহলে কে না অমন কথা বলে? কার না ধারণা যে সেও একজন ভালেন্টিনো হলেও হতে পারত, যদি

আমেরিকায় গিয়ে সিনেমায় নামত। ওটাকে আমরা স্পোর্টসম্যানের মতো নিই। মনে রাখি নে। নির্ভয়ে বলবেন, ডাক্তার সাহেব।"

আশ্বাস পেয়ে ক্যাপটেন লাহা বলেন, "কারই বা ভালো লাগে নিজের হাতে পোস্ট মর্টেম করতে! সিভিল সার্জনরা এসব কাজ সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনদের দিয়ে করান। আমি যদি সাহেব হয়ে জন্মাতুম শেফার্ড কি আমাকেই আদেশ দিতেন একাজ স্বহস্তে করতে? ওঁর আদেশ দেবার পদ্ধতিটাও চমৎকার। 'বাই দ্য ওয়ে, ল, মে আই আস্ক আ ফেভার?' অর্থাৎ আমার অফিসিয়াল সুপীরিয়র আমার অনুগ্রহপ্রার্থী। কে জানে, বাবা, আপনিও কোনদিন আমার অফিসিয়াল সুপীরিয়র হবেন। এর মধ্যেই কোথায় যেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু অস্থায়ীভাবে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে তো সীনিয়র। অনেক সীনিয়র। আপনাকে কি অমন আদেশ দিতে পারতুম? কিন্তু বলা যায় না। সীরিয়াস কেস হলে আমরা কনভিকশনের দিক থেকেই ভাবি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে জজ হলে আবার উল্টো দিক থেকে ভাবতে হয়। প্রত্যেকটি আসামীকে নির্দোষ বলেই ধরে নিতে হয়, যতক্ষণ না সে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়। এটাই ব্রিটিশ ধর্মাধিকরণের বৈশিষ্ট্য। জুরি প্রথার প্রবর্তনও এর অঙ্গ। জুডিসিয়ারিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা লাটসাহেবেরও নেই। শেফার্ড তো মুখ ফুটে তেমন কোনো ফেভার চাইতেই ভয় পাবেন। ব্রিটিশ শাসন যে এতকাল ধরে টিকে আছে এটা কি শুধু গায়ের জোরে? তার সঙ্গে ন্যায়ের জোরও আছে। ম্যাজিস্ট্রেট হলেন শস্ত্রশক্তির প্রতীক, আর জজ হলেন শাস্ত্রশক্তির প্রতীক। একজন হলেন আমাদের ভাষায় ক্ষত্রিয়, অপর জন ব্রাহ্মণ। দুই শক্তিই পরস্পরকে চেক ও ব্যালান্স জোগায়। এটাই হলো নিয়ম, তবে সঙ্কটকালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। অর্ডিনান্সের শাসন আইনের শাসনকে ছাড়িয়ে যায়।" মানস এর জন্যে দুঃখিত।

"ওরা সংঘাতের সময় বলে, মাইট ইজ রাইট। শান্তির সময় বলে, রাইট ইজ মাইট। কখনো বিবেকের উপর জয়ী হয় স্বার্থবুদ্ধি। কখনো স্বার্থবুদ্ধির উপর বিবেক। লোহার হাত আর মখমলের দস্তানা দুটোই মিলে ব্রিটিশ রাজ। পোষ না মানলে ডাণ্ডা। পোষ মানলেই ঠাণ্ডা। ভালো কথা, মল্লিক, আপনি কি জানেন এখানে মিলিটারি আসছে? থামবে না, আরো দক্ষিণে চলে যাবে। বর্মায় কি মালয়ে। বোধহয় সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি গাড়বে। কেন, বলুন দেখি? জার্মানরা কি সিঙ্গাপুর অবধি ধাওয়া করবে?" ক্যাপটেনের কথায় কিসের যেন সঙ্কেত।

"তা যদি হয় আপনি যাবেন নাকি সিঙ্গাপুর ফ্রন্টে? তেমন কোনো অঙ্গীকার দেননি তো?" মানস উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে।

"ওরা চায়ও নি। আমি দিইও নি।" লাহার উত্তর।

"আমিও এককালে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরে ভর্তি হয়েছিলুম। যেদিন বলে ভারতের বাইরে যখনি দরকার হবে তখনি যেতে হবে, সেদিন বণ্ড সই করতে অস্বীকার করি। বলে, ওটা একটা মামুলি ফর্মালিটি। আমি কি তাতে ভুলি? মানে মানে সরে সড়ি। একবার সই করলে পরে আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। কোর্ট মার্শাল।" মানস শিউরে ওঠে।

"যাঃ! আপনি দেখছি নেহাৎ এক ভেতো বাঙালী। সাধে কি বলে আমরা মার্শাল রেস নই? আর্মিতে আমাদের অফিসার করে না, কারণ আমরা লড়ুইয়ে জাত নই। আমরা ভাবি কারণটা রাজনৈতিক। তা নয়, সামরিক। মেসোপোটেমিয়ার গিয়ে বেঙ্গলী রেজিমেন্ট লোক হাসিয়ে এসেছে। নিজেদের মধ্যেই লড়াই।" আপসোস করেন লাহা।

"কেন, আমি তো একজনকে জখম হয়ে ফিরতে দেখেছি। ফিরে এসে হয়েছেল সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।" মানস আশ্চর্য হয়ে বলে।

"ওটা কি টার্কদের গুলিতে না বাঙালীদের গুলীতে?" লাহা মুচকি হাসেন।

"অবশ্যই টার্কদের গুলীতে।" মানস দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

'আপনি দেখছি সহজেই সকলের সব কথা বিশ্বাস করেন। ইংরেজরা অত নীরেট নয় যে অকারণে একটা রেজিমেন্ট ভেঙে দেবে। ডিসিপ্লিন ইজ দ্য ওয়ার্ড। অনার ইজ দ্য ওয়ার্ড। লয়ালটি ইজ দ্য ওয়ার্ড। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করলে মিলিটারিতে রাখে না। সিভিলে হয়তো রাখে, কিন্তু নিচের তলায়। ডাক্তারদের মধ্যেও কোঁদল। যেখানেই বাঙালী সেখানেই দলাদলি। ফ্রন্টে গিয়েও ঢেঁকি ধান ভানে। ফলে আর সরকারী চাকরি জোটে না! অবশ্য ডাক্তারি ব্যবসা করতে বাধা নেই। সে রকম কেস কিন্তু বিরল। ডাক্তাররা মোটের উপর মাথা ঠিক রেখে কাজ করেছেন। বাঙালীরা ডাক্তার হিসেবে খুব নাম করে ফিরেছেন। আমাকেও এতদিনে মেজর কি লেফটেনাণ্ট কর্নেল করে থাকত, আমি যদি ফ্রন্টিয়ারে কি বেলুচীস্থানে চাকরি নিয়ে থেকে যেতুম। সেটা যে হলো না তার কারণ আমি ভীতু বাঙালী বা ভেতো বাঙালী নই। আমি চেয়েছিলুম বুড়ো বাপ মার কাছে না হোক কাছাকাছি থাকতে। কিন্তু তাঁদের শেষ সাধটা মেটাতে কি পারলুম?" লাহা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"শেষ সাধ? তার মানে কী, ক্যাপটেন? শুনতে চাইলে কি অশিষ্টতা হবে?' মানস কৌতূহলী হয়।

"না, না, অশিষ্টতা নয়। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য। তাঁরা আমাকে বিলেত যেতে দেননি, জেদ ধরেন যে তার আগে বিয়ে করতে হবে। আমি দেখি মহাবিপদ। তা হলে আর বিলেত গিয়ে স্বাধীনতা কী হলো? হাত পা বাঁধা। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পাবব না। যার জন্যে সবাই বিলেত যায়। আপনি হয়তো ব্যতিক্রম। প্রেজেণ্ট কম্পানী অলওয়েজ একসেপটেড। আই বেগ ইয়োর পাড ন, সার।" লাহার কাঁচুমাচু মুখ।

মানস হা হা করে হেসে ওঠে। "মেলামেশা আমিও কামনা করছি। সেটা কিন্তু অত সুলভ নয়। কেউ ইনট্রোডিউস করে না দিলে রীতিমতো দুর্লভ। নেহাৎ যদি এল-এল ডি না হয়।" মানস রঙ্গ করে।

"সে কী, মশায়! তার মানে তো তো ডক্টর অভ ল। আমি যেমন ডক্টর ল। ওদেশের মেয়েরাও কি তাই? ডক্টরেট এত সুলভ?" লাহা বিশ্বাস করেন না।

"আরে দূর! আপনি কি ঠাট্টাও বোঝেন না? এল-এল ডি মানে ল্যাণ্ডলেডাস ডটার। ওদের সঙ্গে ঘরে নাচতে পারা যায়, বাইরেও অসম্ভব নয়। আমি ওসব কিছু করিনি। করলে বাঙালী মহলে ঢি ঢি পড়ে যায়। বেটার সার্কলেই মিশেছি। তবে মেলামেশাটা প্রধানত বাঙালী মহিলাদের সঙ্গেই হয়েছে। যেটা দেশে থাকলে হতো না। যা কড়া পর্দা। এই দশ বছরে কতকটা কমেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েদের কতকটা মুক্তি দিয়েছে। জেল থেকেও রাজবন্দিনীদের চিঠিপত্র পেয়েছি। এ যে অভাবনীয় পরিবর্তন।" মানস উচ্ছ্বসিত।

"জেল থেকে? রাজবন্দিনীদের! আপনাকে দিল পড়তে!" লাহা তো অবাক।

"সেনসর যদি পাস করে পড়তে দেবে না কেন? তবে পুলিশের খাতায় আমার নিজের নাম উঠল কি না কে জানে! কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেনি। অতি নির্দোষ চিঠি। বড়ো দুঃখ হয় যে কাউকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারিনি। তাঁরাও চাননি। দেশের মুক্তির জন্যেই তাঁরা জেলে গেছেন, অকুতোভয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন সংগ্রামে। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ নিরস্ত্র হয়ে। আমি তাদের বন্দনা করি। তবু মনটা কেমন করে। জেল যে কী জিনিস তা কি আমি জানিনে?" মানস ব্যথিত।

"সে কী! আপনি আবার জেলে গেলেন কবে? অসহযোগ করেছিলেন নাকি? তা হলে তো পরীক্ষায় বসতেই দিত না।" লাহার মুখে বিস্ময়।

"অসহযোগের দিন জেলে যেতে পা বাড়িয়েছিলুম আমরা ক'জন, কিন্তু এই শর্তে যে আমাদের গুরুমশাইরাও যাবেন। তাঁরা পেছিয়ে যান। আমরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। লগ্ন উত্তীর্ণ হলে যা হয়। চৌরীচৌরা এসে গান্ধীজীকেও নিবৃত্ত করে। কিন্তু এমনি বিধাতার বিধান যে পরে চাকরি করতে হয় সেই সবকারেব অধীনেই। জেলে যেতে হয় হপ্তায় হপ্তায়, অন্তত একবার। খোঁজ করতে হয় আণ্ডারট্রায়ালদের। তাদের কোনো নালিশ থাকলে প্রতিকার করতে হয়। এটা রামরাজ্য না হলেও দেশীয় রাজ্য নয়।" মানস সপ্রশংস হয়।

"আব বলতে হবে না। ইংরেজের ব্যবস্থা ঢের ভালো। তবু আরো অনেক ভালো হতে পারত ওদেরই কল্যাণে। ডিটারেণ্ট সেনটেন্স বলে সেই যে একটা বিধি আছে সেটাকে যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করতে হয় জেলখানার ভিতরে। জেল যদি আরামেব জায়গা হয় তবে আর ডিটারেণ্ট সেনটেন্সের ত্রাস রইল কোথায়! সাজা আর মজা তো একাকার হলো।" ক্যাপটেন সাফাই দেন। তাকেও জেলে যাওয়া আসা করতে হয়।

"যা বলেছেন। সেদিন শেফার্ড খুব উত্তেজিত হয়ে অভিযোগ করেন, আমাব মুখে যখন শোনেন যে কংগ্রেসীরা আইন সভা থেকে সরাসরি জেলখানায় যাবেন যুদ্ধের প্রতিবাদে। 'ওঁরা কি কম তুখোড।' শেফার্ড বলেন, 'জানেন ওরা জেল কোড বদলে দিয়েছেন আটটি প্রদেশে, যেখানে ওঁদের মন্ত্রিত্ব? জেল কি আর জেল? জেল এখন গেস্ট হাউস। সরকারী খরচে ফার্স্ট ক্লাস কম্ফর্ট ভোগ করা হবে। ফিরে এসে আবার গদীয়ান হয়ে বসবেন। দেশের লোক ঠাওরাবে এঁরা কত বড়ো বীর।' গান্ধাজী চড়েন থার্ড ক্লাস ট্রেনে, তা শুনে শেফার্ড বলেন, 'সেটাও কি ত্যাগস্বীকাব। কামবাটা তো ওঁর জন্যে আর ওঁর দলবলের জন্যে রিজার্ভড। ধুয়ে মুছে তকতকে কবে রাখতে হয়, নইলে বড়লাটকে লিখে বিব্রত করবেন। দেশের লোক তো এই নিয়ে চেঁচামিচি করবেই। মিস্টার গ্যাণ্ডী একজন সেণ্ট কি না জানিনে, কিন্তু একজন ওস্তাদ পলিটিসিয়ান। আমাদের বাধ্য করবেন ওঁকে সদলবলে জেলে পাঠাতে। ত্বনিয়ার লোক বিশ্বাস করবে যে তিনিই রাইট, আমরাই বং। টেররিস্টদের আমরা বুঝি, যদিও তারিফ করিনে। কিন্তু কংগ্রেস একটি প্রহেলিকা।' শেফার্ড বিরক্ত।" মানস টিপে টিপে হাসে।

"কথাটা সত্যি, মল্লিক সাহেব। সোজা মানুষটাকে বাঁকা মানুষগুলো কেমন স্থকৌশলে তাড়িয়েছে। বাঙালীকে ওরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। স্থভাষকে ওরা পুতুল প্রেসিডেণ্ট করে রাখবে, ওরাই হবে পুতুল নাচের সূত্রধার। ঝগড়া বাধবে না?

তা বলে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হলো? ওদের কারো উপর আর আমার আস্থা নেই, ভাই। হিন্দুস্থানের মসনদে ওরাই তো বসবে। তা হলে আমাদেরও কি একই দশা হবে না? স্বরাজের জন্যে আমার তেমন ব্যস্ততা নেই। কিন্তু ক্লাইভ যদি মীর জাফরকে আবার বাংলার মসনদে বসিয়ে দিয়ে ছাতার আড়ালে থেকে যায় তা হলেই বা আমাদের কোন্ সুখ?" লাহার কাছে সেটাও অসহ্য।

"তা হলে আপনি কী চান, ক্যাপটেন?" মানস সুধায়, "সুভাষ নেতৃত্ব?"

'কেন নয়? সুভাষের মতো ব্রহ্মচারী আর কে আছে? কার এত ব্রহ্মতেজ? গান্ধী মহারাজও বিবাহ করেছেন, সেইসূত্রে প্রচুর শুক্রক্ষয় করেছেন। আর সুভাষের তো এক বিন্দুও ক্ষয় হয়নি। ভিতরে ভিতরে সবটাই রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বজ্রকঠিন বীরত্বে। হিটলারও সেইরকম এক নিষ্কাম ব্রহ্মচারী। হিটলার যদি জেতে তবে সেই পুণ্যের ফলেই জিতবে। খবরদার, একথা যেন আর কারো কানে না যায়, প্রিয় বন্ধু।" লাহা মিনতির সুরে বলেন হাত যোড় করে।

মানস তাকে অভয় দেয় যে এসব গোপন কথা আর কারো কাছে ফাঁস করা হবে না। "কিন্তু, ক্যাপটেন ল, আপনার বন্ধু হিসাবে আমি কি জানতে পারব না যে আপনারও চিরকুমার হবার মূলে তেমনি কোনো সংকল্প বা ব্রত ছিল, যেমন ছিল সুভাষচন্দ্রের বা হিটলারের? পরাধীন দেশের উদ্ধার বা পরাজিত দেশের জয়?"

"না ভাই, তেমন কোনো ব্রত নয়। নিছক জেদ। আগে বিলেত, তার পরে বিয়ে। তার মানে আগে আই. এম. এস, তার পরে পদের উপযুক্ত মিসেস। যাকে আমি সমাজে বার করতে পারি, ক্লাবে নিয়ে যেতে পারি। ক্লাবই তো অফিসারদের সমাজ। রোমে গেলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। ক্লাবে গেলে ইংরেজদের মতো। ওরাও নাচে, আমরাও নাচব। ওরাও খানাপিনা করে, আমরাও করব। আমার যুক্তি কি ভ্রান্ত না অভ্রান্ত? যেদিন জানব যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে সেদিন আমরা আর ওদের ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। ওদের মতো আচরণ করব না। সেদিন আমিও আই. এম. এস থেকে বিদায় নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নামব। আরে, ডাক্তারকে মারে কে! ডাক্তারই সবাইকে মারে। গান্ধী বলো নেহরু বলো, সুভাষ বলো, কেউ আমাদের মারবে না। না, খোদ হিটলারও না, যদি তিনি বায়ুরথে আকাশ পাড়ি দিয়ে ভারতে অবতীর্ণ হন। আজন্ম ব্রহ্মচারী বলে নতজানু হয়ে দেশসুদ্ধ হিন্দু তাঁর চরণ বন্দনা করবে। মুসলমানরাও করবে, সেটা তাঁর সংহারমূর্তি দেখে। এই কলেরা ম্যালেরিয়ার দেশে এসে নাৎসাদেরও তো আধিব্যাধি হবে। জার্মান ডাক্তারদের কি এসব রোগ সারাবার যোগ্যতা থাকবে?

থাকবে আমাদেরই। আমাদেরই ডাক পড়বে। তা হলে, ভাই, আমাদের মারবে কে? কিন্তু দোহাই তোমার, এসব কথা মণিমুক্তার মতো কুয়োর জলে ফেলে দিয়ো। প্রয়োজন হলে তুলবে।" লাহা কী বলতে কী বলে বসেন।

মানস পরিহাস করে বলে, "আপনিও তো হিটলারের মতো ব্রহ্মচারী ও আপনার হাতেও মারণাস্ত্র। আপনিই বাঁচবেন, আমরা মরব। কিন্তু এখনো আমার আসল কথাটা শুনতে বাকী। আপনার মা বাবা কি আপনার সরকারী চাকরি হয়েছে দেখে আবার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেননি? কন্যাকর্তারাও কি পণযৌতুকের টোপ ফেলেননি? কই, আপনার মতো আর একজনকেও তো দেখছিনে?"

"কেন, ডাক্তার রায়?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন ক্যাপটেন। "হুঁ হুঁ। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। উঁহুঁ। উঁহুঁ উঁহুঁ। বলব না।"

মানসকে বলতে হয় না। সে ফিক করে হাসে। "থাক, নাই বা বললেন।"

"যাক, যেকথা আমি মা বাবাকে বলি সেই কথা অতি সরল ও সহজ ভাষায়, নেই বিলেত তো নেই বিয়ে। নো ইংলণ্ড তো নো ম্যারেজ। আরে ভাই, এটাও কি বলতে হয় যে আই. এম. এস হলে আমার বিয়ের বাজারে পণযৌতুকের হারও পাঁচগুণ হতো? ওসবও আমি তুচ্ছ করতুম বৌ যদি হতো সুন্দরা, সুমধ্যমা, নৃত্যগীতনিপুণা, আধুনিকা। সোনা জহরৎ দিয়ে যার সর্বাঙ্গ মোড়া তেমন একটি সাজানো প্রতিমাকে নিয়ে ঘরকন্না করা যায়, রন্ধননিপুণা হলে তো ঝালটা ঝোলটা অম্বলটাও মুখরোচক হয়, দেশী খাবারই আমার বেশী ভালো লাগে। সেদিক থেকে আমি রোমানদের মতো নই, ওই অ্যাংলো-মোগলাই খানা আমার অসহ্য। লর্ড সিন্‌হার তো রোজ সুক্তো না হলে চলত না। রাঁধতেন স্বয়ং লেডী সিন্‌হা। সবার সেরা বাঙালী সাহেব ও বাঙালী মেম এই বচনে বিশ্বাস করতেন যে, পর রুচি পিন্‌হা আপ রুচি খানা। আমিও তাঁদের অনুগামী। বিয়ে করলে এমন একজনকেই করতুম যিনি হয়তো একদিন হতে পারতেন লেডী ল। আর তোমার ওই পর্দানশীন গৃহলক্ষ্মী? মা বাবার পছন্দ, আমার অপছন্দ। দেবদেবীকে দেবভাষায় প্রার্থনা করি ভার্যাং মনোরমাং দেহি। প্রজাপতি শুনলেন না। মা দুর্গা বললেন, কার্ত্তিকো ভব। অগত্যা ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী। পতিযোগ্য নহি, বরাঙ্গনে।"

"দাদা," মানস হাসি চাপে "বাকীটুকু ভুলে যাচ্ছেন কেন? শেষে সেই চিত্রাঙ্গদাই সেই অর্জুনকে বলেন, 'গর্ভে আমি ধরিয়াছি যে সন্তান তব'। সুন্দরী রাজেন্দ্রনন্দিনী যদি আপনার সম্মুখে উদয় হতেন আপনিও বাকীটুকু পূরণ করে বলতেন, 'প্রিয়ে, ধন্য আমি।' ইংরেজরা তো পঞ্চাশের পরেও বিয়ে করে সংসারী

হয়। পুত্রকন্যার জনকও হয়। ইচ্ছে করলে আপনি এখনো বিলেত যেতে পারেন। এই মহাযুদ্ধের মরসুমে চেষ্টা করলে আই. এম. এসও হওয়া যায়। মনোরমার দর্শন এখনো মিলতে পারে। এমন কোনো পণও আপনি করেননি যে দেশ স্বাধীন না হলে আপনি পাণিগ্রহণ করবেন না। তেমন পণ করেছেন আমার বন্ধু সৌম্য চৌধুরী। তাঁর জন্যে পার্বতীর মতো প্রতীক্ষা করছেন বহুদিন ধরে একটি কন্যা। আমার বোন না হলেও বোনের মতো প্রিয়। জীবনটা কি এতই দীর্ঘ যে অনির্দিষ্টকাল অবিবাহিত থাকলেও চলে?"

"সৌম্য চৌধুরী তোমার বন্ধু? কট্টর গান্ধীবাদী আর পাক্কা সাহেব! উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু!" লাহা তো শুনে থ।

"আমিও তো ছাত্রজীবনে গান্ধীর অনুগামী ছিলুম, কিন্তু তাঁর সব কথা কি বিনা বাক্যে মেনে নিতে পারতুম? সত্যের মহিমা আমি তখনো মানতুম, এখনো মানি। আমারও একটা সত্যের অন্বেষণ আছে। অহিংসা আমি হিংসার চেয়ে মহত্তর বলে তখনো মানতুম, এখনো মানি, কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে অপরিহার্য মনে করিনে। কোথাও এর নজীর নেই। এক ভারত যদি নজীর রাখতে চায় সেটা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তার জন্যে কে চিরকাল অপেক্ষা করবে? নেহরুর মতো দুই দরজা খোলা রেখেছি। গান্ধীজীর মতো হিংসার দরজা বন্ধ করে দিইনি। কিংবা সুভাষচন্দ্রের মতো অহিংসার দরজা। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের বেলা গান্ধীজীর সঙ্গে আমার গোড়া থেকেই অমিল। তিনি কোনো দিন প্রেমে পড়েননি, আর আমি প্রেমের খাতিরে ব্রহ্মচর্য ছাড়তে রাজী। তবে আমারও একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। প্রেমে না পড়লে আমি বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ব না। আমার জীবনে প্রেম না এলে আমিও আপনার মতো অবিবাহিত থাকতুম। দেশপ্রেমের মতো নারীর প্রেমও সাধনা আরাধনার ধন। সৌম্যদা আর আমি দু'জনে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছি। তাই আমাদের বন্ধুতা ছাত্রবয়স থেকেই অব্যাহত। তবে আমরা আগের মতো মেলামেশার সুযোগ পাইনে। ও ভাবে ও আমার সঙ্গে মিশলে আমার উপরওয়ালারা আমাকে সন্দেহ করবেন। আমি ভাবি আমি ওর সঙ্গে মিশলে ওর সংগ্রাম সাথীরা ওকে সন্দেহ করবেন। সেইজন্যে দীর্ঘকাল দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। সম্প্রতি আবার শুরু হয়েছে। এটাও বেশী দিন চলবে না। ওরা হয়তো আবার জেলে চলে যাবে।" মানস বুঝিয়ে বলে।

লাহা কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। "আচ্ছা, সেই যে একটি কন্যা সৌম্য চৌধুরীর জন্যে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করছেন তিনি কি আমার বন্ধুকন্যা মধুমালতা মুস্তাফী? ওর তো বিয়ে হয়ে গেল আরেকজনের সঙ্গে।"

"শুনেছি তিনিও প্রত্যাশা করেছিলেন সৌম্যদার সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু আমি যার কথা বলছি সে আর একটি মেয়ে। ওকে আপনি চিনবেন না। ওর জীবনটা বড়ো দুঃখের। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ, মিলনের পূর্বেই বিরহ ও বৈধব্য। লোকচক্ষে বিবাহিতা, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে কুমারী। ও আর বিয়ে করতে চায় না, যদি না সৌম্যদাকে পায়। মিলির সঙ্গে যার বিয়ে হলো সেই পাত্রটিকে জুলি বার বার তিনবার প্রত্যাখ্যান করেছে। দশবছর অপেক্ষার পর সুকুমার হাল ছেড়ে দেয়।" বলতে বলতে মানস নামগুলো ফাঁস করে দেয়।

"বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ।" লাহা স্মরণ করেন। "ওর বাবা ক্যাপটেন সোম যুদ্ধে আমার সমসাময়িক, কিন্তু চাকরিতে বছর পাঁচেক সীনিয়ার। মুস্তাফী আর সোম তো আই. এম. এসের জন্যে মনোনয়নও পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ওঁদের স্থায়ীভাবে বহাল করা হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর থেকে ওঁদের ভিতরে একটা বিদ্রোহীভাব লক্ষ করা যায়। মিলি তো সোজাসুজি টেররিস্ট বনে যায়। সোম ওঁর ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের দুঃখে মনমরা হয়ে মারা যান। অথচ অমন পাত্র হাতছাড়া করা যায় না। ওঁর স্ত্রী ওঁকে নিত্য খোঁটা দিতেন যে কেন ওঁকে ক্যাপটেন থেকে মেজর করা হচ্ছে না, কেন তিনি স্বদেশিয়ানা করে সরকারকে বিরূপ করে তুলছেন। যাক, সেসব পুরনো কাসুন্দী ঘেঁটে কী হবে? সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম না করলে কি অমনি প্রমোশন হয়? হতে পারে চিকিৎসার গুণে প্রাইভেট প্র্যাকটিস। তাতে তো তিনি ভালোই করছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্রান্তে ওঁকে দেওয়া হতো এমন সব জেলা যেখানকার লোক নেহাৎ গরিব। সিভিল সার্জনকে ডাকবার মতো অর্থবল নেই। তিনি আবার কম ফী নেবেন না। তাতে মর্যাদাহানি। তবে প্রথমবার পুরো ফী নিয়ে দ্বিতীয়বার সেই রুগীর কাছ থেকে আদৌ কিছু নিতেন না। ভেট তো সকলেই নেয়। দিলে ফিরিয়ে দিতেন। তাতে জমিদারদের সম্মানহানি। স্ত্রীর বিরক্তি। পারিবারিক জীবনের গতি চূড়ান্ত অশান্তিতে পৌঁছয় যখন জুলি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার শ্বশুরবাড়ী থেকে। পরে অবশ্য তাকে পাওয়াও যায়। কিন্তু ততদিনে তাঁর মন ভেঙে গেছে। শরীরও। নিত্য অনুশোচনা করতেন। ছেলেটিকে বিলেত যাবার আগে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হলো। বছর দু'তিন সবুর করলে কী এমন ক্ষতি হতো! ছেলেটিও তার বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতো না। স্ত্রীর উপরেও বিমুখ হতো না। জুলি তো বিলেতেও যায়। বিধবা মায়ের সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। ততদিনে ওরও অন্যদিকে মন গেছে। তাতে জুলির মনোভঙ্গ হয়। এসব কথা আমার চেয়ে তুমিই বেশী জানো, মল্লিক।"

"তার পরের অধ্যায় আপনারও আরো বেশী জানা। সে অধ্যায়ও বাসি হয়ে গেছে। ও মেয়ে বন্দীশিবির থেকে ছাড়া পেয়েছে অনেক দিন আগে। ওর টান সৌম্যদার উপরে। জুলি ওকে দেবতার মতো পূজো করে। অথচ সৌম্যদা হলো সত্য, অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য এই ত্রিনীতিতে বিশ্বাসী। কট্টর গান্ধীবাদী। আইন ভঙ্গ করে জেলে যাবে, কিন্তু ব্রতভঙ্গ করে বিয়ে করবে না। তবে আমি যতদূর জানি দেশ যেদিন মুক্ত হবে সেদিন ব্রহ্মচর্যব্রত থেকে ওর মুক্তি। জুলির উপরেই ওর টান সব চেয়ে বেশী। কিন্তু ওটা স্নেহ বা প্রেম না কম্পানিয়নশিপ তা তো বোঝা যাচ্ছে না। ওদের সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তা স্বরাজ আন্দোলনের পরিণতির মতোই দুর্বোধ্য। তাই আমি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করব না। মিলনান্ত হলে আনন্দিত হব। বিয়োগান্ত হলে মর্মাহত হব।" মানস ও প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টেনে দেয়।

"স্বরাজের কথা যদি বলো, আমার দিন দিন মালুম হচ্ছে যে ইংরেজরা ছাড়তে চাইলেও হিন্দু মুসলমান ওদের ছাড়বে না। কমলী নেহি ছোড়তি। এমন মারামারি বাধাবে যে সেটা থামাবার জন্যে একটা তৃতীয় পক্ষকে সালিশ মানতে হবেই। ওরাই সেই তৃতীয় পক্ষ যারা উভয় পক্ষেরই আস্থাভাজন। পুরোপুরি নিরপেক্ষ না হলেও মোটামুটি ফেয়ার। তুমি দেখবে ওরাই আর একটা রোয়েদাদ দিয়ে শেষরক্ষা করবে। কোনো পক্ষই সন্তুষ্ট হবে না, অথচ দুই পক্ষই মেনে নেবে। নয়তো দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে হিন্দু মুসলমানের এই দ্বন্দ্ব সেই কৌরব পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের মতো তলোয়ার দিয়ে মীমাংসিত হবে। কোথায় থাকবে তোমার বন্ধুর সত্য ও অহিংসা!" লাহা ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

॥ চোদ্দ ॥

ক্যাপটেন লাহা নিজের গাড়ীতে করে মানসকে বাড়ী পৌছে দিতে চান। বলেন, "তোমার মিসেসকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করব যে তোমার কোনো দোষ নেই। আমিই তোমাকে আটক করে রেখেছিলুম। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করব।"

"দেরি করিয়ে দিয়েছেন তা ঠিক, কিন্তু তাতে আমার অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। লেখক যারা হতে চায় তাদের অভিজ্ঞতাই তাদের সম্বল। ভাবছি প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মতো আমিও একখানা 'চার ইয়ারী কথা' লিখব। সেটাও হবে ক্লাবভিত্তিক কাহিনী। আপনার নাম তাতে থাকবে না, কিন্তু আপনিও হবেন চার ইয়ারের এক ইয়ার। কেমন?" মানস না ভেবে চিন্তে যা বলে যায় তার সবটাই বানানো।

"কী সর্বনাশ! তুমি তো দেখছি একটি বিপজ্জনক প্রাণী। আর কার কার সর্বনাশ করতে আমাদের চিড়িয়াখানায় অনুপ্রবেশ করছ?" লাহা কপট আশঙ্কার সঙ্গে কৌতূহল মেশান।

"সর্বনাশ কেন বলছেন? কী লিখতে চাই তা আগে শুনতে হয়।" মানস তাঁকে একটু খেলিয়ে খেলিয়ে বলে, "আমার নায়কদের চারজনের একজনের প্রার্থনা হলো, ভার্যাং মনোরমাং দেহি। দেবী তাঁকে বর দিলেন, কার্ত্তিকো ভব। দেবীর বর কি ব্যর্থ হতে পারে? কার্ত্তিকের মতোই রূপবান হলেন তিনি, কিন্তু কার্ত্তিকের মতোই চিরকুমার। বৃথাই একটি বিশেষ শ্রেণীর মনোরমারা কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক পূজা করেন। তিনি যে মুনিপুত্র শুকদেবের মতো নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী এর আরো এক কারণ ছিল। তাঁর বাসনা ছিল তিনি বিলেত গিয়ে উচ্চতর ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে আই. এম. এস হয়ে দেশে ফিরবেন! সূর্যকুমার চক্রবর্তীর মতো গুডিভ সাহেবের কন্যা বিবাহ করে নিজের পদবীর সঙ্গে শ্বশুরের পদবী যুক্ত করার অভিলাষও

ছিল। কিন্তু মাতা শত্রু পিতা বৈরী। বিলেত যাওয়া হয় না। জীবনের সাধ মেটে না। প্রাদেশিক সরকারের চাকরি নিয়ে মফস্বলের জেলায় জেলায় অ্যাসিস্টান্ট সার্জন হয়ে বেড়ান। এমন সময় বেধে যায় প্রথম মহাযুদ্ধ। বাঙালী পলটনের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় প্রেরিত হন। যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে অস্থায়ী সিভিল সার্জন। এক মুসলিম জমিদারের চার নম্বর ·বেগম সতীনদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে সতীনের বাটিতে বিষ গুলে খেয়ে মারা যান। জমিদার পুলিশে খবর না দিয়ে বেগমকে গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে কবর দেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক উড়ো চিঠি পেয়ে জানতে পান যে ওটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা। অপরাধী তিন সতীন। জমিদারও কম অপরাধী নন। কেন তিনি সাক্ষ্য গোপন করলেন? সাহেব হুকম দেন কবর থেকে লাশ উদ্ধার করে পোস্ট মর্টেম করতে হবে। কিন্তু সাধারণ সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জনকে দিয়ে নয়। সিভিল সার্জনকে দিয়ে। কে সেই সিভিল সার্জন? ক্যাপটেন ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কে? তিনিই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল। তাঁরই রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে জমিদার ও তাঁর বেগমদের শাস্তি বা মুক্তি। সিভিল সার্জন 'না' বলতে পারেন না। তিনি পড়ে যান বিষম ধাঁধায়। তার পর কী হলো তা ক্রমশ প্রকাশ্য।" মানস এইখানে ছেদ টানে। চেয়ে দেখে ডাক্তার সাহেব একেবারে কাৎ।

"লিখবে তুমি এইসব কথা! তা হলেই হয়েছে আমার প্রমোশন। আমাকে দেখছি মিলিটারির সঙ্গে ভাব করে ওদের সঙ্গেই সিঙ্গাপুর পাড়ি দিতে হবে। সেখান থেকে তদ্বির করে বিলেত। আমার রিপোর্টে আমি কী লিখেছি তা কিন্তু ফাঁস করছিনে, মল্লিক। আমার বিভাগের মন্ত্রী মুসলমান, তিনি জমিদারও বটে। যদি মিলিটারিতে যাওয়া না হয় তা হলে আমার ভাগ্যে কী আছে কে জানে? প্রমোশন না ডিমোশন।" লাহা ভাবনায় পড়েন।

গাড়ী থেকে নেমে ডাক্তার সাহেব মানসকে পেছনে ফেলে ছুটে যান যুথিকার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে। সে তখন গাড়ীর আওয়াজ শুনে নিজেই এগিয়ে এসেছে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে। সাহেব ডান হাত বাড়িয়ে দিতেই সে দুই হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে বলে, "নমস্কার।"

ক্যাপটন আগে থেকে তাঁর পার্ট মুখস্থ করে এসেছিলেন! অপদস্থ হয়ে বাড়িয়ে দেওয়া বাত ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, "গুড ইভনিং, মিসেস মল্লিক, আই হ্যাভ কাম টু অ্যাপলোজাইজ।"

যুথিকা তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, "আমারই.তো মাফ চাইবার কথা। কেন

আমি আপনার মতো বড়ো সাহেবের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে না দিয়ে নেটিভদের মতো দুই হাত জুড়ে নমস্কার করেছি। কিন্তু এর নজীর আছে, ক্যাপটেন সাহেব। মনে করুন আপনি বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড, আর আমি সামান্য প্রজা, মিসেস জিন্না। স্থানটা সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদ আর কালটা আজ থেকে বিশ একুশ বছর আগে কোনো এক সন্ধ্যা। এই সেই মহিলা যিনি কোটিপতি পার্শী পিতার অবাধ্য হয়ে মোসলেম ব্যারিস্টার জিন্নাকে বিবাহ করে ত্যাজ্যকন্যা হয়েছেন। জিন্নারই বা তখন কী এমন পসার! মাঝারি মাপের ব্যারিস্টার। তেমনি বাড়ীঘর। তাঁর স্ত্রী কি না মহামান্য রাজপ্রতিনিধির প্রসারিত হাত উপেক্ষা করেন।"

"এত বড়ো আস্পর্ধা!" লাহা স্তম্ভিত হন। "এ কে? সেই রতনপ্রিয়া পেতিত! ডানা কাটা পরী! এটা কি রূপের দেমাকে না রুপেয়ার দেমাকে? বলুন, বলুন, মিসেস মল্লিক। আপনি তখন কোথায়?"

"সিমলাতে। সেইখানেই আমার জন্ম। সেইখানেই কনভেণ্টের পড়াশুনা। আমার বাবা তখন বড়লাটের পার্সনাল স্টাফে। তাঁর উপরে অতিথি আপ্যায়নের সরঞ্জাম তদারকির ভার। যেন পান থেকে চূণ না খসে। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। বড়লাট এত লোকের মাঝখানে অপ্রস্তুত হন বইকি। কিন্তু নিমন্ত্রিত অতিথিকে অসম্মান দেখাতে পারেন না। ভদ্রমহিলাকে আদর করে পাশে বসিয়ে হিতোপদেশ শোনান। মিসেস জিনা, আপনি ছেলেমানুষ, তাই আপনি হয়তো জানেন না। হোয়েন ইউ আর ইন রোম ডু অ্যাজ দ্য রোমানস ডু।' হ্যাঁ, সাহেবরা উচ্চারণ করেন জিনা। আর গুজরাটীরা ঝীণা। আসলে ওটা একটা গুজরাটী হিন্দু নাম। ওর মানে ছোট। আর-সবাই উচ্চারণ করে জিন্না। মুসলমানরা ইদানীং উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন জিন্নাহ্। যেমন আল্লাহ্। আরবীর মতো শোনায়। জিন্না কিন্তু সে সময় কমিউনাল ছিলেন না। পাক্কা সাহেব, সেইসঙ্গে খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। আর তাঁর মিসেস শিক্ষাদীক্ষায় ইংরেজ হয়েও আচারে আচরণে কট্টর স্বদেশী। বড়লাটকে তিনি মুখের মতো জবাব দেন। 'ইয়োর এক্সেলেন্সী, এটাই তো রোম, আমিই তো রোমান। আমিই তো ইয়োর একসেলেন্সীর সঙ্গে রোমানদের মতো আচরণ করেছি। আমিও সেটাই প্রত্যাশা করেছি। আমাদের সঙ্গে ইয়োর একসেলেন্সী যদি আমাদেরই একজনের মতো আচরণ করতেন তা হলে আমরাও আত্মসম্মান বজায় রাখতেন পারতুম।"

"মাই গড! সো শী ইজ ইয়োর মডেল!" হকচকিয়ে যান লাহা।

"না, ডাক্তার সাহেব। আমি কখনো আমার স্বামীকে ছাড়ব না। পরে তিনি

স্বামীর আদর না পেয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে পরে পুনর্মিলন হয়। কিন্তু ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে কেন? স্বামীও ততদিনে কমিউনাল হয়েছেন। রতনপ্রিয়া তো মুসলমান হননি। আরবী নাম নেননি। মুসলিম আইনে ইহুদীর মতো পার্শীও কিতাবী। কলমা না পড়িয়েও বিয়ে করা চলে। আচরণ তাঁর বিয়ের পরেও বদলায়নি। মুসলিম সমাজ সহ্য করে না। অকালে মারা যান। একটি সন্তান রেখে যান। এই সেদিন ও মেয়ে সার নেস ওয়াডিয়ার ছেলে নেভিল ওয়াডিয়ার সঙ্গে ইলোপ করেছে। জাতে ওঁরাও পার্শী, ধর্মে কিন্তু খ্রীস্টান। বিয়েটা বোধহয় সিভিল মতে হয়েছে। জিন্না সাহেব ওকে ত্যাজ্য কন্যা করেছেন। মুসলিম লীগের দলপতি থাকতে হলে খ্রীস্টান পাত্রের সঙ্গে মুসলিম কন্যার বিবাহ মেনে নেওয়া চলে না। মেয়ের বিয়ে কিতাবীর সঙ্গে বারণ। জিন্না ওকে প্রাণভরে ভালোবাসতেন।" বলতে বলতে যুথিকা কেঁদে ফেলেন।

"হোয়াই আর ইউ ক্রাইং, মাই সিস্টার?" লাহা আরেকবার স্তম্ভিত হন।

"এমনি। পরের দুঃখে চোখে জল এসে পড়ে।" চোখের জল মোছে যুথিকা। বলে, "আপনি এত বার কেন ইংরেজীতে বলছেন, দাদা? আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। এ বাড়ীতে কেউ ইংরেজীতে কথা বলে না। ছেলেমেয়েদের আমরা বাঙালীও করব, মানুষও করব। আমাদের হোম হচ্ছে আমাদের রোম। এখানে এলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। তবে সাহেব মেম এলে আমরা তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলি। উনি যদি সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দেন তা হলে আমরা ওঁদেরও রেয়াৎ করব না। কিন্তু তেমন খুঁটির জোর কোথায়? সংসার চলবে না বই লেখার টাকায়। আর আমিও সঙ্গীত শিখিয়ে উপার্জন করতে পারিনে। যত্ন করে পিয়ানো বাজাতে শিখেছি। কিন্তু তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ তো কলকাতা। কলকাতায় থাকলে আবার রাজসিক ধারায় জীবন তরী ভাসাতে হয়। আমরা ও ধারা ছেড়ে সাত্ত্বিক ধারা শরণ করেছি। আমাদের জীবনে সেই যে শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল সেটা আমাদের মতে শূন্যগর্ভ সাহেবিয়ানার পরিণাম।" যুথিকা আবার চোখের জল মোছে।

"আই অ্যাম সো সরি!" বলেই লাহা জিব কাটেন। "আমি এত দুঃখিত!"

মানস মন্তব্য করে, "ওটা ঠিক বাংলার মতো শোনায় না, ডাক্তার সাহেব। কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক। চা না কফি? কী খাবেন, বলুন।"

"আমারই উচিত ছিল জিজ্ঞাসা করা। অপরাধ মার্জনা করবেন।" যুথিকা ভুলে গেছে বলে সত্যিই লজ্জিত।

"ওটাও ঠিক বাংলার মতো শোনায় না, জুঁই। ওটা ইংরেজী না হলেও ইংরেজী-তরো। যেমন ফজলি না হয়ে ফজলিতরো।" মানস হাসিমুখে বলে।

"বলুন, কী খাবেন, দাদা। বিদেশী তো দূরের কথা বিশুদ্ধ স্বদেশী মদিরাও আমরা রাখিনে। তবে চা কফি ছাড়তে পারিনি। আমরা তো সৌম্যদার মতো গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী নই। অতিথিদের দিতে হয়, নিজেরাও অন্যায় মনে করিনে। কী দেব বলুন।" যূথিকা নতুন করে সুধায়।

"নো। থ্যাঙ্কস। ক্লাবে আমি যা পান করে এসেছি তার উপর আর কিছু পান করতে আগ্রহ নেই। আজ থাক আরেকদিন আসব। তখন যেটা খুশি দিয়ো। কিন্তু তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, বোন। তুমি যাঁর মেয়ে তিনি তো তোমাকে কনভেণ্টেও পড়িয়েছেন। পিয়ানো বাজাতেও শিখিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাজার সাহেব সাজলেও ব্রাহ্মণ। তাঁর অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি। তিনি কি তোমাকে ত্যাজ্যকন্যা করেছেন? সার জাহাঙ্গীর পেতিতের মতো? বা জিন্নার কন্যাকে জিন্নার মতো? তার উপরে এই পুত্রশোক। কী করবে, ভগবানের মার।" লাহা দরদের সঙ্গে বলেন।

"ও প্রসঙ্গ থাক, দাদা।" মানস মিনতি করে। "জিন্না সাহেব যে একবার কত বড়ো একটা কাজ করেছিলেন সেকথা খুব কম লোকেরই জানা। কৃষ্ণদাসের বই ক'জনেই বা পড়েছে! এখন সেটি একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। সেদিন হঠাৎ আমার চোখে পড়ে। মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জন্যে সারা দেশ অধীর, ঘোষণার দিনক্ষণ ধার্য হয়ে গেছে গুজরাটের বারদোলী তালুক থেকেই শুরু হবে, তার পর গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়াবে দাবানলের মতো। অকস্মাৎ যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত অজ্ঞাত চৌরী চৌরা গ্রামে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। কী কারণে পুলিশের উপর চড়াও হয় জনতা, থানাসুদ্ধ পুলিশকে জ্বালিয়ে দেয়। মহাত্মা সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স স্থগিত রাখেন। আর আমরা সবাই তাঁর সেই পশ্চাদ্ অপসরণে হতাশ হই, ক্ষুব্ধ হই। অনেকেই তাঁর আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য নেতা বরণ করেন। কেউ ফিরে যান পার্লামেণ্টারি পন্থায়, কেউ এগিয়ে যান বিপ্লবী পন্থায়। কিন্তু এই ডিগবাজির পেছনে আসলে কী ছিল তা কোথাও প্রকাশ পেল না। চৌরীচৌরা গ্রামের আকস্মিক সেই লঙ্কাদহনের পূর্বেই একদিন গভীর রাত্রে বম্বের থেকে বারদোলীতে গিয়ে গান্ধীজীর শিবিরে গোপনে সাক্ষাৎ করেন এক গুজরাটী ব্যারিস্টার বন্ধু। যাঁর নাম ঝীণা থেকে জিন্না। তাঁকে সমঝিয়ে দেন যে তিনি যেমন প্রস্তুত সরকারও তেমনি প্রস্তুত। আর্মি মোবিলাইজ করা হয়ে গেছে। অদূরেই তাদের শিবির।

গান্ধী আদেশ দিলেই বড়লাটও হুকুম দেবেন। তখন আবার জালিয়ানওয়ালাবাগ। গণবিদ্রোহ সাতদিনের মধ্যেই খতম। তার চেয়ে আরো একবার কথাবার্তা চালানো যাক। মালবীয়জী আর জিন্না সাহেব লর্ড রেডিংকে বৈঠকে বসতে রাজী করিয়েছেন। গান্ধীজী তো থাকবেনই, মালবীয়জীও থাকবেন, জিন্না সাহেবও থাকবেন। এখন গান্ধীজী রাজী হলে হয়। মহাত্মা কিছুতেই মাস সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স স্থগিত রাখবেন না। রাখলে ধূমায়িত আগুন নিবে জ্বলে ওঠবার আগেই নিবে যাবে। জিন্না সাহেব ব্যর্থ হয়ে সেই রাত্রেই বম্বে ফিরে যান। গোপন সাক্ষাৎকার গোপন থেকে যায়। এর পরে ঘটে চৌরী চৌরার সেই ঘটনা। মহাত্মার মনে পড়ে জিন্নার হুঁশিয়ারি। তিনি বুঝতে পারেন যে ওটা নতুন এক জালিয়ানওয়ালাবাগের পূর্বাভাষ। তিনি তার প্রতিকার করতে পারবেন না। তাকে নিবারণ করাই সুবুদ্ধি। মিলিটারির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে জনগণ প্রস্তুত নয়। তিনি তার পরিকল্পনা আপাতত ত্যাগ করেন। কিন্তু অসহযোগ নীতি ত্যাগ করেন না। প্রস্তাবিত বৈঠক বসে না। তাতেও তাঁর অনীহা। বড়লাট তাঁকে জেলে পোরেন। উপলক্ষ কয়েকটা পুরাতন প্রবন্ধ। তিনিও হাসিমুখে কারাবরণ করেন। জিন্না সাহেবেরও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। মালবীয়জীরও। পরে একজন যদি হন মুসলিম লীগের নেতা, তো অপর জন হন হিন্দু মহাসভার নেতা। তাঁদের পরস্পরের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিন্ন হয়। দেশ জুড়ে বয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার। তলিয়ে যায় হিন্দু মুসলমানের একতা। দাঙ্গার পর দাঙ্গা বেধে এমন আগুন জ্বালিয়ে রাখে যে জেল থেকে বেরিয়ে মহাত্মা তাঁর একুশ দিনের অনশনেও কোনো পক্ষের হৃদয় গলাতে পারেন না। দাঙ্গা থামাতে হয় ওই ইংরেজকেই। তার মানে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষকেই নিতে হবে। দায়িত্ব যার ক্ষমতাও তারই। ক্ষমতা যার নেই সে দায়িত্ব নেবে কী করে? অসহযোগও স্থগিত রাখা হয়। সেটা আরেক ডিগবাজি। আমরাও যে যার পথ দেখি।" -

"অত কথা আমার জানা ছিল না, ভাই। আমি ততদিনে সরকারী চাকুরে। তাও আই. এম. এস নয়। আই অ্যাম অ্যাস। আমি একটি গাধা।" শুনে সবাই হো হো করে হাসে।

একথা বলেই ক্যাপটেন একদৌড়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

আবার যখন ক্লাবে দেখা হয় তিনি বলেন, "মল্লিক, আমি ভেবে দেখলুম এই জন্মে আই. এম. এস. হতে হলে আবার মিলিটারিতে যোগ দিতে হবে। আগে থেকেই বোঝাপড়া আছে যে সিভিল থেকে আমি মিলিটারিতে ফিরে যেতে পারি, তবে যুদ্ধ

বাধলে ভারতের বাইরেও যেতে হবে। বিয়ে তো করিনি। আমাকে ঠেকায় কে? ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। কেন একটি মেয়েকে বিধবা করে দগ্ধ হতে দিতুম? চিতার আগুন নয়, একান্নবর্তী পরিবারের ঈর্ষার আগুনে। এক ভাই আই. এম. এস হলে আরেক ভাই বিধবা বৌদিকে জ্বালিয়ে মারত! মানুষটা আমি সাহেব হতে পারি, সমাজটা তো হিন্দু সমাজ। আমাদের আবার পুরনো বনেদী একান্নবর্তী পরিবার। জ্ঞাতিবিরোধে জর্জর। থাকে সবাই একই ছাদের তলায়। কর্তার ছাতার আড়ালে। কিন্তু তলে তলে সেই ষড়রিপুর চক্রান্ত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। বিয়ে করিনি বলেই আমি স্বাধীন। আমি জানি যে যুদ্ধক্ষেত্রেও ডাক্তারকে কেউ মারবে না। জখম হলে শত্রুও তার চিকিৎসায় বাঁচবে। তবে দূর পাল্লার কামানের গোলায় ডাক্তারেরও প্রাণ উড়ে যেতে পারে। আর আকাশ থেকে বোমা পড়লে তো কথাই নেই। সেটারই সম্ভাবনা বেশী। তবু আমি যাবই। আজকেই একখানা চিঠি ছেড়ে দিয়েছি। জানতে চেয়েছি আই. এম. এস কমিশন সরাসরি দেবে কি না। তোমাকে যথাকালে জানাব। তোমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করব। শ্যাম্পেনের স্রোত বইয়ে দেব।"

মানস সকৌতুকে উচ্চারণ করে, "আই সী অ্যাস।"

"তার মানে কী হলো? তুমি যাকে দেখছ সে একটি গাধা। আমারি ঢিল আমারই উপর ছুঁড়ছো। আই অ্যাম অ্যাস?" তিনি খেঁকিয়ে ওঠেন।

"মাফ করবেন, দাদা। আমি যা জানি আপনি তা জানেন না। এবারকার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে বড়লাট স্থির কবেছেন উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসারদের কাউকেই ফ্রণ্টে যেতে দেবেন না। আপনিও একজন উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসার। ফ্রণ্টে আপনি যেতে না পারলেও পদোন্নতি প্রত্যাশা করতে পারবেন। ঘরে বসেই আই. এম এস হতে পারবেন। যাঁদের অবসর নেবার বয়স হবে তাঁদের তো আটকে রাখতে পারা যাবে না। তাঁদের স্থান পূরণ করতে হলে নতুন রিক্রুট সংগ্রহ করতে হবে। বিলেত থেকে তো নতুন কেউ আসবেন না। অগত্যা ভেকেন্সী পূরণ করতে হবে আপনার মতো পুরনো অফিসার দিয়ে। এ লড়াই যদি চার পাঁচ বছর গড়ায় তো আপনারাই পূরণ করবেন। সিভিল থেকে মিলিটারিতে যেতে চান বলে চিঠি লিখতে গেলেন কেন? অবশ্য মিলিটারিতেই ভেকেন্সীর সম্ভাবনা বেশী। তা হলে কিন্তু ফ্রণ্টে যেতে হবে। আপনি কি তার জন্যেও ব্যগ্র?" মানস প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ভাই। এই একঘেয়ে ডিউটি কারই বা ভালো লাগে! স্টেশনটা ভালো।

পদটাও পাকা। আর আমাকে নিচে নামতে হবে না। কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো প্রাইভেট ডাক্তারদেরই একচেটে। উপরি আয় বলতে একে ওকে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যে ফী। সেটা আমি চোখ বুজে সই করিনে। সুস্থ মানুষটাকে অসুস্থ বলে ষোল টাকা পকেটে পুরতে আমার বিবেকে বাধে। বনেদিয়ানায়ও বাধে। কলকাতায় আমাদের যে সম্পত্তি আছে তার একটা হিস্সা তো আমি পাবই। এ টাকা দুই হাতে উড়িয়ে দিলেও ও টাকা তো আমার কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। পেনসন পেলেও আমার টাকার অভাব হবে না। অভাব হবে যেটার সেটা ওই মেজর বা লেফটনান্ট কর্নেল বলে পরিচিতির। আর ওই যাকে বলে আই এম. এস.। এই গাধার ল্যাজ হবে ওটা, আর কান দুটোর নাম হবে লেফটনান্ট কর্নেল কি মেজর। ক্যাপটেন হয়ে আমি মরতে চাইনে। তার আগে আমি ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে ভাব করে ওঁকে ভিজিয়ে সিঙ্গাপুর বা পেনাং কোথাও এক জায়গায় গিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বাঁচব বা শত্রুর হাতে মরব। যদি বন্দী করে তাও সই। ক্লাবটা তো বলতে গেলে সাহেবশূন্য। শেফার্ড কালেভদ্রে আসেন। টেনিসের পর অন্তর্ধান। বার্লো তো ডুমুরের ফুল। শেফার্ডের সহধর্মিণী স্বদেশে বাস করছেন। বার্লোর পুত্র আর তার জননীও সেই দেশে। তবে এখন তিনি আর মিসেস বার্লো নন। বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ হয়েছে। হ্যাঁ, এই স্টেশনে একজন মেমসাহেব আছেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বামী একজন ফরাসী জমিদার। তাঁরা ক্লাবের মেম্বর হলেও কদাচিৎ আসেন, কারণ মেমসাহেব বহুদিন ধরে অসুস্থ। এখন এই সাহেবমেমশূন্য ক্লাবে নাচবেই বা কে, আর নাচতে চাইলে কার সঙ্গেই বা নাচবে? বেগম হায়দারও নাচবেন না, মিসেস বক্সীও নাচবেন না। বলবেন নাচতে জানেন না। আরে, ওটা কি একটা কথা হলো? নাচতে নাচতেই আমি নাচতে শিখেছি। ওঁরাও শিখতেন। বাধছে কোথায়, জানো? অযোধ্যার লোক সীতার মতো সন্দেহ করবে। হ্যাঁ, বুকের পাটা আছে বটে শামসুর রহমানের। দশ বছর আগেও আমি ওকে আর ওর বেগমকে নাচতে দেখেছি। ক্লাবে সাহেব মেমের সঙ্গে। এখানে নয় অবিশ্যি। এখনো আমি সিভিল সার্জন হইনি। কী আমার ক্লেম? আমি যুদ্ধফের্তা ক্যাপটেন আর রহমান তো বিলেতফের্তাও নয়, যুদ্ধফের্তা নয়। সে তখনো পুলিশ সুপার হয়নি। তবু তো একজন আই. পি। তারই মতো আই. পি. ছিল আর একজন মুসলমান। সেও ছিল ক্লাবের মেম্বর। কিন্তু ওর বেগমকে ক্লাবে আসতে দিত না। কেউ কল করলেও কারো সামনে বেরোতে দিত না। অথচ ধর্মের বেলা একান্ত উদার। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। রহমান অতটা নয়। রহমানই বরং কমিউনাল।

ওদের দু'জনের কাছে আমি ঋণী। ওরাই আমাকে ক্লাবের টেনিস কোর্টে ধরে নিয়ে যায়। খেলায় ওস্তাদী দেখে মেম্বর করিয়ে নেয়। কেউ যে আমাকে ব্ল্যাকবল করেনি সেটা বোধহয় ওদেরই তদ্বিরে। পরে আমি তাসেও ওস্তাদী দেখাই। বদলী হয়ে যে স্টেশনেই যাই গিয়ে দেখি আমার আগে আমার ওস্তাদীর খ্যাতি সেখানে পৌঁছেছে। কখন একসময় আবিষ্কার করি আমি নাচতেও পারি। মেমসাহেবরাই আমাকে নাচান। হ্যাঁ, দুই অর্থে। তবে আমি তোমাদের ওই পাতিহাঁসের মতো সীমা ছাড়িয়ে যাইনি। ভুলেও ফ্লার্ট করি'নি। তাই সাহেবের বাচ্চাদের বিষ নজরে পড়িনি। আরে, বাবা, কোথায় লাইন টানতে হয় সেটা যদি না জানো তো শ্বেতাঙ্গ সমাজে মিশতে যাও কেন? বিদ্যার জোরে আই সি এস হয়েছ বলে কি জাতে উঠেছ? ওরাও জাতিভেদ মানে। ওদেরও বর্ণাশ্রম আছে। বর্ণ মানে একজন গৌরবর্ণ ও আরেকজন কৃষ্ণবর্ণ। আমাদের ধর্মেও সেই অর্থে একজন হতো ব্রাহ্মণ, আরেক জন শূদ্র। তেমনি ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য। তাদের গায়ের রং মনে পড়ছে না। বোধহয় লোহিত ও পিঙ্গল।" বলতে বলতে শ্রান্ত হন ক্যাপটেন ল।

লাহা যদি কেউ বলে তিনি চটে যান। কলকাতা যেদিন থেকে ক্যালকাটা, লাহা সেদিন থেকে ল। সেকালের উচ্চারণ লা। কিন্তু বানান ডবল-ইউ দিয়ে। মানস তাঁকে আশ্বাস দেয় যে ইংরেজকে বন্দী করার মতো ক্ষমতা জার্মান ভিন্ন কারো নেই। আর জার্মানও সাবমেরিন দিয়ে সাত সমুদ্র পেরিয়ে সিঙ্গাপুরে আসবে না। আসতে পারে জাপানী। যদি যুদ্ধে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু তা যদি করতে যায় ওরা নিজেরাই জব্দ হবে। অ্যাডমিরাল পেরীর জাহাজ আবার জাপানে গিয়ে হাজির হবে। ওরা ভাবছে নৌশক্তিতে ওরা সমান সমান। তা হলেও মোটের উপর অসমান। কারণ ব্রিটেন আর আমেরিকার মিলিত নৌশক্তি জাপানের দ্বিগুণ। জার্মানীর নৌশক্তি তার সঙ্গে মিলিত হলেও দুই পক্ষের নৌশক্তি অসমান।

দিন কয়েক পরে মানস ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলছে এমন সময় তার খোঁজে আসেন তার দুই সিভিলিয়ান বন্ধু পাকড়াশী আর ঘোষাল। দু'জনেই এখন ডেপুটি সেক্রেটারি, কলকাতায় অধিষ্ঠান। সেখান থেকে মফঃস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। যে যার ডিপার্টমেণ্টের কাজে।

"খেলা কতক্ষণ চলবে?" পাকড়াশী সুধান। "আমরা কি তেষ্টায় গলা শুকিয়ে মরব?"

"মার্কার, পুছো।" বলে মানস সেটটা শেষ করতে অনুমতি চায়।

সেটটা সমাপ্ত হতেই র‍্যাকেটখানা ঘোষালের হাতে দিয়ে বলে, "এবার তুমি খেল্

দেখাও। টেনিস কাকে বলে।" খেলার সাথীদের ডেকে বলে, "ইনি কে, জানেন? স্বনামধন্য টেনিস চ্যাম্পিয়ন বিনোদ ঘোষাল।"

ঘোষাল একটু ওজর আপত্তি জানান। "আমি আজ ফ্যাগড্ ফীল করছি।"

ওই আজব বাংরেজী শুনে সবাই হেসে ওঠেন। জোরজার করে ওঁকে কোর্টে নামানো হয়। তার পর মানস গিয়ে পাকডাশীর সঙ্গে বসে।

"তার পর, স্বামী মানসানন্দ পরমহংস।" পাকডাশী ওকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলেন, "কবে থেকে তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংস হলে? এই যে শুনছি তুমি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ যে এ জীবনে আর কামনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। চাকরিটা অকালে ছেড়ে দিলে কাঞ্চনও আপনি ছেড়ে যাবে। তবে কামনীকে ছাডতে চাইলেও কামিনী নেহি ছোড়তি। না তিনিও একজন সারদামণি দেবী?"

মানস তাজ্জব বনে যায়। "কে এসব রটায়! কে এত খবর রাখে!"

"কেন, যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, উনি এখন সন্ন্যাস নিয়েছেন। কেবল গেরুয়াটা পরেন না এই যা তফাৎ। মাছ মাংস ছেড়েছ, মদও তুমি তেমন কিছু খেতে না, শুধু সঙ্গ রাখার জন্যে এক আধ চুমুক। কিন্তু এ কী কথা শুনি আজ সুফলার মুখে!"

"সুফলা। সুফলা কে?" মানস জানতে চায়।

"আহা, মিসেস বক্সী! তিনি একদিন তোমার ওখানে গিয়ে লক্ষ করে আসেন যে তোমাদের দু'জনের বিছানা দুই আলাদা বেডরুমে। ব্যাপার কী, মল্লিক? জীবনে একটা শোক পেয়েছ, আমাদের সমবেদনা জেনো। কিন্তু তোমার বয়স তো বোধহয় পঁয়ত্রিশও পেরোয়নি, আর ওঁর বোধ করি সাতাশ কি আটাশ। নিজের উপর রিপ্রেসন চালাতে চাও, দেখা যাবে কদ্দিন পারো! কিন্তু ওঁর উপরে চালাতে গেলে একদিন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। কিছু মনে কোরো না, ভাই। তোমার ভালোর জন্যেই বলা। শোকেরও একটা সীমা আছে। সব কিছুর মতো।"

মানস আর হাসি চাপতে পারে না। "সব বিলকুল ঝুট হ্যায়। শুধু সুফলা বক্সী কেন মহিলা আগন্তুকদের সকলের মুখেই সেই একই প্রশ্ন। যুথিকা এক একজনকে এক একটা উত্তর দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করে। সুফলাকে কী বলেছে, জানিনে। কিন্তু প্রকৃত উত্তরটা হচ্ছে এই যে, হঠাৎ একটিকে হারিয়ে ওর মনে ভয় ঢুকেছে। কে জানে আবার কোন্‌টিকে কখন হারায়। তাই দুটিকেই দুই পাশে শোওয়ায়। মেয়েটি তো একবার কেঁদে উঠবেই, একবার জেগে উঠে খেলা করবেই। আমি, বাপু, রাতের ঘুমটা মাটি করতে পারিনে। পরের দিন আদালতে গিয়ে ঢুলব। আলাদা

ঘরে শোওয়া বেশ কিছুদিন থেকে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব নয়, পাকড়াশী।"

"এ ছাড়া আর কী কারণ?" পাকড়াশীর মুখে অবিশ্বাসের ভাব।

"তবে শোন। হিটলার যেদিন চেকোস্লোভাকিয়া নেয় সেইদিন থেকেই আমার রাতে ঘুম নেই। পোলাণ্ড যেদিন আক্রমণ করে সেদিন থেকে আমি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ভাবি, এ যুদ্ধ এইখানেই থামবে না। ইংলণ্ড আর ফ্রান্স তো যুদ্ধ ঘোষণা করবেই, এক এক করে আরো অনেকে সমবেত হবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে। আমি কি শুধু নীরব দর্শক হব? না আমারও একটা ভূমিকা আছে? থাকলে কী সে ভূমিকা? আহার নিদ্রা মৈথুন আর আপিস আদালতের রুটিন। এই কি জীবন! না জীবনের আর কোনো অর্থ আছে? কী সে অর্থ? জীবনের অর্থ কি জীবিকা? আর বিনোদনের জন্যে তাস, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে টেনিস? আমি বারান্দায় পায়চারি করে ভাবি। ঘুম পেলে বিছানায় যাই। দুঃস্বপ্ন দেখি। হিটলার আসছে তেড়ে। ইংরেজ যাচ্ছে ছেড়ে।"

পাকড়াশী হো হো করে হেসে ওঠেন। "ওরে ভীরু, তোমার পরে নাই ভুবনের ভার। তুমি তোমার আপিস আদালতের ভার নিয়েই নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। যা হবার তা হবেই। কেউ রোধ করতে পারবে না।"

"কেন? দিল্লীতে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়? দেশের লোক যদি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরে ভারতের ভার সমর্পণ করে? চল্লিশ কোটি ভারতীয়ই এককাট্টা হয়ে রুখবে।"

"ওটাও একটা স্বপ্ন। দিবাস্বপ্ন। ইংরেজরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে যুদ্ধকালে ওরা ক্ষমতা হাতছাড়া করবে না। বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকটা আসন ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু সেখানেও একমাত্র কংগ্রেসকে নেবে না। মুসলিম লীগকেও নেবে। লীগেরও তেমনি জেদ যে মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ পদগুলোতে একমাত্র লীগ সদস্যদেরই নিতে হবে। নইলে লীগ যোগ দেবে না। যুদ্ধের পরে স্বরাজের দাবী যদি মনজুর হয় তবে সেইসঙ্গে পাকিস্তানের দাবীও মন্‌জুর করতে হবে। মুসলমানদেরকে নেকড়ের মুখে সঁপে দিয়ে যাওয়া চলবে না। ওদিকে গান্ধীরও সমান জেদ যে ওটা আমাদের ঘরোয়া সমস্যা। আমরাই যেমন করে পারি মেটাব। তৃতীয় পক্ষ কেন নাক গলাবে? আর একটা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড তিনি মেনে নেবেন না। তা হলেই দেখছ কোনো পক্ষই কোনো পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবে না। পর্দার আড়ালে গলাকাটা দর কষাকষি চলেছে। এর পরে আসছে বল কষাকষি।

ইংরেজের হাতে আছে আর্মি, গান্ধীর হাতে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স, জিন্নার হাতে দাঙ্গাবাজি। এর মধ্যেই সাগরপার থেকে আরো কয়েক ব্রিগেড সৈন্য আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাতদিনের মধ্যেই সুভাষের সশস্ত্র বিপ্লব আর গান্ধীর নিরস্ত্র বিদ্রোহ ক্রাশ করে দেওয়া হবে। তা যদি হয় জিন্নাকে কিছু না দিলেও চলবে। কংগ্রেসকে যদি কিছু দাও, লীগকেও কিছু দিতে হবে, এই তো তাঁর আর্জি। কংগ্রেসকে কেক না দিলে লীগকেও কেকের ভাগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেক ইংরেজরা নিজেরাই খাবে। নিজেরা খেতে না পেলে বরং জার্মানদের কেড়ে নিতে দেবে, পরে আবার বলবান হয়ে কেড়ে নেবে, ভারতীয়দের দু'চারটে ক্রাম্ব ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবে না। কাজেই তুমি নিয়তির উপর ওসব ছেড়ে দাও। আমরা যা করছি।" পাকড়াশী সৎপরামর্শ দেন।

মানস নীরব থাকে। ইতিমধ্যে ঘোষাল এসে জুটেছিলেন। প্রসঙ্গটার আভাস পেয়ে মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস মন্ত্রীরা অপূর্ব ডিসিপ্লিন দেখিয়েছেন। সবাই একযোগে গদীতে বসেন। সবাই একযোগে গদী থেকে স্বেচ্ছায় নেমে আসেন। এত বড়ো ত্যাগ, এতখানি ডিসিপ্লিন কে কবে দেখিয়েছে! তাও যুদ্ধের মরশুমে। যখন কোটি কোটি টাকা খরচ বা লুট করার মওকা। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে বাহবা দিতে হবে। ওঁরা সত্যিই স্বরাজের যোগ্য। কিন্তু যোগ্যতা প্রমাণ করার পথে এখনো বিস্তর কাঁটা। লীগ তো বাধা দেবেই রাজন্যরাও অবাধ্য হবেন। ওঁদের লক্ষ্য বলকানিস্থান। এঁদের লক্ষ্য পাকিস্তান।

॥ পনেরো ॥

অন্য সময় হলে ওরা মানসের ওখানেই উঠত। কিন্তু ওরা জানে যে মনের দিক থেকে যূথিকা ও মানস এখন প্রস্তুত নয়। পরের দিন ওরা যথারীতি কল করবে ও একসঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবে। তা শুনে মানস বলে, "তা হলে ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল।"

মানসের ওরা বিলেতের সমসাময়িক বন্ধু। তথা কর্মজীবনের সতীর্থ। কিন্তু যূথিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ কদাচিৎ ঘটেছে। এক স্টেশনে কখনো বদলী হয়নি। আলাপটা ঝালিয়ে নিতে চায়।

যূথিকা তো সানন্দে সায় দেয়। ওদের জন্যে ভালোমন্দ নিজেই রাঁধে। অমিষ খেতে আপত্তি। রাঁধতে নয়। অতিথিদের কেনই বা তাদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবে? কিন্তু পানীয় সম্বন্ধে সে আপসবিরোধী। না, ও পাপ ও ঘরে ঢুকতে দেবে না।

"মল্লিক নাকি সারা রাত পায়চারি করে মহাযুদ্ধের কথা ভেবে উতলা হয়?" পাকড়াশী যূথিকাকে সুধায়।

"সত্যি। ওকে নিয়ে কী যে করব ভেবে পাইনে। জোর করে ধরে এনে শুইয়ে দিলেও ঘুমের ঘোরে বকবক করে, পোলাণ্ড! হতভাগ্য পোলাণ্ড! তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি।" যূথিকা হাসে।

"কী করতে পারি।" পাকড়াশী ব্যঙ্গ করে। "ওই পোল ব্যাটারা কি কম বজ্জাত! মাফ করবেন, মিসেস মল্লিক। আমি লোকটা মুখফোঁড়। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি। ভাষাটাও মহিলাদের সমাজে জলচল নয়। আপনি হয়তো মনে আঘাত পেলেন। কিন্তু পোলদের মতো পাজী জাত কি বেশী দেখেছেন? স্বাধীন

হতে না হতেই বিশ লাখ ইহুদীকে দিল খেদিয়ে। ওরাও হুড়মুড় করে জার্মানীতে ঢোকে। যে জার্মানী যুদ্ধে বিধ্বস্ত। অবশ্য নিজেদের বুদ্ধির দোষে। বিসমার্ক তো ওদের পই পই করে বারণ করে গেছেন। খবরদার, ইংরেজের সঙ্গে লড়তে যেয়ো না। নেপোলিয়নের দশা হবে। কায়জারের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। নইলে বিসমার্ককে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়! যে বিসমার্ক জার্মান নেশনের জনক।"

মল্লিক বলে, "তা তোমার ইহুদীরা নিরীহ মেষশাবকটি নয়, পাকড়াশী। জার্মানীতে শরণার্থী হয়ে এসে জাঁকিয়ে বসে। ইহুদীবিদ্বেষ তলে তলে জার্মানদের ভিতরে বহু শতক ধরে কাজ করছিল। কিন্তু নবাগতদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ওদের চোখ টাটায়। তার সঙ্গে নিজেদের অভাব অনটন তুলনা করে ওরা এমন উত্তেজিত হয় যে ইহুদীবিদ্বেষী এক পাগলকে বসিয়ে দেয় বিসমার্কের আসনে। তার পরে সে বিসমার্ককেও ছাড়িয়ে গিয়ে সর্বেসর্বা বনে যায়।"

"আহা, আমি কি বলেছি যে ইহুদীরা নিরীহ মেষশাবক!" পাকড়াশী বোঝায়। "ও ব্যাটারা যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে। ওদের কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু কথা হচ্ছিল পোলদের নিয়ে। এক হাতে তালি বাজে না। পোলরা ইহুদীদের জার্মানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে জার্মানদের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে, এটা যদি মানো তো পোলদের জন্যে তোমার অত দরদ কেন? শুধু পোলদের জন্যে নয়, গোটা ইউরোপের জন্যেই তুমি চিরদিন ভেবে আকুল। বার্লো বা শেফার্ড কেউ তোমার মতো ওদের নিজেদের দেশের জন্যে অত কাতর নয়। একেই বলে মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ!"

"হা হা!" ঘোষাল হেসে ওঠে। "বার্লো রাত জেগে দূরবীণ দিয়ে গ্রহনক্ষত্র দেখেন। আর মানস রাত জেগে মানসিক দূরবীণ দিয়ে পোল জার্মান ফরাসী ইংরেজ দেখে। কিন্তু গ্রেট ওয়ারের আড়ালে যে এক লিটল ওয়ার ব্রু করছে সেদিকে নজর নেই। তুমি কি কাছেরটা দেখতে পাও না, দূরেরটাই দেখতে যাও? না, তোমার ওটা পাশ্চাত্য প্রেমের পরিণতি?"

মানস চমকে উঠে বলে, "তার মানে কী হলো, বিনোদ?"

"না, না, আমি বলতে চাইনি তুমি পশ্চিমে গিয়ে প্রেমে পড়েছিলে। ওটা বাঙালীদের সনাতন স্বভাব। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রীতি মানে ইউরোপের উপর অন্ধ অনুরাগ। সেই অনুরাগ তোমাকে দেখতে দিচ্ছে না যে তোমার নিজের দেশেই, এমন কি তোমার নিজের এলাকাতেই, গৃহযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হিন্দু মুসলমানের লিটল ওয়ার।" ঘোষাল গম্ভীর হয়ে যায়।

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, "আমাদের উকিল সরকারও তার আভাস পেয়ে আতঙ্কিত। তাঁর কথা হলো একপক্ষ কমিউনাল তো বরাবরই ছিল, এখন আরেক-পক্ষও কমিউনাল হয়ে উঠেছে। পরে সে যা হবে তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। পূর্ববঙ্গ যে এতদূর উন্মত্ত হবে তা আমি বিশ্বাস করিনে। আবার মোহিনীবাবুর মতো এমন উকিল আছেন যিনি ওসব ভয়ভাবনা হেসে উড়িয়ে দেন। তাঁর মতে মুসলমানরা হিন্দুদের গভীরভাবে ভালোবাসে। হিন্দুরাও মুসলমানদের। আর দু'পক্ষই বাংলা বলতে, বাংলাদেশ বলতে, বাঙালী জাতি বলতে অজ্ঞান। যত নষ্টের গোড়া অবাঙালী হিন্দু মুসলিম পলিটিসিয়ানরা। ইংরেজরা যদি বাঙালীর হাতে বাংলাকে সঁপে দিয়ে যেত তা হলে দু'দিনেই সব বিরোধ মিটে যেত। এটা আমাদের স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া। দাম্পত্য কলহ। ইংরেজ যে তৃতীয় পক্ষ কে না সেটা জানে? কিন্তু কংগ্রেসও তৃতীয় পক্ষ। মুসলিম লীগও তাই। এর মধ্যে হিন্দু মহাসভা ঢুকে মুসলিম লীগকে আরো বলবান আর কংগ্রেসকে আরো দুর্বল করে তুলেছে! তাই কৃষকপ্রজা দলকে আরো জোরদার করা দরকার। কিন্তু রাজা মহারাজা নবাব নবাবজাদারা কি তাতে রাজী হবেন? শ্রেণীসংগ্রামকে তাঁরা দিতে চাইবেন সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের রূপ। বিপদটা তো সেইখানে।"

"যত সব বাজে কথা।" পাকড়াশী তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। "ভুলে যেয়ো না, মল্লিক, তোমার মতো অসাম্প্রদায়িক অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জুডি-সিয়ারিতে। আর আমাদের মতো অসাম্প্রদায়িক অফিসারদের সেক্রেটারিয়াটে। আমাদের তিনজনের ও আমাদের মতো আরো যারা আছে তাদের কারো প্রমোশন হবে না এটা সুনিশ্চিত। তবে মন্দের ভালো এইটুকু যে ইংরেজ আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়ে যাবে না। আর কোথাও না হোক বিলেতে আমাদের চাকরি দেবে। দিতে বাধ্য। কারণ আমাদের কভেনান্ট সেক্রেটারি অভ স্টেটের সঙ্গে। ওঁর বিরুদ্ধে খাস বিলেতেই আমরা গিয়ে মামলা রুজু করে দেব। সেক্রেটারিয়াটে বসে কলকাতার বড়ো বড়ো কাউন্‌সেলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে পারছি। নইলে ডেপুটি সেক্রেটারি একটা পদ! কোথায় সেই প্রেস্টিজ যা আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গদীতে বসে পেয়েছি! কী করি, বলো। শক্ত হাতে দাঙ্গা না থামালে চলে? বাড়তে দিলে গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করবে না?"

"আরে, আমিও তো সেই কথাই বলতে চেয়েছিলুম। সুপ্রকাশ যা বলেছে তা আমারও কথা।" ঘোষাল বলেন, "কড়া হাতে না থামালে পরে দেখবে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তাতে ইংরেজের কী? তার গায়ে তো আঁচড়টি লাগবে না।

মরবে হিন্দুর ছাওয়াল, মুসলমানের পোলা। গৃহযুদ্ধ কি আমরা কেউ বাধাতে দিতুম, যদি ক্ষমতা থাকত আমাদের কারো হাতে? মুসলিম মন্ত্রীদের আমরা চোখের বালি। আর হিন্দু নেতাদেরও পথের কাঁটা। ওঁদের ধারণা আমরা সবাই দেশদ্রোহী, তাঁরা সবাই দেশভক্ত। আরে বাবা! রাজনীতির খেলায় তোমরা ধুরন্ধর হতে পারো, কিন্তু প্রশাসনের বেলায় তোমরা শিশু ভিন্ন আর কিছু নও। ইংরেজ কি দেশকে অরাজক হবার আগে স্বরাজ দিয়ে যাবে? সেই দেশব্যাপী অরাজকতার দিন কারা তোমাদের বাঁচাবে? তোমাদের চোখ কান কারা? হাত পা কারা? এ তত্ত্ব বোঝেন রাজগোপালাচারীর মতো বিচক্ষণ ও বহুদর্শী নেতা। বোঝেন না নেহরুর মতো ব্রীফলেস ব্যারিস্টার, যিনি আই. সি. এস. হতে না পেরে তখন থেকেই প্রতিশোধের দিন গুনছেন।"

"না, না। ওটা ঠিক নয়, বিনোদ। নেহরুর ত্যাগশক্তির সীমা নেই। দেশ যাঁকে ভালোবেসে রাজার আসনে বসাবে আমরা তাঁর কাছেই আনুগত্যের শপথ নেব। যদি তিনি আমাদের অভয় দেন যে আমাদের চাকরিও যাবে না, প্রমোশনও আটকাবে না। আসলে হয়েছে এই যে গান্ধীজী যেমন ভালোমানুষ, নেহরুজীও তেমনি ছেলেমানুষ। যাঁদের সঙ্গে এঁরা তাস খেলতে বসেছেন তাঁরা দু'জন ঝানু খেলোয়াড়। ব্রিজ খেলায় একজন আরেকজনের ডামি। যেমন তুখোড় লিনলিথগাউ তেমনি তুখোড় জিনা। হ্যাঁ, বিলিতী উচ্চারণ জিনা। দুটি ব্যাটাই বদ্।" এই বলে পাকড়াশী জিব কাটে। "মাফ করবেন, মিসেস মল্লিক।"

"জিন্নাকে তুমি জিনা বলতে পারো, কিন্তু ডামি বলছ কোন্ আক্কেলে? বলতে পারতে বড়লাটই জিন্নার ডামি।" ঘোষাল অনুযোগ করে।

"আমি বলেছি একজন আরেকজনের ডামি। তার মানে কখনো বড়লাটের ডামি জিনা, কখনো জিনার ডামি বড়লাট। কখনো নৌকোর পিঠে গাড়ী, কখনো গাড়ীর পিঠে নৌকো। তবে ইংরেজদের শুভবুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। ও ব্যাটারা বাহুবলে ভারত শাসন করছে এটা আমাদের নেতাদের ভুল। করছে বুদ্ধির বলে। বুদ্ধি যে সব সময় দুর্বুদ্ধি তা নয়। বিপদ কালে সুবুদ্ধিও হতে পারে। গতবারের যুদ্ধে বড়লাট স্মরণ করলেন কাকে? ওই গান্ধীকে। বড়লাটের প্রস্তাবের সমর্থন করলেন কে? ওই গান্ধী। কই, তখন তো আর কাউকে মনে পড়েনি? না মডারেটদের, না মুসলমানদের? সেইরকম বিপদ যদি আবার ঘনিয়ে আসে, যদি দূরে বহুদূরে টেমস নদের তীরে নয়, সেন নদীর তীরে নয়, কাছে আরো কাছে? তখন আবার মনে পড়বে ওই ভালোমানুষ গান্ধীকেই। ছেলেমানুষ নেহরুকেও। লর্ড

আরউইনের নতুন নাম লর্ড হ্যালিফাক্‌স। আর লর্ড রোন্‌ল্‌ড্‌শের নতুন নাম লর্ড জেটল্যাণ্ড। এঁদের দু'জনেরই এখন আরো বেশী প্রতিপত্তি। এঁরা জানেন কখন কার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হয়। এঁরা হলেন কবিগুরু যাঁদের বলেছেন বড়ো ইংরেজ। জাতটা সত্যিই বড়ো। গ্রেট ব্রিটেন সত্যিই গ্রেট। ওরা গ্রেট না হলে এতদিন ধরে এত বড়ো একটা সাম্রাজ্যকে একমুঠো সিভিলিয়ান দিয়ে শাসন করতে পারত না। এখনো ব্রিটিশ জাস্‌টিসের উপর ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আছে। হাইকোর্টে সুবিচার হয়, নয়তো প্রিভি কাউনসিল তো আছেই। কবে, কোন্‌ যুগে ছিল এমন সুবিচার ?" পাকড়াশী গুণগান করে বড়ো ইংরেজের।

"তা হলে তুমি জুডিসিয়ারিতেই থেকে যাও, মল্লিক।" পরামর্শ দেয় ঘোষাল। "যথাকালে হাইকোর্টে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"না, ভাই। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি প্রথম সুযোগেই অপসরণ করব। যদি মহাযুদ্ধের মাঝখানে ক্ষুদ্রযুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লব বাধে আমি কাউকে গুলীও করতে পারব না, ফাঁসীও দিতে পারব না। জেলায় থাকলে এ দায় আমার ঘাড়ে চাপবেই। তোমরা এসব অপ্রিয় কর্তব্য থেকে বেঁচে গেছ। তাতেও সন্তুষ্ট নও। তা বলে আমি যে জেলা থেকে সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে দিস্তা দিস্তা নোট লিখতে পেলে ধন্য হব তাও নয়। আমি চাই এমন কিছু লিখতে যা আমার অন্তরের কথা, যা না লিখে আমার মুক্তি নেই, যা লিখতে পেলেই আমি ধন্য। যা নোট নয়, রিপোর্ট নয়, রায় নয়, অর্ডার নয়। যাতে আমাকে অমৃত না করবে তা নিয়ে আমি কী করব !"

"তার মানে তুমি এস্‌কেপিস্ট।" পাকড়াশী বলে। "ওটা মহত্বের লক্ষণ নয়। আমি হলে গুলীও করতুম, ফাঁসীও দিতুম, যেমন করে পারি লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে কয়েক শো বদমায়েসকে পিষে মারতুম। তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তারা গুণ্ডা। তারা সমাজের শত্রু। তারা দেশের মিত্র বা ধর্মের মিত্র হতে পারে না। তারা যদি নাই পেয়ে মাথায় ওঠে তবে সর্বনাশ হবে। তেমন স্বরাজ নিয়ে আমরা করব কী ? তেমন পাকিস্তানই বা কার কোন্‌ কাজে লাগবে ?"

"যদি পাকিস্তান হয় !" ঘোষাল আপত্তি করে। "তুমিও যেমন। কে চায় পাকিস্তান ! ওটা কি' জিন্না সাহেবের সত্যিকার দাবী ? আমাকে কী দেবে দাও, না দিলে আমি পাকিস্তান চাইব। শাদা কথায়, গোটা কেকটা তোমরাই খাবে সেটি হবে না, গান্ধী নেহরু ! আমাকেও ভাগ দিতে হবে। আমি যদি রাজত্বের ভাগ পাই তবে রাজ্যের ভাগ চাইব না। আমিও শাহ্‌জাহানের আরেক ছেলে। ভাগ

না পেলে বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে লড়ব। পাকিস্তান হবে না, যদি আমাকে পার্টনার করে নাও। হয় পার্টনারশিপ, নয় পার্টিশন। কড়া হাতের শাসন এর উত্তর নয়, সুপ্রকাশ। তোমাকে আপসের চেষ্টা করতে হবে।"

"তার মানে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বিসর্জন দিতে হবে। কী অপরাধ ওঁদের! ওঁরা কি মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হননি? ওঁরা কি কারো চেয়ে কম জেল খেটেছেন, সম্পত্তি হারিয়েছেন? আঠারো বছর দুর্ভোগের পর যদি একটু সুদিনের মুখ দেখে থাকেন সেটা কি তাঁদের প্রাপ্য পুরস্কার নয়? তাও তো কংগ্রেসের আহ্বানে পদত্যাগ করে জেলের দিকে পা বাড়িয়েছেন আবার। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলতে কি এঁদেরও বোঝাবে না, বোঝাবে শুধু লীগপন্থী মুসলমানদের? কেন, ফজলুল হক, সিকন্দর হায়াৎ খান্, আল্লা বক্স, এঁরা কী দোষ করলেন? ব্রিটিশ সরকার তো এঁদের দলগুলিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই স্বীকৃতি খারিজ করবেন কী কারণে? জেদ, জেদ ছাড়া জিনার আর কোনো যুক্তি নেই। আর যা আছে তা বিলেতের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত। জিনার শর্তে রাজী না হলে ব্রিটেনের সঙ্গে কংগ্রেসের ফাইনাল সেটলমেণ্ট হবে না। জিনাকে পার্টনার না করলে কংগ্রেসকে ভারতের সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের পরিচালনা ভার দেওয়া হবে না। কংগ্রেস যদি সেই মর্মে আপস করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল হানবে। আমি বলবার কে? আমাকে পোছে কে? আমি তো সরকারী চাকরি করছি বলে দেশদ্রোহী। জানো তো, টেররিস্টরা আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল?" পাকড়াশী আবেগের সঙ্গে বলে।

"ওরা তো শুধু হুমকি দিয়েছিল। মারেনি তো। আর এরা কী করেছিল, জানো? কংগ্রেসী হিন্দুরা আমার নামে বদনাম রটিয়েছিল যে আমি নাকি ওদের লাথি মেরেছি, চাবকেছি, ঘর ভেঙে দিয়েছি। বদনাম রটানোও কি খুন করার চেয়ে কিছু কম? চরিত্রহত্যাও একপ্রকার হত্যা। অহিংস হত্যা!" ঘোষাল তার আবেগ হাসি দিয়ে ঢাকে।

মানস এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, "যেতে দাও। যেতে দাও। পাবলিক লাইফে এলে অমন অনেক বদনাম, অমন অনেক হুমকি হজম করতে হয়। ওরাই একদিন তোমাদের মূল্য বুঝবে। তোমাদের সাহায্য চাইবে। তখন তোমরা নোবল রিভেঞ্জ নেবে।"

যূথিকা না শোনার ভাণ করছিল। বলে, "ও প্রসঙ্গ থাক। এখন একটু সংসারের কথা হোক। মিসেসরা কেমন আছেন? ছেলেমেয়েদের খবর কী?"

"ওসব জানতে চেয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন? আপনাদের তিন ছেলেমেয়ে। একটিকে হারালেও তবু তো দুটি থাকে। আমাদের ওই একটিই সবে ধন নীলমণি! যখনি বলি, আরেকটি হলে ভালো হতো না? তখনি শুনি, মিনু ঘোষালের যদি না হয় আমার কেন হবে! আহামরি, কী যুক্তি! শুনতে পাই মিনু ঘোষালও বলেন, রমি পাকড়াশীর যদি না হয় আমার কেন হবে? মহিলারা আজকাল তলে তলে একটা প্যাক্ট করেন না তো?" পাকড়াশী রসিকতা করে।

"কই, আমি তো কারো সঙ্গে সে রকম কোনো প্যাক্ট করিনি।" যূথিকা হাসে। "আমার মনে হয় ওটা একরকম বিউটি ইনশিওরান্স। রূপযৌবন অক্ষুণ্ণ রাখার উপায়। এক একটি বাচ্চা এসে এক এক গণ্ডা বয়স বাড়িয়ে দেয়। কুড়িতেই বুড়ি।"

"বেয়াদবি মাফ করবেন, আপনাকে দেখলে কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়। আমার উনিই বরং বিউটি ইনশিওরান্স করতে গিয়ে চড়া প্রিমিয়াম গুনছেন।" পাকড়াশী লোকটা মুখফোড় বলে মুখফোড়। একেবারে ঠোঁটকাটা।

"থাক, থাক। অমন কথা মুখে আনতে নেই। উনি যদি শুনতে পান বিষম রাগ করবেন। একবার যে মা হয়েছেন এটাও কি কম ত্যাগস্বীকার! ভুলে যাচ্ছেন কেন যে মা হতে গিয়ে আমরা যমের মুখোমুখি হই। আপনাদের কী! বৌ মারা গেলে আর একটি বিয়ে করবেন। বৌ বুড়ি হলেও আর একটি বৌ আনবেন।" যূথিকা বলে।

"এই হলো মহিলাদের চিরকালের অভিযোগ।" ঘোষাল বলে।

"এ যুগে তাঁদেরই জিৎ। তাঁরা যদি মা না হতে চান কে তাঁদের বাধ্য করতে পারে? শেষ তাসখানা তো তাঁদেরই হাতে। পুরুষ এখানে অসহায়। বহুবিবাহ এখনো পুরুষের হাতের পাঁচ, কিন্তু সব ক'টা বৌ যদি তলে তলে প্যাক্ট করে তো বহুবিবাহের ফলে বহু সন্তান হবে না। আমরা পুরুষরাই তখন ব্রত মানত ষষ্ঠীপূজা করব। তাতেও কি ফল হবে!" পাকড়াশী ফোড়ন দেয়।

মানস কোনো মতে অশ্রু সম্বরণ করে বলে, "যাকে বাঁচাতে পারিনে তাকে পৃথিবীতে আনতে যাই কেন? তাতে তারও দুঃখ, তার মায়েরও দুঃখ, তার বাপেরও দুঃখ। যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো। বেশী চাইতে নেই। পেলে হারাবার ভয়ও বাড়ে। নারীর রূপযৌবনের ইনশিওরান্সটা মিথ্যে আশ্বাস। দশটি সন্তানের জননীকেও রূপসী যুবতীর মতো দেখতে। মা না হয়েও কেউ কেউ অকালে বুড়ি। এর রহস্য আমার জানা নেই। বোধহয় আছে একরকম তন্ত্রমন্ত্র বা

জড়িবুটি। মেয়েরাই মেয়েদের কাছ থেকে পায়। ব্যাপারটা পুরুষদের কাছে ফাঁস করে না। নিজের চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি পঞ্চাশ বছর বয়সেও চিরযুবতী। রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'। আমরা কতটুকুই বা জানি!"

পাকড়াশী কারো কোন কথা শুনবে না। এমন অবুঝ! "আমি কেবল সেই নারীকেই শ্রদ্ধা করি যে বহুসন্তানবতী। যেমন আমার মা কাকিমা মাসিমা পিসিমা মামিমা। আমি মানসের মতো ফেমিনিস্ট নই। অথচ মজা ত্থাখ, নিজেই তিনটি সন্তানের বাপ হয়ে বসে আছে। বৌকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে।"

হাসির ধুম পড়ে যায়। মানস বলে, "আমি কিন্তু সব নারীকেই শ্রদ্ধা করি। যে মা হয়েছে তাকেও। যে মা হয়নি তাকেও। যে একসন্তানবতী তাকেও। যে বহুসন্তানবতী তাকেও। নারীকে শ্রদ্ধা করি তার নারীত্বের জন্যে। মাতৃত্ব তো উপরন্তু। সেই উপরন্তু সকলের বরাতে জোটে না। কেউ অকালে বিধবা হয়। কেউ বিনা দোষে বন্ধ্যা হয়। তা বলে শ্রদ্ধার পাত্রী হবে না কেন? বৈষ্ণবদের আরাধ্য রাধা। শাক্তদের আরাধ্য শ্যামা। এঁদের কারো সন্তান ছিল বলে ধর্মগ্রন্থে লেখে না। তা বলে কি এঁরা কম ভক্তি পান!"

"তা যদি বলো, উমার ওই একটিই গর্ভজাত সন্তান, গণেশ। কার্ত্তিকের জন্ম ছয় বোন কৃত্তিকাদের গর্ভে। কুমারসম্ভব পড়েছ?" ঘোষাল জিজ্ঞাসা করে।

পাকড়াশী মাথা নাড়ে। "আমি বিজ্ঞানের ছাত্র।"

"আমি আর্টসের ছাত্র! আমার অন্যতম বিষয় ছিল সংস্কৃত। তা হলে শোন। শিবের প্রথম পক্ষ সতী নিঃসন্তান। আর তাঁর তৃতীয় পক্ষ গঙ্গা। তাঁরও সন্তান হয়নি। পার্বতীর তো ওই একটিমাত্র সন্তান, গণেশ। তা হলে তোমার আমার পত্নীদের কাছে আর প্রত্যাশা না করাই ভালো।" ঘোষাল বলে।

"প্রত্যাশা কাকে বলছ, ভাই? ওটা যে অলিখিত শর্ত। বাপ আর মা মিলে দুই। ছেলে আর মেয়ে মিলে দুই। দুইয়ের জায়গায় দুই। দুইয়ের জায়গায় এক হলে হিসেব মিলবে কী করে? জনসংখ্যা অর্ধেক কমে যাবে। কয়েক পুরুষ বাদে শূন্যে ঠেকবে। এ রকম সিদ্ধান্ত কি এককভাবে নেওয়া যায়? অবলারা হঠাৎ প্রবলা হয়ে উঠে কী যে বিপ্লব বাধাতে যাচ্ছে তার ফলাফল কেউ খতিয়ে দেখেছে কি?" পাকড়াশী উত্তেজিত হয়।

"লোকটা রসকষবর্জিত।" ঘোষাল হেসে উড়িয়ে দেয়।

"তর্কে পরাস্ত হলে সকলেই ঘোড়ার মতো হাসে। বলো, আমার যুক্তি কোনখানে ভুল?" পাকড়াশী চেপে ধরে।

"যুক্তি তোমার সম্পূর্ণ নির্ভুল। কিন্তু যুক্তিটাকে প্রয়োগ করবে কী করে? অনিচ্ছুক নারীর বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে কনজুগাল রাইটের মামলা দায়ের করবে? তাতেও কি এর কোনো প্রতিকার আছে? বৌকে ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শোওয়াতে পারা যায়, কিন্তু মা হতে বাধ্য করা অসম্ভব। সভ্য মানুষ এখানে পরাজিত। বর্বর হয়তো হত্যার ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে। তাকে আদালতেও যেতে হয় না। কিন্তু তুমি আমি বর্বর নই। আর একটা উপায় অবশ্য হিন্দু বলে তোমার হাতের পাঁচ। বৌকে বলতে পারো, এই চললুম বর-বর খেলা খেলতে। আবার বর হতে। তোমার তো ছেলে হলো না। ছেলে না হলে বংশরক্ষা হবে কী করে? পাকড়াশী বংশ কি নির্বংশ হবে! তা শুনে বৌ বেচারি ভয় পেয়ে আবার মা হবার ঝুঁকি নেবে। হয়তো আঁতুড়ঘরেই পটল তুলবে। সুপ্রকাশ, ইজ ইট ওয়ার্থ হোয়াইল?" ঘোষাল টিপে টিপে হাসে।

"তুমি আমাকে বলেছ রসকষবর্জিত। আমি তোমাকে বলব স্ত্রৈণ। ওর বাড়া গাল নেই।" পাকড়াশী বিজেতার মতো বুক ফোলায়।

"বলো, বলো, যা মুখে আসে বলো। কিন্তু এটাও মনে রেখো যে বাইরে তুমি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারো, ঘরে কিন্তু তুমি নারীমুখাপেক্ষী। সেখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়, কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাইনে। ক'টি সন্তান হলো, আদৌ হলো কি না এসব ভেবে সময় নষ্ট না করে এক সেট টেনিস খেলা ভালো। স্ত্রীর কাছে আমি সব খেলায় পরাজিত হতে রাজী, শুধু টেনিসে নয়। তোমার মনে খালি বাজছে, তুমি পরাজিত। তুমিও একটি ক্ষেত্রে অপরাজিত। আমাদের সকলের মধ্যে তুমিই হচ্ছ দীর্ঘতম। তা বলে দীর্ঘতমা ঋষি হতে যেয়ো না।" ঘোষাল হেসে ওঠে।

দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান জানতে চাইলে ঘোষাল বলে, "সে এক দীর্ঘ উপাখ্যান। সংক্ষেপে শোনাচ্ছি।"

দীর্ঘতমা ধার্মিক ও বেদজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও যত্রতত্র সঙ্গম করার জন্যে প্রতিবেশী ক্রুদ্ধ মুনিগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। তাঁর স্ত্রীও অন্ধ স্বামীকে ভরণ পোষণ করতে অস্বীকার করেন। পুত্ররা মাতার আদেশে তাঁকে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেন। সেকালে সন্তান উৎপাদনের জন্যে নিয়োগ প্রথা ছিল। বলিরাজা তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান ও নিজের রানী সুদেষ্ণাকে তাঁর শয্যায় যেতে বলেন। রানী নিজে না গিয়ে দাসীকে পাঠান। অন্ধ তো তফাৎ বুঝতে পারেন না। দাসীর গর্ভেই একাদশ পুত্রের জন্ম দেন। তা শুনে রাজা আবার রানীকে ঋষির শয্যায় পাঠান। এবার

রানীর গর্ভে পাঁচটি পরাক্রান্ত পুত্র হয়। পাঁচজনের নামে পাঁচটি দেশ নামাঙ্কিত হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

পাকড়াশীর তো মুখ চূণ। "আমি টেনিস খেলিনে। ডুয়েল লড়ি।"

যূথিকা বুঝতে পারে যে এর পরে হয়তো হাতাহাতি বেধে যাবে। সে শান্তিজল ছিটিয়ে দেয়। "ছি! এই সামান্য কথায় কেউ ডুয়েল লড়ে? একটি ছেলে কি মেয়েকেই আজকাল মনের মতো করে মানুষ করা এত শক্ত যে দুটির দায়িত্ব নিতে কেই বা সহজে রাজী হয়? কিন্তু দুটি না হলে খেলার সাথী জোটে না। খেলার সাথী না জুটলে একা একা থাকতে হয়। তাতে চরিত্রের ঠিকমতো বিকাশ হয় না। তা হলে খুব কম বয়সে নার্সারি স্কুলে পাঠাতে হয়। কোথায় মেলে তেমন স্কুল? আমরা দুটিই চেয়েছি। দুটিই যখন পেলুম তখন দেখলুম দুটিই ছেলে, মেয়ে একটিও নয়। মেয়ে না হলে ঘর আলো হয় না। তাই মেয়েও চাইলুম। বিধাতা সে বাসনা পূরণও করলেন। তখন কি জানতুম যে সমতা রাখার জন্যে একটি ছেলেকে ফিরিয়ে নেবেন? জানলে হয়তো মেয়ে চাইতুম না। তাই বা কেমন করে বলি! মণিকা আমার দু'চক্ষের মণি।'

ঘোষাল এবার রসিকতা করে বলেন, "সাবধান, মিসেস মল্লিক। মিনু যদি মণিকে দেখতে পায় এখন থেকেই আপনার সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতাবে। ওর ছেলের জন্যে ও এখন থেকেই বৌ খুঁজতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে রমি পাকড়াশীর সঙ্গেও বেয়ান সম্পর্ক পাতানো হয়ে গেছে। সেই সুবাদে সুপ্রকাশ আমার বেয়াই। বেয়াইতে বেয়াইতে ডুয়েল। তামাশা মন্দ নয়। তবে বেয়ানদের সাক্ষাতে হওয়া চাই।"

পাকড়াশী ঠাণ্ডা হয়ে বলে, "তা হলে তুমি কথা ফিরিয়ে নাও। আমি বর্বর, আমি দীর্ঘতমা। আমি যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়াই। এসব কী কথা!"

"কবে বলেছি যে তুমি দীর্ঘতমা? আমি বরঞ্চ বলেছি দীর্ঘতমা হতে যেয়ো না। তুমিই আমাকে বলেছ স্ত্রৈণ। যার বড়ো গাল নেই। কিন্তু আমি তো মনে করি ওটা নিন্দার কথা নয়, প্রশংসার কথা। মিনুকে শোনালে ও কত খুশি হবে! আমি খেলোয়াড় মানুষ। সব কিছু আমি খেলোয়াড়ের মতো নিই। ডুয়েল যদি লড়তে বলো, খেলোয়াড়ের মতোই লড়ব। টেনিস র‍্যাকেট হাতে। সিঙ্গলস খেলবে আমার সঙ্গে?" ঘোষাল চ্যালেঞ্জ করে।

"না, টেনিস র‍্যাকেট হাতে নয়। তবে ব্রিজের টেবিলে খেলতে পারি। চড়া স্টেকে। মল্লিক আর মল্লিকা, তোমরাও খেলবে নাকি? তাস ঘরে আছে? বিনোদকে আজ আমি দেউলে করে ছাড়ব।" পাকড়াশী চ্যালেঞ্জ করে।

"বিনোদের পার্টনার যে হবে তাকেও। কে অমন প্রস্তাবে রাজী হবে!" মানস যুথিকার দিকে তাকায়।

"আমি রাজী। আমার খেলার পার্টনার যদি জেতেন তো আমিও জিতব। তাতে আমার বাড়ীর পার্টনার হেরে গিয়েও জিতবেন। আর আমার খেলার পার্টনার যদি হারেন তো আমিও হারব। সে হার পুষিয়ে দেবে আমার বাড়ীর পার্টনারের জিৎ। কারো পকেট থেকে কিছু যাবে না, কারো পকেটে কিছু আসবে না।" এই পর্যন্ত বলে যুথিকা কথা ঘুরিয়ে নেয়। বলে, "কিন্তু আমরা যে স্টেক রেখে খেলা ছেড়ে দিয়েছি।"

পাকড়াশী উঠে দাঁড়ায়। "চলো হে চলো, বিনোদ। ক্লাবে গেলে এখনো ব্রিজের টেবিলে জনা দুই পার্টনার মিলবে। তোমাকে আজ আমি হারাবই হারাব।"

"বেশ, চলো। কিন্তু আমার পার্টনার যদি হন ক্যাপটেন ল তোমার এ গুমোর ফাঁস হবে।" ঘোষালও বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

পরের দিন টেনিসে আবার দেখা হলে মানস জানতে চায় ব্রিজ খেলার খবর। ঘোষাল বলে, "আমরা গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। ক্লাবের দুয়ার বন্ধ। তখন সারকিট হাউসে গিয়ে যে যার ঘরে ঢুকি। সকালে উঠে সব ভুলে যাই।"

"আমারও কি মনে আছে? অমন কত হয়।" পাকড়াশী বলে।

মানস জানতে চায় স্বপ্রকাশ হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন। তুচ্ছ কারণে কেই ডুয়েল লড়ে?

"ছাখ, মল্লিক, তোমার কাছে যা তুচ্ছ আমার কাছে তা তুচ্ছ নাও হতে পারে। ধড়াচূড়া আমার একেলে, স্যুট আমার বানায় অ্যাসকুইথ অ্যাণ্ড লর্ড, কিন্তু মানুষটা আমি সেকেলে। ওই ব্যাটা হিটলারকে যদিও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি তবু ও ব্যাটা যা বলেছে তা লাখ কথার এক কথা। কিরখে, কুখেন উণ্ড কিণ্ডেরগার্টেন। গির্জে, কিচেন আর নার্সারি! এই তিন হলো নারীজাতির স্বরাজ্য। এর বাইরে তাদের পররাজ্য। এর খাঁটি বাংলা হচ্ছে মন্দির, রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর। এই তিন নিয়ে যারা আছে তারাই আমার আদর্শ নারী। এইজন্যেই মিসেস মল্লিককে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার আর বিনোদের দুই রূপসী নবযুবতীকে পারলে বন্দী করতুম। আমরা অক্ষম। আমরা কাপুরুষ। আমার মা আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, বৌমার আর একটি হয় না কেন? আমি এর কী উত্তর দিতে পারি? বলতে পারতুম বৌমাই জানে। সাহসে কুলয় না। বলি, ভগবান জানেন। মা আমার সেকেলে মানুষ। এখানে ওখানে সেখানে মানত করে বেড়ান। ষষ্ঠীব্রত

করেন। নাতনি হয়েছে, কিন্তু সে পরের বাড়ী চলে যাবে। নাতি চাই। সে স্বর্গে দেবে বাতি। বেচারি মা আর কদ্দিন বাঁচবেন! রূপবতীর কি সেদিকে হোঁশ আছে। অথচ বিনোদ কিনা ওর নবযুবতীর পক্ষ নিয়ে আমাকে অপ্রস্তুত করছে। আমি যদি বলে থাকি স্ত্রৈণ এমন কী অন্যায় করেছি? কোদালকে কোদাল বলা কি অন্যায়? তর্কে হেরে গিয়ে ও এক গল্প ফেঁদে বসেছে। আমি কিনা দীর্ঘতমা ঋষি।" পাকড়াশী উপরে উপরে ক্ষুব্ধ হলেও ভিতরে ভিতরে পুলকিত।

"ওঃ এই কথা!" মানস ওকে প্রবোধ দেয়। "কী করবে বলো? ওটা যুগধর্ম। যে নারীকে আমরা সব দেশেই জেগে উঠতে দেখছি সে নারীকে ইংরেজীতে বলে নিউ উওম্যান। সে নারী ঘর নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বাইরেকেও তার চাই। সেও ক্লাবে যাবে, আফিসে যাবে, খেলার মাঠে যাবে, আকাশে উড়বে, সমুদ্রে সাঁতার কাটবে, নির্বাচনে ভোট দেবে, জিতলে মন্ত্রী হবে। শুনছি সোভিয়েট রাশিয়াতে নাকি ওরা যুদ্ধক্ষেত্রেও যায়, রাতের বেলায় সঙ্গ দিতে নয়,—সেটা তো হোমারের যুগেও ছিল,—চিত্রাঙ্গদার মতো শত্রুর সঙ্গে শস্ত্র হাতে লড়তে। মারতে ও মরতে। এই যে নিউ উওম্যান একে তুমি হিটলারী অনুশাসন জারি করে ঘরে ফেরাতে পারবে না। যদি না সে আপনা থেকে নীড়ের বন্ধন মানে। যূথিকাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু সে হচ্ছে সেই দেবী যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। তা না হলে সেও নব্য নারী। সে সনাতনী নয়। সে বিংশ শতকেরই কন্যা। যেমন তোমার উনি বা বিনোদের তিনি। সুপ্রকাশ, তুমিও মেনে নাও, যেমন মেনে নিয়েছে বিনোদ। দেখবে ফল ভালোই হবে। যথাকালে।" ইতি মানস।

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু যথাকাল যে কতকাল তা আমার মাকে কে বোঝাবে? বা বিজনের মাকে? সেই বৃদ্ধার সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনিও জানতে চান, হাঁরে, আমার বৌমার আর হচ্ছে না কেন? বিনোদের মা নেই, তাই রক্ষে! এটা হলো শাশুড়ী জাতির সাধারণ জিজ্ঞাসা। যেমন মৈত্রেয়ী গার্গীদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থ সুপ্রকাশ।

মানস বলি-বলি করে বলতে পারে না যে কোনো কোনো নব্য নারীর বেলা অঘটনও বার বার ঘটে। সেটা অবশ্য পরের মুখে শোনা।

॥ ষোল ॥

কংগ্রেস মন্ত্রীদের এক ধার থেকে পদত্যাগের পর হামিদ বলেন মানসকে, "আপনারা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন ?"

"পালিয়ে গেলুম আমরা !" চমকে ওঠে মানস। "এর মানে কী, হামিদ ?"

"আহা, আপনারা মানে কি আপনি আর মিসেস মল্লিক !" হামিদ বুঝিয়ে বলেন, "আপনারা মানে কংগ্রেসমন্ত্রীরা। পালিয়ে যাওয়া মানে শাসনকার্য ছেড়ে বনবাসে যাওয়া। কী দরকার ছিল এই মহাপ্রস্থানের ? এটা কি জিন্না সাহেবের ভয়ে, না বোস বাবুর ডরে ?" সুভাষচন্দ্রকে তিনি বলতেন বোসবাবু।

মানস সামলে নিয়ে বলে, "তাই বলুন। আমি তো ভেবেছিলুম আমরাই আবার ইলোপ করেছি। হা হা হা হা ! আরে ভাই, ওসব আপনাদের বয়সেই সাজে। আমরা এতদিনে ঘোরতর ঘরপোষা। যাকে বলে ডোমেস্টিকেটেড।"

হামিদ জানতেন না মল্লিক দম্পতীর পরিণয় কেমন ভাবে হয়েছিল। তাঁর নিজের বিবাহ হয়েছে বিশুদ্ধ শরীয়তী মতে। গুরুজনের নির্বন্ধে। ভাগ্যে হয়েছিল, তা নইলে ওঁকেও মুশকিলে পড়তে হতো ওঁর সতীর্থ ইমতিয়াজ মির্জার মতো। ইমতিয়াজ হলেন খানদানী পাঞ্জাবী মুসলমান। চেহারা দেখে মালুম হয় সেকালের গ্রীকদের বংশধর। গৌরবর্ণ সেই সুপুরুষের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণা বঙ্গকন্যার সাদী দিতে সাধ বেগম জাফর হোসেনের। তাঁর বিশ্বাস মুসলমানমাত্রেই এক জাতি। ইসলাম যে জাতিভেদ মানে না।

বেগমের দাদার সঙ্গে রাজশাহীতে থাকতে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সুবাদে মানসকেও বেগম বলতেন ভাই। একদিন বিশ্বাস করে বলেন, "আমার মনের সাধ কি মিটবে না ? মির্জার সঙ্গে কি রোকেয়ার হতে পারে না ? কেন হতে পারে না ?"

মানস কী করে বোঝাবে যে বাঙালী মুসলমানদের হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী মুসলমানরা অন্তরের সঙ্গে অবজ্ঞা করে। যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ইংরেজরা। মানসও যেহেতু বাঙালী সেহেতু ওঁদের বাক্যবাণ তারও গায়ে বেঁধে। বেচারারা মুসলমান বলে নয়। বাঙালী বলেই অবজ্ঞেয়। বাঙালীরা নাকি মার্শাল রেস নয়। যোদ্ধা জাতি নয়। তবে, হ্যাঁ, বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের ওঁরা জুজুর মতো ডরান। ভয় থেকে আসে ভক্তি। সুভাষচন্দ্রকে ওঁরা ভক্তি করেন। গান্ধীজীকে মনে করেন দুর্বল বলেই অহিংস। এক হামিদ বাদে। হামিদ নিজে চরকা কাটেন, কেউ ভিক্ষা চাইতে গেলে তাকেও কাটান। খাদির উপরে তাঁর আস্থা আছে। কিন্তু অহিংসার উপরে নেই। তাই তিনি খাকসার হয়েছেন। পাঠান বলে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের থেকে তিনি ভিন্ন।

মানসের চার মুসলিম সহকর্মীর মধ্যে একজন তো বাঙালী, আরেকজন হিন্দুস্থানী, তৃতীয়জন পাঞ্জাবী ও চতুর্থজন পাঠান। আশ্চর্যের কথা, পাঠানের সঙ্গেই তার মনের মিল বেশী। বোধহয় গান্ধীজীর সঙ্গে যে কারণে বাদশা খানের মনের মিল সেই কারণে মানসের সঙ্গেও হামিদের মনের মিল। হামিদ কিন্তু সোজা জানিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসা কোনো কাজের নয়। আর তিনি নিজে প্যান-ইসলামিজমে বিশ্বাসবান। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম তাঁর কাছে পরধর্ম। অথচ কোরানের আদ্যোপান্ত তাঁর কণ্ঠস্থ হলেও তিনি গীতাও পড়েছেন, বাইবেলও পড়েছেন। মুহম্মদের পরে যদিও আর কোনো নবী জন্মাননি ও জন্মাবেন না তবু তাঁর আগেও তো আরো কয়েকজন নবী জন্মেছিলেন। তা নইলে তাঁকে শেষ নবী বলার অর্থ কী ? তেমনি দু'জন নবী ছিলেন বাইবেলের যীশু ও গীতার কৃষ্ণ। না, এঁরা কেউ ভগবান বা ভগবানের পুত্র বা ভগবানের অবতার নন। কিন্তু মহাপুরুষ নিশ্চয়ই। এঁদের বাণী প্রণিধান করতে হয়। অত বড়ো না হলেও গান্ধীও মহাত্মা। মানস যখন বলে 'গান্ধী' হামিদ শুধরে দিয়ে বলেন, "মহাত্মা গান্ধী। তিনি একজন ইন্‌স্পায়ার্ড লীডার।" কিন্তু মহাত্মার মাহাত্ম্য স্বীকার করলেও তিনি আল্লামা মাশরিকির শিষ্য। যাঁর আসল নাম ইনায়তুল্লাহ্ খান্। তিনিও পাঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল হলো খাকসার পার্টি। মুসলিম লীগের সঙ্গে আড়াআড়ি। খোন্দকার জাফর হোসেন মুসলিম লীগের পক্ষপাতী। আলী হায়দারও কতকটা তাই। নেতা হিসাবে জিন্না সম্বন্ধে তাঁর দ্বিধা আছে। জিন্না যে শিয়া মুসলমান। হায়, ইকবাল যদি আরো কিছুদিন বাঁচতেন ! ইমতিয়াজ মির্জা পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকন্দর হায়াৎ খানের অনুগামী ইউনিয়নিস্ট। হাফিজ জানেন যে এঁরা কেউ খাকসারদের মতো

লড়নেওয়ালা নন। এঁরাও জানতেন যে খাকসাররা কোন্‌দিন হয়তো ইংরেজদের সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে দেবে। তাই হাফিজ কতকটা একঘরে।

"কিন্তু আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, পাশ কাটিয়ে গেলেন, মিস্টার মল্লিক। আট আটটা প্রদেশের শাসনভার ছেড়ে অমন করে বনবাসে যাওয়ার তাৎপর্য কী? ওইটুকু করলেই কি ইংরেজ বিদায় হবে?" হামিদ সুধান।

"আরে, না। ওটা তো সবে যাত্রারম্ভ। কংগ্রেসকে অনেকদূর যেতে হবে। মহাযুদ্ধের মাঝখানে গণসত্যাগ্রহ বাধালে সে আন্দোলন হিংসার দিকেই মোড় নিতে পারে। কাজেই ফাঁসীর সম্ভাবনাও রয়েছে। কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডের। আমি যে কী দারুণ সঙ্কটে পড়ে গেছি, কী করে বোঝাব!" মানস করুণস্বরে বলে।

"আপনি! সঙ্কটে পড়েছেন! কেন, আপনার কিসের সঙ্কট।" হামিদ বিস্মিত।

"শুনুন তা হলে খুলে বলি। জার্মানদের একটা প্রিয় গান আছে, হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি। আমি হাইডেলবার্গে গেছি, তবে হৃদয় হারাইনি। কিন্তু তার চেয়েও গূঢ়তর অর্থে হৃদয় হারিয়েছি ইউরোপে। সেইজন্যে আমার হয়েছে অর্জুনবিষাদ। কেমন করে আমি হিটলারকে হিট করতে গিয়ে জার্মানদের হাইডেলবার্গ, ড্রেসডেন, নুরেনবার্গ মিউনিকের মতো সুন্দর সুন্দর শহর ধ্বংস করব? কেমন করে বোমাবর্ষণ করব নারী ও শিশুদের উপর? কত বড়ো একটা বনেদী সংস্কৃতি জার্মানদের! কেমন করে তার হন্তারক হব? অথচ হিটলারের নাৎসী বাহিনী পোলাণ্ডের পর পশ্চিমমুখো হয়ে হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স আক্রমণ করবে আর পঙ্গপালের মতো সব সাফ করে দেবে এটাও কি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি! বিশেষ করে প্যারীসের পতন! চ্যানেল পার হওয়া অবশ্য অত সহজ হবে না, তবু বিশ্বাস কী! ইংরেজদের ভয়ঙ্কর বিপদ। এই দুর্যোগের সুযোগ নেওয়া ভারতীয়দের পক্ষে মারাত্মক অন্যায় হবে। তাই আমি কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারছিনে। কিন্তু এইখানেই যদি ওরা থামত তা হলেও কথা ছিল। আমার আশঙ্কার কারণ আছে যে ওরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে এই দুর্বিপাকের পূর্ণ সুযোগ নেবে। তা যদি হয় তবে আমার নিজের কর্তব্য কী হবে? আমি কি আমার দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সদলবলে জেলে পাঠাব? ম্যাজিস্ট্রেট হলে গুলীর হুকুম দেব? জজ হলে ফাঁসীর হুকুম দেব? না আমিও তার আগে পদত্যাগ করব? তা যদি করি তো চালাব কেমন করে? বিশ্বের সঙ্কট, ভারতের সঙ্কট, আমার সঙ্কট, সব একাকার হয়ে গেছে, হামিদ। আমার একমাত্র আশা ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের একটা মিটমাট হবে। কিন্তু তার জন্যে চাই ইংরেজ পক্ষেরও অন্তঃপরিবর্তন। শেফার্ড কী বললেন, শুনবেন?" মানস বলতে চায়।

"শুনতে কৌতূহল হয়?" হামিদ শুনতে চান।

"কংগ্রেসমন্ত্রীরা সবাই একসঙ্গে পদত্যাগ করেছেন শুনে শেফার্ড আমাকে বললেন, জানেন ওঁরা কী রকম ধূর্ত? জেলে যাবেন বলে আগে থেকে জেল কোড সংশোধন করে বসে আছেন! এবার জেলে গেলে মহা আরামে বাস করবেন। ওদিকে লোকে ভাববে না জানি কত বড়ো ত্যাগবীর!" মানস হাফিজকে শোনায়।

"তা শেফার্ড সাহেবরাও তো কম ধূর্ত নন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে ও বিনা শর্তে যুদ্ধের জন্যে জান মাল ধন সমর্পণ করবে। যেমন করছেন পাঞ্জাবের সিকন্দর হায়াৎ খান্ ও তাঁর দল। কিন্তু কংগ্রেসকেও ভেবে দেখতে হবে যে এই পলায়নের রাজনীতি মুসলমানদের মনে কোন্ ধারণার সৃষ্টি করবে। লীগপন্থীরা বলাবলি করছেন এটা তাঁদের ফাঁকি দেবার ছল। কোয়ালিশন এড়াবার কৌশল। কোয়ালিশনে রাজী হলে সবাই মিলে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রেও রদবদল ঘটানো সম্ভব হতো। এতে লাভ কী হলো? বাকী তিনটে প্রদেশে তো অকংগ্রেসী মন্ত্রীরা কেউ পদত্যাগ করবেন না। যুদ্ধকালে জান মাল ধন বিনা শর্তে জোগাবেন। অর্ধেক সহযোগ ও অর্ধেক অসহযোগ কি দেশের পক্ষে স্ববিরোধী নীতি নয়। দেশ তো এমনি করেই দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের ইস্যুতে নয়। সহযোগী অংশটাই একদিন সহযোগিতার পুরস্কার প্রত্যাশা করবে। তাকে বঞ্চিত করে ব্রিটেন কি কংগ্রেসকে সর্বময় ক্ষমতা দেবে?" সংশয় প্রকাশ করেন হামিদ।

"না, না, কংগ্রেসের তেমন কোনো অভিসন্ধি নেই। কংগ্রেসও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, যদি ভারতের ভাগ্য ভারতীয়দের নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়। সেটা একটা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে। আপাতত ভারত সরকার যেন গঠিত হয় জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে। তাঁদের মধ্যে লীগপন্থীরাও থাকবেন। সর্বময় ক্ষমতা আসবে যুদ্ধের পরে। কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি সকলেরই হাতে। শুধুমাত্র কংগ্রেসের হাতে নয়? এক কথায় বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যের হাত থেকে নেশনের হাতে। যে নেশন হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলেরই নেশন। শুধুমাত্র হিন্দুর নয়।" মানস পরিষ্কার করে বলে।

"ওইখানেই তো মুশকিল।" হামিদ মাথা নাড়েন। "আমরা কখনো আপনাদের সঙ্গে এক নেশন গড়ব না, মিস্টার মল্লিক। ন্যাশনালিজম আপনাদের কাছে একটা ধর্ম বিশেষ। আমাদের কাছে ইসলামই সব। সাম্রাজ্য যতদিন আছে আপনারা ও আমরা একঘাটে জল খাচ্ছি। কিন্তু সাম্রাজ্য যেদিন থাকবে না সেদিন দেখবেন

মুসলমানের টানটা আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্থানের দিকে। তাদের যারা শত্রু মুসলমানের তারা শত্রু। তাদের যারা মিত্র মুসলমানের তারা মিত্র। মুসলমানের কাছে তারা এলিয়েন নয়, তাদের কাছে মুসলমানও এলিয়েন নয়। ভারতীয় নেশনের থেকে ভিন্ন প্যান-ইসলামিক ব্রাদারহুড। বেছে নিতে হলে আমরা প্রথমটাকে নয়, দ্বিতীয়টাকেই বেছে নেব। আপনাদের সঙ্গে নেশন গড়লে আমাদের আরবে ইরানে বিদেশী ও বিজাতীয় মনে করবে। আমরাও তাদের বিদেশী ও বিজাতীয় মনে করব। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আমরা সব দেশের মুসলমানই একজাতি। ইসলাম শুধু একটা ধর্মমত নয়, ইসলাম হচ্ছে একটা সমাজ, একটা রাষ্ট্র। আর খেলাফৎ হচ্ছে তার একটা মূল স্তম্ভ। খেলাফৎ উঠিয়ে দিয়ে তুরস্ক এক মহা অপরাধ করেছে। আমরা সেটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যদি সুযোগ পাই। পাকিস্তান আমাদের পক্ষে একটা সুযোগ। আপনাদের পক্ষে একটা দুর্যোগ। ইংরেজ চলে গেলে মিলনের সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। যেমন খেলাফৎ আন্দোলনের সময়। মহাত্মা গান্ধীকে উভয়পক্ষই নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর প্রভাব কমেছে। জিন্না সাহেবের প্রভাব বেড়েছে। এখন চাই গান্ধী-জিন্না সমঝোতা। কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি নিজে জিন্নাপন্থী নই। আমি একজন খাকসার। মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি দল এটা আমি মানিনে। আর ন্যাশনালিজম এই তত্ত্বটাই ইসলামের সঙ্গে বেখাপ। তাই ওদের মুখে মুসলিম নেশন বা পাকিস্তানী নেশন শুনলে আমি ফাঁপরে পড়ি।" হাফিজ প্রাণ খুলে প্রকাশ করেন।

"দেখুন, হাফিজ", মানস বলে, "মুসলমানরা যদি একাই একটা ভ্রাতৃসঙ্ঘ গঠন করতে চায় সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব ও বাস্তব। কিন্তু ওরা যদি একাই একটা নেশন গঠন করবে বলে মনঃস্থির করে তবে সেটা কোথাও সম্ভব নয়, কোথাও বাস্তব নয়। না পাঞ্জাবে, না বাংলাদেশে, না উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে। সেসব প্রদেশের উপর হিন্দু ও শিখদেরও জন্মগত দাবী আছে। ইতিহাস বলে যে পাঞ্জাব শিখদের রাজ্য ছিল, এখনো থাকত, ইংরেজরা যদি শিখদের হারিয়ে না দিত। কিংবা শিখরা যদি ইংরেজদের অনুগত হতো। পাতিয়ালার শিখরা যেমন রয়েছে। মুসলমানরা মাইনরিটিহিসাবে যত ইচ্ছা সেফগার্ড চাইতে পারে, সেটা অন্যায় নয়, কিন্তু কতকগুলি প্রদেশে মেজরিটি বলে সেই প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাদের একক স্বার্থে পাকিস্তান চাইতে গেলে সেখানকার মাইনরিটির স্বার্থহানি হবে। তারা তো প্রতিরোধ করবেই। কংগ্রেস কি তাদের অসন্তুষ্ট করে লীগের সঙ্গে মিটমাট করতে

সাহস পাবে? সে সাহস ইংরেজেরও কি আছে? শিখরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পায় যে ব্রিটিশ রাজ তাদের পাকিস্তানের কর্তাদের হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন তা হলে কি তারা জার্মানদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জান দেবে, না আব একটা সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁপ দেবে? ইংরেজরা যদি শিখদের সঙ্গে বেইমানী করে তবে তাদের রাজত্ব আরো আগে খতম হবে। তার পর চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্থির হবে পাঞ্জাব কার। মুসলমানের না শিখের, শিখের সঙ্গে হিন্দুর। জিন্না সাহেব সুচতুর ব্যারিস্টার, কিন্তু তিনি কোন্ পক্ষের ব্যারিস্টার? মুসলিম মাইনরিটির না মুসলিম মেজরিটির? এতদিন তিনি ছিলেন মুসলিম মাইনরিটির ব্যারিস্টার। এখন তিনি মুসলিম মেজরিটির ব্যারিস্টার। যদি মুসলিম মেজরিটির ইচ্ছায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অবশিষ্ট ভারতে মুসলিম মাইনরিটির কী হাল হবে? আর পাকিস্তানে হিন্দু শিখ মাইনরিটিদেরই কী দশা হবে? যেখানে যত সংখ্যালঘু আছে সকলেই বিপন্ন হবে। একবার ভেবে দেখুন জিন্না সাহেবের নিজের প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা। তিনি না হয় পালিয়ে বাঁচবেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের সবাই কি পালিয়ে বাঁচবে। তাদের ঘরবাড়ী ভূসম্পত্তির কী ব্যবস্থা হবে?”

হামিদ স্বীকার করেন যে এসব প্রশ্ন উঠবেই। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান যদি পাকিস্তান দাবা করে তবে তাদের সে দাবী এককথায় খারিজ করার মালিক কারা? হিন্দুরা না শিখরা না ইংরেজরা? স্বরাজের দাবীর মতো এটাও একটা বৈধ দাবী, কারণ এটার পেছনেও অধিকাংশের ইচ্ছা, অধিকাংশের ত্যাগ, অধিকাংশের স্বার্থ।

“না, মিস্টার মল্লিক, আমি লীগপন্থী না হলেও লীগের ওই দাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারব না। খান্ আবদুল গফ্ফার খান্ কেমন করে দাঁড়াবেন তিনিই জানেন। এটা এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নে মুসলমানদের দু'ভাগ করতে পারা যাবে না। মাহাত্মা গান্ধী যদি তেমন কোনো মোহ পোষণ করেন তো একদিন তাঁর মোহভঙ্গ হবে। সব চেয়ে ভালো সমস্যাটাকে অত দূর গড়াতে না দেওয়া। সময় থাকতেই মিটিয়ে দেওয়া। কংগ্রেসকেই এগিয়ে আসতে হবে।”

“কিন্তু কংগ্রেস যতবারই এগিয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে, হামিদ। লীগ নেতারা কিছুতেই তাঁদের শেষ তাসটি দেখাবেন না। কিছুতেই বলবেন না যে এই হচ্ছে তাঁদের চূড়ান্ত দাবী, এর পরে তাঁদের আর কোনো দাবী নেই। হাতের পাঁচটি সব সময়েই তাঁদের আস্তিনের তলায়। এই যে পাকিস্তানের দাবী এটাও কি চূড়ান্ত দাবী? এর আড়ালেও আছে একটি গোপন সূত্র। পাকিস্তান ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সৈন্যকে ঘাঁটি দিতে পারবে, ব্রিটেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করতে পারবে। লীগ

নেতারা যদি ইংরেজদের সঙ্গে তলে তলে গাঁটছড়া না বাঁধতেন তা হলে কবে মিটমাট হয়ে যেত। কিন্তু তাঁদের মূলনীতিটা হলো এই যে, তাঁরাই ভালো ছেলে, কংগ্রেস নেতারা মন্দ ছেলে, সুতরাং তাঁরা পাবেন ভালো ছেলে হওয়ার জন্যে পুরস্কার, আর কংগ্রেস নেতারা পাবেন মন্দ ছেলে হওয়ার জন্যে শাস্তি। এই মূলনীতির কাছে নতিস্বীকার করবে কে? কেনই বা করবে? এতে কি স্বাধীনতা সুগম হবে? স্বাধীনতার বদলে তার চেয়ে কম দামী জিনিস নিয়ে কী করবেন গান্ধী, নেহরু, বল্লভভাই, আজাদ, বাদশা খান্? কী করবেন সুভাষ, জয়প্রকাশ, মেহের আলী? কয়েকটা প্রদেশ বাদ গেলে এমন কোনো ক্ষতি হতো না, যদি বাকী সব প্রদেশ সত্যি সত্যি স্বাধীন হতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। পাকিস্তানে ব্রিটিশ সৈন্য থাকতে ভারতের কোনো অংশই নিষ্কণ্টক হতে পারে না। এখানে লীগ স্বার্থ ও ব্রিটিশ স্বার্থ একাকার হয়ে গেছে। লীগ চাইবে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ প্রোটেকশন। আইন অনুসারে সে অধিকার তার থাকবে। সুতরাং তেমন কোনো আইনে সায় দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে দেশকে বিকিয়ে দেবার সামিল। লীগের পেছনে যদি ভারতের মুসলমানরা সার বেঁধে দাঁড়ায় তা হলে সে এক ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডী হবে। স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিণত হবে দ্বিতীয় এক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। কুরু পাণ্ডবের ভূমিকায় নামবে হিন্দু মুসলমান। গান্ধীজী কি তেমন মঞ্চে কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন? কখনো না। তিনি মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করবেন। আমরা যারা মুসলমানদের ভালোবাসি তাদের জীবন দুর্বহ হবে। আপনাদের অনেকের মধ্যেও তো হিন্দুদের প্রতি ভালোবাসার অভাব দেখিনে। তাঁদের জীবনও কি দুর্বহ হবে না? জিন্না সাহেব তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা ছিলেন, তাঁর অনুগামীরা ছিলেন কেউ মুসলমান, কেউ পার্শী, কেউ হিন্দু। হঠাৎ ভোল বদল করে মুসলিম লীগের একচ্ছত্র অধিনায়ক হতে গেলেন কেন? তিনি যেমন হিন্দু ও পার্শীদের ছেড়েছেন তেমনি গান্ধীজীও মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ ও পার্শীদের ছাড়বেন, বিশুদ্ধ হিন্দু নেতায় পর্যবসিত হবেন, এটা কি একটা গণতান্ত্রিক দাবী না এটা একটা স্বৈরতন্ত্রী ফরমান? মুসলিম লীগ মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি এটা মেনে নিলে কংগ্রেস-পন্থী মুসলিমদের অস্তিত্ব থাকে না, আর কংগ্রেস-পন্থী মুসলিমদের অস্তিত্ব না থাকলে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের দিন সংগ্রামী মুসলিম বলতে একজনও থাকে না,। সবাই ভালো ছেলে হয়ে ইংরেজের হাত থেকে কয়েকটা প্রদেশ পুরস্কার পাবে, এটা কি স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের কথা? না সংগ্রাম বলতে বোঝায় ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, হিন্দুর সঙ্গেই সংগ্রাম? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সে সংগ্রাম আজকের দিনের

সংগ্রাম নয়, কালকের দিনের সংগ্রাম, আজকের প্রশ্ন কংগ্রেস কি ইংরেজকে যুদ্ধকালে আরো বিপন্ন করবে, না শুধুমাত্র যুদ্ধে অমত জানিয়ে দূরে সরে থাকবে? আমি তো মনে করি এই একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট। এতে ইংরেজকে বিব্রত করা হচ্ছে না, শুধুমাত্র নৈতিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা অন্যায় নয়, কারণ কংগ্রেস তো আমার মতো একটি ব্যক্তি নয় যে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই শ্রেয় বিবেচনা করে। কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল দলকে কাজ করতে হয় অধিকাংশের মতামত অনুসারে, নইলে দল ভেঙে চৌচির হয়। আত্মরক্ষাই দলের প্রাথমিক কর্তব্য। সেদিক থেকে কংগ্রেসকে দোষ দিতে পারিনে। তবু আমি দুঃখিত যে হিটলারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগ্রাম করবে না, যতদিন না ইংরেজরা কংগ্রেসের পরামর্শ শোনে। এবার শোনা যাবে হিটলারের বিরুদ্ধে ভালো ছেলেরা কে কী বলেন। কে কে জান মাল ধন কবুল করে যুদ্ধে যোগ দেন। এখন পর্যন্ত একমাত্র সিকন্দর হায়াৎ খান্‌কেই অগ্রণী হতে দেখা যাচ্ছে। তিনি ভালো ছেলেদের চেয়েও আরো ভালো ছেলে। তাঁকে বিসর্জন দিয়ে কি লীগপন্থীদের পুরস্কার দেওয়া সম্ভব?" মানস হেসে উড়িয়ে দেয়।

হামিদ মুচকি হেসে বলেন, "সিকন্দর হায়াৎ খানের রাজভক্তির সঙ্গে আর কার রাজভক্তির তুলনা! তিনি যেমন করেই হোক যুদ্ধের জন্যে জওয়ান রিক্রুট করবেনই। শিখদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও মুসলমানরা যাবে, অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে, তাই দিয়ে তারাই ইংরেজের পরে পাঞ্জাবের রাজত্ব পাবে। মুসলমানদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও শিখরা যাবে, অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে। তারাই পরে পাঞ্জাবের মসনদে বসবে। হিন্দুদের বোঝাবেন তোমরা যদি যুদ্ধে না যাও মুসলমানরা যাবে, শিখরা যাবে। অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতেই পড়বে। তারাই মিলেমিশে তোমাদের উপর প্রভুত্ব করবে। এই প্রোপাগাণ্ডা খুবই ফলপ্রদ হয়েছে। দলে দলে রংরুট নাম লেখাচ্ছে আর বন্দুক ঘাড়ে করে মার্চ করে যাচ্ছে। একদল আওয়াজ দিচ্ছে 'আল্লা হো আকবর'। আরেক দল 'সৎ শ্রী অকাল'। তৃতীয় দল 'কালী মাঈ কী জয়'। না, 'বন্দেমাতরম্' নয়। দেশ বা নেশন বোধটাই ওদের কারো মধ্যে নেই। তবে পাঞ্জাবের জন্যে ওরা লড়তে তৈরি। এখন বিদেশী বাদশার জন্যে, পরে একই হাতিয়ার হাতে নিয়ে যে যার নিজের সম্প্রদায়ের জন্যে। যদি ইংরেজরা সত্যি সত্যি চলে যায় ও তার আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হয়।"

মানস চিন্তিত হয়ে বলে, "লক্ষণ শুভ নয়। সৈনিকদের মধ্যেই যদি দেশবোধ বা নেশনবোধ না থাকে তবে তাদের দায়িত্ব কংগ্রেস নেবে। কিসের ভরসায়?

আনুগত্যের? কার প্রতি আনুগত্যের? ক্ষমতার হস্তান্তর মানে তো সৈন্যদলের হস্তান্তর। সিভিল সার্ভিসের হস্তান্তর। সৈন্যদলের উপরে যদি নির্ভর না করতে পারে তো সিভিল সার্ভিসের উপরেই বা নির্ভর করবে কিসের ভরসায়? আনুগত্যের? কার প্রতি আনুগত্যের? দেশবোধ বা নেশনবোধ যদি না থাকে। যে যার সম্প্রদায়ের জন্যেই যদি মমতা বোধ করে। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায় জুড়ে জুড়ে যে ঐক্য সে তো একটা জোড়াতালি। আনুগত্যের সঙ্গে আনুগত্য জুড়ে কি একটা মিশ্র আনুগত্য হয়? তেমন আনুগত্য একানুগত্যের মতো অটুট নয়। ক্ষমতার হস্তান্তর অসম্ভব নয়, কিন্তু আনুগত্যের হস্তান্তর কেমন করে সম্ভব হবে? সম্রাটের স্থান নেবেন কে? দেশীয় রাজন্যরাই বা কার কাছে আনুগত্যের শপথ নেবেন? সম্রাট যদি না থাকেন? সম্রাটের শূন্যতা পূরণ করাই কঠিন, সাম্রাজ্যের শূন্যতা পূরণ করা কঠিন নয়।"

হামিদের বয়স কম। তিনি অত বোঝেন না। বলেন, "সমস্যা রীতিমতো জটিল হবে যদি সাম্রাজ্যের স্থান নেয় নৈরাজ্য।"

এর উপরে আর কথা চলে না। কে না জানে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে মিটমাট না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেও মিটমাট হবে না? আর মিটমাট না হলে কি ইংরেজরা অনন্তকাল সাম্রাজ্য পাহারা দেবে? তখন একতরফা সিংহাসন ত্যাগ। বিপ্লবীরা ঠিক যে জিনিসটি চায়। যে যেখানে পারে পুলিশ স্টেশন দখল করবে, রেলস্টেশন দখল করবে, রেডিও স্টেশন দখল করবে, সরকারী আফিস দখল করবে, ট্রেজারি দখল করে নেবে। কোথায় এত সৈন্য সামন্ত, কোথায় এত আমীর ওমরাহ, কে কাকে হটিয়ে দিয়ে একছত্র হবে? জমিদার মহাজন পুঁজিপতি শিল্পপতি যে যেখানে পারে পা দিয়ে ভোট দেবে। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াশী, ঘোষাল, জাফর হোসেন প্রভৃতি ইম্পীরিয়াল অফিসাররা কলকাতায় বম্বেতে মাদ্রাজে করাচীতে জাহাজ ধরবেন কিংবা দিল্লীতে করাচীতে বিমান ধরবেন। দেশে থাকতে চাইলে চাকরি দিচ্ছে কে? কোন্ অথরিটি? মাইনে জোগাচ্ছে কে? কোন্ ট্রেজারি? কোন্ ব্যাঙ্ক? তখন পদত্যাগ করলেই বা কী? না করলেই বা কী? তখন পদমর্যাদা বলে কিছু থাকবে না। তখন পদযোগে পলায়ন, যদি বিপ্লবীরা পালাতে দেয়।

জাফর হোসেনের বাংলোয় গেলে মানস দেখতে পায় বেগম বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। "বলুন দেখি, ভাই, কী করতে পারি? সেটলমেণ্ট ক্যাম্পের দিন এগিয়ে আসছে। মির্জা তৈরি হচ্ছে চারমাসের জন্যে ক্যাম্পে যেতে। তারপরে কোথায় কোন্ মহকুমায় বদলী হবে কে জানে! কথাটা যখনি পাড়তে যাই পাশ

কাটিয়ে যায়। বলে, আমাদের দেশে বিয়ে সাদী হয় বাপ মায়ের নির্বন্ধে। আমি তো মালিক নই, আমি কী করে কথা দেব ? আপনারা কি পারবেন লাহোরে গিয়ে রোকেয়াকে দেখাতে ? ওঁরা এদেশে আসবেন না। আমরা কী করে এত খাটো হই বলুন তো ? হাজার হোক একটা জেলার পুলিশ সাহেব। লাটসাহেব ডাকেন খানা খেতে। প্রায়ই তো কলকাতায় যান মোলাকাৎ করতে। সাহেব সুবো এলে ক্লাবে পার্টি দেন। বাড়ীতেও আমি পর্দা মানি। শুধু আপনার মতো আপন জনের সামনে নয়।"

মানুষটি অতিশয় সরল। তাঁর একমাত্র ভাবনা সমাজে কেমন করে উঠবেন। উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াই সব নয়। অমন একটি সুপাত্র হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। আবার কবে তেমন সৌভাগ্য হবে। যদি না কলকাতায় বদলী হন। তার দেরি আছে। মানস তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। মেয়ের বয়স এমন কিছু হয়নি। চোদ্দ কি পনেরো। লেখাপড়ায় সিনিয়র কেমব্রিজও পেরোয়নি। নিদেনপক্ষে ম্যাট্রিক।

জাফর হোসেন আফসোস করে বলেন, "আরে, ভাই, শুধু ইংরেজী নয়, মুসলমানের মেয়েকে ভালো করে উর্দূটাও শিখতে হবে। নইলে তাকে মুসলমান বলে কেউ চিনবে না। উর্দূ বলতে পারিনে বলে ওরা কি আমাদের কম ঘেন্না করে ? আমাদের সবাইকে ভালো করে উর্দূ শিখতে হবে। আমি তো কোনো মতে কাজ চালাতে পারি। আমার বেগম যে পদে পদে হোঁচট খান। মুসলিম সমাজে ওঁকে বার করি কেমন করে ? ইংরেজ সমাজেও না। চেষ্টা করি ওঁর সঙ্গে উর্দূতে বাতচিৎ করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাড়ে হাড়ে বাঙালী।"

"তা হলে আপনারা পাকিস্তান চাইছেন যে বড়ো !" মানস রঙ্গ করে।

"পাকিস্তান চাইছি কি সাধে ?" জাফর হোসেন উষ্ণ হয়ে বলেন, "চাইছি আপনাদের চেয়ে খাটো না হতে। আপনারা চলেন ডালে ডালে তো আমরা চলি পাতায় পাতায়। আপনারা চান কংগ্রেস রাজ তো আমরা চাই মুসলিম লীগ রাজ। আপনারা চান মেজরিটি রুল তো আমরাও চাই মেজরিটি রুল। যে যার নিজের এলাকায়।" একটু ঠাণ্ডা হয়ে জুড়ে দেন, "মানছি এটা হিন্দু-শিখ মাইনরিটির পক্ষে উপাদেয় নয়। কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার কংগ্রেস লীগ ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্য।"

"কিন্তু ভোটসংখ্যা সমান সমান হলে কাস্টিং ভোট দেবেন কে ? প্রধানমন্ত্রী হবেন কে ?" মানস ভেবে পায় না।

"প্রধানমন্ত্রী কি আমেরিকায় আছেন ? একজন প্রেসিডেণ্ট থাকলেই হলো। পালা

করে কংগ্রেস থেকে ও লীগ থেকে একজনকে প্রেসিডেণ্ট করা যাবে। তা যদি না হয় তবে বড়লাটই হবেন প্রেসিডেণ্ট।" জাফর হোসেন মীমাংসা করেন।

"তার মানে ইংরেজই চিরকাল ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল চালাবে?" মানস হাসে।

"না, না, হাসির কথা নয়। ও ছাড়া আর কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, মল্লিক। দ্বৈরাজ্য না হয় তো নৈরাজ্য। তখন জোর যার মুলুক তার। আপনারা গায়ের জোরে যতটা পারেন জবর দখল করবেন। আমরাও গায়ের জোরে যতটা পারি জবর দখল করব। এর নাম তলোয়ারের দ্বারা মীমাংসা। এটা যদি পছন্দ না হয় তো ইংরেজকে মধ্যস্থ করে পার্টিশন।" জাফর হোসেন দস্তুরমতো সীরিয়াস।

"তার মানে আর একটা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড?" মানস আশঙ্কা করে।

"মন্দ কী! প্রাদেশিক স্তরে তো সেটা মেনে নিয়েছেন।" হোসেন বলেন।

পান করতে নয়, পান খেতে ভালোবাসেন আলী হায়দার। অক্‌স্‌ফোর্ডফের্তা আই সি এস। টেনিসেও তাঁর অনীহা ছিল। বাড়ীতে বসে উর্দু পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখেন। মানসও লেখে বাংলা পত্রিকার জন্যে। সেইসূত্রে দু'জনের অন্তরঙ্গতা। কখনো মানস যায় হায়দারের ওখানে, কখন হায়দার আসে মানসের এখানে।

"কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে, ভাই মল্লিক।" আলী হায়দার বলেন। "এর পরে আর কে চাইবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের গাঁটছড়া বাঁধতে? কংগ্রেস যখন খুশি তার মন্ত্রীদের সরিয়ে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে লীগকেও তার মন্ত্রীদের সরিয়ে নিতে হবে। ইস্তফা দিতে না চাইলেও ইস্তফা দিতে হবে। এ কী জুলুম বলেন দেখি। মেজরিটি পদত্যাগ করলেই মাইনরিটিকে পদত্যাগ করতে হবে! আইনসভা বন্ধ থাকবে! মেজরিটি যদি ভুল করে মাইনরিটিও ভুল করবে!"

"ভাই হায়দার, আপনি কি বলতে চান কংগ্রেসের পলিসি ভুল?" মানস সুধায়।

"যুদ্ধকালে ব্রিটেনকে নাজেহাল করা তো প্রকারান্তরে জার্মানীকে সাহায্য করা। চাপ দিয়ে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট আদায় করাও তো প্রকারন্তরে কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রুল আদায় করা। মুসলিম লীগের,তথা মুসলিম জনমতের এতে তীব্র আপত্তি। ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট যদি কংগ্রেস গভর্নমেণ্টেরই নামান্তর হয় তবে মুসলিম লীগ ওতে যোগ দেবে না। আর মুসলিম লীগ যোগ না দিলে মুসলিম জনমতও মেনে নেবে না। মুসলমানরা মোটের উপর মাইনরিটি হলেও কয়েকটা প্রদেশে তো মেজরিটি। সেসব প্রদেশের গভর্নমেণ্ট মুসলিম জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করবে। প্রথমে চাইবে আরো বেশী ক্ষমতা। পরে চাইবে পুরোপুরি

স্বাধীনতা। এরই একটা সহজবোধ্য নাম পাকিস্তান। পাকিস্তান একটাও হতে পারে, দুটোও হতে পারে, তিনটেও হতে পারে। যেখানেই হবে সেখানেই মুসলিম মেজরিটি রুল।" হায়দার বিশদ করেন।

মানস চুপ করে শুনে যায়। ভেবে চিন্তে বলে, "কংগ্রেস তো হিন্দু মেজরিটি রুল চাইছে না, চাইছে ভারতীয় মেজরিটি রুল। দুটো এক জিনিস নয়। অথচ আপনার কথায় মনে হয় মুসলিম লীগ চাইছে ইহুদীদের ন্যাশনাল হোমের অনুসরণে বিশুদ্ধ মুসলিম ন্যাশনাল হোমল্যাণ্ড। সেখানে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট দেশভিত্তিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেইজন্যে নেশন কথাটার কদর্থ করা হচ্ছে মুসলিম নেশন। পাকিস্তান সম্ভব হলে সে রাষ্ট্রে সব অমুসলমান রাতারাতি এলিয়েন হবে। আর বাকী স্থানে সব মুসলমান রাতারাতি এলিয়েন। দুই ধারেই কোটি কোটি লোক এলিয়েন। এলিয়েনদেরকে একপক্ষ সন্দেহ করবে অপরপক্ষের অনুগত বলে। তাদের লয়ালটি নিয়ে বিতর্ক বাধবে। হয় তারা পালিয়ে বাঁচবে, নয় তারা ঠায় মারা যাবে। আমরা বিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাব জার্মানীর ক্যাথলিক ও প্রটেস্টানটদের সপ্তদশ শতাব্দীর ত্রিশবছরের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি। শিখরা কি পাকিস্তান একমুহূর্তের জন্যে বরদাস্ত করবে? হিন্দুরা করতে পারে, তারা স্বভাবত সহিষ্ণু। তা বলে কলকাতা কেউ পাকিস্তানকে অমনি ছেড়ে দেবে না। অথবা দিল্লী। অথবা লাহোর। রক্তপাত অনিবার্য। কার কী পাওনা তা স্থির হবে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে। ইংরেজদের দেওয়া রোয়েদাদে নয়।"

"এ তো বড়ো আফসোসের কথা!" হায়দার বলেন পান মুখে দিয়ে, "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। আমরা কি ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে আপসে বাঁটোয়ারা করতে পারিনে? পাকিস্তান কথাটার আসল মানে পার্টিশন। পার্টিশন মেনে নিলে নেশন শব্দটার কদর্থের কোনো প্রয়োজন থাকে না। জার্মানীতে যেটা দেখা গেল সেটাও তো একপ্রকার পার্টিশন। কোথাও ক্যাথলিক মেজরিটি, কোথাও প্রটেস্টাণ্ট মেজরিটি, যার যেখানে মেজরিটি তার সেখানে আধিপত্য। তা বলে মাইনরিটি বাঁচল না তা নয়। এখন তো ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।"

॥ সতেরো ॥

উকিলদের সঙ্গে মেলামেশা জজসাহেবদের রীতি নয়। পাছে পক্ষপাতিত্বের অপবাদ রটে। কিন্তু রায় বাহাদুর বাসুদেব হালদার তো কেবল উকিলহিসাবে অগ্রগণ্য নন, মানুষ হিসাবেও সর্বজনশ্রদ্ধেয়। পিতার বয়সী এই সজ্জনের সঙ্গে মানস কথা বলতে যায় তার পুত্রশোকে শান্তির অন্বেষণে।

"আমাকেই বা শান্তির সন্ধান দেয় কে, মল্লিক সাহেব?" রায় বাহাদুর বলেন, "আমিও যে আপনার মতোই ভুক্তভোগী। দ্বিতীয়বার যখন ওই শোক পাই তখন আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। ভগবানকে বলি, প্রভু আর কত মার মারবে? আমাকে মারতে চাও, মারো। কিন্তু আমার বাছাদের বাঁচতে দাও। ওদের তো ঝরে পড়ার বয়স নয়। তাঁর হাতের মার খেতে খেতেই আমি হিউমিলিটি শিখেছি।'

এর পর তিনি বলেন তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী। কিছু কম ট্র্যাজিক নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "কিন্তু আছে, আছে এর মানে। আমরা বুঝিনে। আমরা অবোধ। এতে আমাদের ভগবানের দিকে টানে। আমরা তাঁর আরো কাছে যাই। আমার নিজের কথা যদি বলেন, আমি বেটার ম্যান হয়েছি।"

মানস বলে, "কিন্তু ভগবান আছেন কি না তাই বা আমি নিশ্চিত জানব কেমন করে? অনবরত চেষ্টা করছি বিশ্বাস করতে। পারছিনে। ছেলেবেলায় করতুম। বড়ো হয়েও করেছি। কিন্তু পশ্চিমে গিয়ে দোটানায় পড়েছি। হ্যামলেটের মতো টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। আপনার মধ্যে একটা স্থিতির ভাব আছে। আমার মধ্যে শুধু অস্থিরতা।"

রায় বাহাদুর এর উত্তরে একটি গল্প বলেন। একটি মা সদ্য সন্তানহারা। কিন্তু সে কাঁদারও সময় পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আগে তো আর সকলের জন্যে

রান্নার জোগাড় করি। এদের খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপরে কাঁদতে বসব। দেখছ না আমার হাত জোড়া।

"মল্লিক সাহেব, আমিও তেমনি ভাববার সময় পাইনি ভগবান আছেন কি নেই, থাকলে এমন দুঃখ দেন কেন, না থাকলে এত লোক তাঁর কাছে দুঃখ জানায় কেন, তাঁকে পূজা করে কেন। তিনি কি প্রত্যেকের অভীষ্টপূরণের যন্ত্র ? না প্রত্যেকেই তার অভীষ্টপূরণের যন্ত্র ? ভগবান কি মানুষের জন্যে, না মানুষ ভগবানের জন্যে ? আমি তাই অত কথা ভাবিনে, ভাবি শুধু একটি কথা যে, যারা রয়েছে তাদের জন্যে রান্নার জোগাড় করতে হবে। সেই যারা শুধু আমার সংসারের ক'জন নয়, আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী শহরবাসী জেলাবাসী সর্বসাধারণ। 'গড' আর 'গুড' দুটি আলাদা শব্দ নয়, একই শব্দ। গুড করতে করতেই আমি গডকে জানব। প্রার্থনা উপাসনা পূজা আর্চার জন্যে সময় কোথায় ? এরা কি আমাকে একদণ্ড ফুরসৎ দেয় ?" রায় বাহাদুর বলেন।

"গান্ধীজী আগেকার দিনে বলতেন, গড ইজ টুথ। আজকাল বলেন, টুথ ইজ গড। তেমনি ছেলেবেলায় আমি পড়েছি, গড ইজ গুড। আজ আপনার মুখে যা শুনছি তার মর্ম গুড ইজ গড। ঠিক কি না, রায় বাহাদুর ?" মানস সুধায়।

"ঠিক। কিন্তু আমাকে অতঃপর রায় বাহাদুর বলে লজ্জা দেবেন না ? ওটা শুনলে মনে হবে আমি যেন সাহেবদের চাটুকার। আমি তো সেখানে কোথাও যাইনে। নইলে আপনার ওখানেই আমাকে দেখতে পেতেন। আমার এখানে আপনাকে আসতে হতো না। শেফার্ড সাহেবকেও আসতে হয়।" রায় বাহাদুর মুচকি হাসেন।

এর পর থেকে তার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে হালদার মশায় বলে ডাকতে হলো। আরেকদিন ভাববিনিময়ের জন্যে তাঁর ওখানে গেলে তিনি ওকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখেন। তারপর এসে মাফ চেয়ে বলেন, "আদালত থেকে ফিরেছি খুব দেরিতে। কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে এই আপনার কাছে আসছি, মল্লিক সাহেব।"

"গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হয় কেন ? গঙ্গা তো এখানকার নদী নয়।" মানস অবাক। হালদার মশায় অপ্রতিভ হয়ে বলেন, "আদালত থেকে ফিরেই আমার প্রথম কাজ হয় গঙ্গাজলে মুখ প্রক্ষালন। উকিলের মুখ তো ? কত মিছে কথা মুখে আনতে হয়। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। হাসছেন যে। বিশ্বাস হয় না ?"

"কিন্তু উকিলকে এত মিছে কথা বলতে হয় কেন ? না বললে ক্ষতি কী ?

সাক্ষীদের সত্য পাঠ করতে হয়, যাহা বলিব তাহা সত্য হইবে, সত্য ভিন্ন অসত্য হইবে না, সম্পূর্ণ সত্য হইবে।" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"আপনাকে তো কখনো ওকালতি করতে হয়নি। হলে জানতেন যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ না মেশালে মামলা টেকে না। দুই পক্ষই যে যার মামলার দুর্বল জায়গাগুলো মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা তর্ক দিয়ে মজবুৎ করে। এটা একটা ওপেন সীক্রেট। ভাগ্যিস্ মাথার উপরে ধর্মাবতার বলে একজন থাকেন। তিনিই তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তৌল করে সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন। তাই আমরা মনে শান্তি পাই। নইলে অশান্তিতে ছটফট করতুম। গঙ্গাজলেও পাপমোচন হতো না।" হালদার স্বীকার করেন।

"শুনে আমার বড়ো কষ্ট হয়, হালদার মশায়, যে সত্যাসত্য নির্ধারণের সমস্ত দায় আপনারা সঁপে দিয়েছেন বিচারকদের উপরে। বিচারকরা কী করে নিঃসন্দেহ হবেন? সন্দেহের অবকাশ যদি থাকে তবে তো আসামীকে খালাস দিতে হবে। অন্যায়ের প্রতিকার হবে কী করে? আর যদি আসামীর তেমন কোনো খুঁটির জোর না থাকে তবে তো তারই উপর অন্যায় করা হবে। আপনারা উকিলেরা অমন মার্সিনারি কেন? অপরাধীকেও জেনে শুনে প্রশ্রয় দেন কেন?" মানস মহাবিরক্ত হয়।

"এসব প্রশ্নের জবাব আপনি গোটা বারের কাছেই তলব করতে পারতেন। আমি একাই জবাবদিহি করি কী করে? সাধ্যমতো সত্য মামলাই হাতে নিই। আরো উপার্জনের লোভ সংবরণ করি। নিশ্চয়ই জানেন যে উপার্জনের নিরিখে আমি পয়লা নম্বর নই। প্রতিদিনই অনুভব করি যে এ ব্যবসা এ দেশের উপযোগী নয়। কিন্তু কোন্‌টা যে এ দেশের উপযোগী তাও বলতে পারিনে। এইটুকুই বুঝি যে আমি পরের চাকর নই, স্বাধীনভাবে উপার্জন করি। সরকার আমাকে গভর্নমেণ্ট প্লীডার আর পাবলিক প্রোসিকিউটার করেছেন বলে আমি তাঁদের কেনা গোলাম নই, কিন্তু সরকারী মামলা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে। পুলিশ না থাকলে ধন প্রাণ বিপন্ন হয়। পুলিস কেস যদি সত্য ঘটনামূলক না হয় কী করা যায় বলুন! কালো ভেড়া তো সব দলেই আছে। পুলিশের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া ওরাই বা করবে কী? কেস যদি কাঁচা হয় তবে ওটা কি সব সময় পুলিশের দোষে? এক একটা মামলা দারুণ জটিল। সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব সব মিলেই তো সত্য। জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গেলে মামলা ফেঁসে যেতে পারে। লোকটা খারাপ, কাজটা খারাপ, এই সরল ব্যাখ্যাই আদালতের সামনে পেশ করতে

হয়। সত্যিকার অপরাধীও ভগবানের চোখে নিরপরাধ হতে পারে। কিন্তু আইনের চোখে অপরাধী হলেই আমাদের জিৎ। পসারও নির্ভর করে জয়পরাজয়ের উপরে। আদালতও একপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্র। সভ্য সমাজে বিচারশালা আছে বলেই শৃঙ্খলা আছে, শান্তি আছে। নয়তো আইনকে যে যার হাতে নিত। একমাত্র আইন হতো জঙ্গল আইন। কিংবা আফ্রিদি বা মোহন্দ্‌দের মতো ব্লাড ফিউড। রহিম খান্ যদি করিম খান্‌কে মারে করিম খানের ছেলে রহিম খান্‌কে বা তার ছেলেকে মারবে। তার চেয়ে ভালো ইংরেজের আইন। করিম খানের ছেলে নয়, আদালতের বিচারই রহিমকে মারবে। আপনি আমি নিমিত্তমাত্র।" হালদার মশায় থামেন।

চায়ের সঙ্গে প্রচুর সুখাদ্য পরিবেশন করা হয়। হালদার অভুক্ত ছিলেন। মানসও তাঁর সঙ্গ রাখে। কিন্তু মনটা খচখচ করে।

"তা বলে সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশোল দিতে আপনার বিবেকে বাধে না?" মানস প্রশ্ন করে। "মামলাটা যাতে কেঁচে না যায়।"

হালদার মশায় সাফাই দিতে গিয়ে বলেন, "সে কাজ তো রাজনীতিক্ষেত্রে দু বেলা দেখা যায়। গান্ধীজীও উকিল, জিন্না সাহেবও উকিল। বিলিতী মতে ওঁরা ব্যারিস্টার। যে যার দলের হয়ে মামলা সাজিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সামনে পেশ করেন। ওটাই ওঁদের পেশা না হোক নেশা। মামলার হার জিতের উপরেই ওঁদের নেতৃত্ব নির্ভর করে। গান্ধীজীর অবশ্য আরো একটা বলপরীক্ষার ক্ষেত্র আছে। সেখানকার নিয়ম সত্যাগ্রহ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। জিন্না সাহেবের একমাত্র ক্ষেত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। সেখানেই পাশ হয় ভারত শাসন আইন। এখন কথা হলো কংগ্রেসের কেসটা কি ষোল আনা সত্য? আর মুসলিম লীগেরটা ষোল আনা অসত্য? কংগ্রেসই কি নিখিল ভারতের সব সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান? মুসলিম লীগ কি মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে না? আবার মুসলিম লীগ যদি বলে সে একাই সারা দেশের সব মুসলমানের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সেটাও কি অত্যুক্তি নয়? তা হলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানেরা দাঁড়ান কোথায়! গান্ধীজীর মনে অভিমান, বড়লাট কেন তাঁর সঙ্গে জিন্না সাহেবকেও পরামর্শের জন্যে ডাকলেন, এক একজনের সঙ্গে এক একরকম কথা বললেন! গান্ধী কথা বলবেন বড়লাটের সঙ্গে সর্বভারতের পক্ষে। আর জিন্না কথা বলবেন গান্ধীর সঙ্গে মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের পক্ষে। বড়লাটের সঙ্গে জিন্না সরাসরি কথা বলতে পারবেন না। তিনি উল্টো সুরে গাইলে ভারতের পক্ষে এককণ্ঠস্বর না হয়ে দুই কণ্ঠস্বর হবে। সেটা গান্ধীজীর মতে জাতীয় স্বাধীনতাবিরুদ্ধ। ওদিকে

জিন্না-সাহেব বলতে শুরু করেছেন যে জাতীয় বলতে বোঝায় হিন্দু জাতীয় তথা মুসলিম জাতীয়। দুই জাতির জন্যে দুই বাসভূমি। দুই স্বতন্ত্র স্বাধীনতা। হায়! সত্য আর অসত্যের কী রকম মিশোল! এটা ক্রমে ক্রমে জন আদালতেও পেশ হবে। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তারও পাল্টা দিতে যাচ্ছেন সাভারকর। ইংরেজদের মতো মুসলমানরাও বিদেশী তথা বিজেতা তথা বিধর্মী। অতএব এলিয়েন। একথা শুনলে কোন্ মুসলমানের না রক্ত গরম হয়ে ওঠে! তা দেখে হিন্দুর রক্তও যদি রাগে টগবগ করে তবে সে যা হবে তা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়, মল্লিক সাহেব।"

মানস বলে, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে সাভারকারও আরেক ব্যারিস্টার।"

"কিন্তু একটা দিনও প্র্যাকটিস করেননি। তাই তাঁর কাছে ভারতের দশকোটি মুসলমান এলিয়েন। বেশীর ভাগই তো ধর্মান্তরিত হিন্দুবংশীয়। এদের সবাইকে এলিয়েন করতে গেলে প্রতিফল পেতে হবে সমসংখ্যক হিন্দুকেও।" হালদার মশায় হুঁশিয়ারি দেন।

"সাভারকরের মামলাটা ডাহা মিথ্যা। যেমন হিটলারের আর্যত্বের মামলা। ইহুদীদের অন্য গতি নেই, কিন্তু মুসলমানদের তো আছে। যেখানে তারা মেজরিটি সেখানে তারা পাকিস্তান কায়েম করলে হিন্দুরাই হবে এলিয়েন। তখন তাদের রক্ষা করবে কে? সাভারকার?" মানস সে মামলা সরাসরি ডিসমিস করে।

"আপনি তো দু'দিন পরে বদলী হয়ে যাবেন, আমরাই মারা পড়ব, মল্লিক সাহেব। আর নয়তো ঘরবাড়ী ছেড়ে হিন্দুস্থানে আশ্রয় নেব।" হালদার কুণ্ঠিত।

"না, না, ওসব কিছু হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইংরেজরা যদি যায় তো তার আগে নিরাপত্তার পাকা বন্দোবস্ত করে যাবে। যেমন মুসলমানের তেমনি হিন্দুর। আর গান্ধীজীও সচেতন। জিন্না সাহেবও ধর্মান্ধ নন।" মানস অভয় দেয়।

"দেখুন, মল্লিক সাহেব, শাহ্ জাহানের বেঁচে থাকা আর না থাকা এ দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা তফাৎ ছিল। তা না হলে তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বেধে গেল কেন? দারা নিঃসন্দেহ জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু তৈমুরবংশের প্রথা অনুসারে নির্বিবাদে পিতৃসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ওয়ার অভ সাকসেসন অনিবার্য ছিল। পিতার মৃত্যুপর্যন্ত কারো তর সইল না। যে আগে দিল্লী দখল করতে পারবে তারই জবর দখল হবে ধারাবাহিক স্বত্ব। তাই দিল্লী অভিমুখে সশস্ত্র অভিযান। দারা হেরে যান, বন্দী হন, তখন শাস্ত্রীদের ইচ্ছায় শাস্ত্রীরা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। সে দণ্ড স্বয়ং বাদশা শাহ্ জাহানও মকুব করতে অপারগ।

এই তো ভারতের ঐতিহ্য। এদেশে এ ছাড়া আর কী আপনি আশা করেন? ভাইয়ে ভাইয়ে আপসে ভাগাভাগি করে নিলেই চলত। সেকালে এটা দারা শিকোর মাথায় আসেনি। তাই মাথাটা কাটা গেল। একালে যদি কেউ আপসে ভাগাভাগির প্রস্তাব তোলেন তাঁকে কেমন করে বোঝাবেন যে সেটা আইনবিরুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ বা প্রথাবিরুদ্ধ বা স্বার্থবিরুদ্ধ? ইংরেজদের দেওয়া ভারতশাসন আইন আমাদের নেতাদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা নিজেরাই কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি বসিয়ে স্বদেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে চান। তার মানে ভারতের স্থায়ী সংবিধান এখনো প্রণীত ও গৃহীত হয়নি। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ বা সিন্ধুপ্রদেশ বা পঞ্চনদ যদি সেলফ-ডিটারমিনেশনের দাবী তোলে সেটা কি অন্যায় দাবী? হ্যাঁ, অন্যায় হতো, যদি আগে থেকে একটা ঘরোয়া চুক্তি থাকত। ভাইয়ে ভাইয়ে চুক্তি। যেমন কংগ্রেস-লীগ চুক্তি। বা গান্ধী-জিন্না চুক্তি।" হালদার মশায় চিন্তান্বিত।

মানস চিন্তা করে। বলে, "এসব পয়েণ্ট ভেবে দেখবার মতো। বাংলাদেশ যদি বেরিয়ে যেতে চায় কে তাকে বাধা দেবে? দিলে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনা হবে। কিন্তু ওরা তো বাংলাদেশের সেলফ-ডিটারমিনেশনের কথা মুখে আনছে না। তুলছে মুসলিম সম্প্রদায়ের তথা মুসলিম নেশনের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী। বাংলাদেশ যদি দিল্লীর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় হিন্দুদের অনেকেও বিচ্ছিন্নতার পক্ষে ভোট দেবে। তারা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের উপর আস্থা হারিয়েছে। প্রশ্নটা সেক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন নয়। বাঙালী অবাঙালী প্রশ্ন। ফজলুল হক সাহেবকে হিন্দুরাও বিশ্বাস করে। তিনিও হিন্দুদের বিশ্বাস করেন। যে যাই বলুক বর্তমান মন্ত্রীসভা হিন্দুর স্বার্থবিরোধী নয়। কতক পরিমাণে জমিদারস্বার্থবিরোধী, বহু পরিমাণে মহাজনস্বার্থবিরোধী। কিন্তু জমিদার কি মুসলমানদের মধ্যে নেই? আর মহাজন বলতে কাবুলী মহাজনও বোঝায়। এই তুচ্ছ কারণে হিন্দুরা এই মন্ত্রীমণ্ডলের আসন টলাতে যাবে না। তবে এঁরা যদি হিন্দু অফিসার শ্রেণীর উপর ক্রমাগত অবিচার করে যান তা হলে অবশ্য তাঁদের আস্থা হারাবেন। তাঁদের অনাস্থা ধীরে ধীরে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যেও চারিয়ে যাবে। আমি পড়ে যাব উভয় সঙ্কটে। মুসলমানদের আমি ভালোবাসি। তারাও আমাকে ভালোবাসে। আমার মতে এটাও একটা তুচ্ছ কারণ। কিন্তু আমার সহকর্মী হিন্দু অফিসারদের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন। আমি পদত্যাগের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছি।" মানস হালদারকে বিশ্বাসভাগী করে।

"সে কী কথা! আপনি পদত্যাগ করতে যাবেন কেন? এসকেপিস্ট? এসকেপ করে কোথায় পালাবেন আপনি? ...ষণ। নিষিদ্ধ মাংস

সেখানেই দেখবেন হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে, সুতরাং মতান্তর আছে, মতান্তর থেকে মনান্তরও আছে, মনান্তর থেকে ঝগড়াঝাটিও আছে, ঝগড়াঝাটি থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামাও আছে। শাহ্‌জাহান বেঁচে থাকতেই এই। মারা গেলে তো দেশের অবস্থা চরমে উঠবে। পলায়ন এ সঙ্কটের সমাধান নয়। তা ছাড়া সঙ্কট থেকে হতভাগ্যদের ত্রাণ করবে কে, আপনি যদি পালান বা আমি যদি পালাই। না, মল্লিক সাহেব, আমরা পালাব না। অভয় দেব।" হালদারের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

পদত্যাগের জের টেনে মানস জিজ্ঞাসা করে কংগ্রেস মন্ত্রাদের পদত্যাগ সম্বন্ধে হালদার মশায়ের মত কী। তিনি একটুও ইতস্তত না করে উত্তর দেন, "কাজটা চটকদার হতে পারে, কিন্তু অনুচিত হয়েছে, মল্লিক সাহেব। লাটসাহেব কি মন্ত্রীদের শাসনকর্মে হস্তক্ষেপ করেছিলেন? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি কংগ্রেসকে প্রোভোকেশন দিয়েছিলেন? আরে, বাবা, ডিফেন্স এখনো হস্তান্তরিত হয়নি, ওটা ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টেরই দায়িত্ব। ফরেন অ্যাফেয়ার্স? না, সেটাও হস্তান্তরিত হয়নি, সেটাও তাঁদেরই দায়িত্ব। গায়ে পড়ে ইস্তফা দেওয়ার তো কোনো সঙ্গত কারণই দেখিনে। আরো একবছর অপেক্ষা করলে হয়তো একটা সত্যিকার উপলক্ষ জুটত। যেমন যুদ্ধের জন্যে নতুন কোনো ট্যাক্‌স বসত। কিংবা জোর করে রংরুট ধরে নেওয়া হতো। ব্যাপারটা আসলে তা নয় কিন্তু। আর মাস কয়েক বাদে আবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দলীয় নির্বাচন। সে সময় সুভাষ না হোক ওঁর বামপন্থী গোষ্ঠীর একজন দাঁড়াত ও হাই কমাণ্ডের নমিনীকে হারিয়ে দিত। এবার আর গান্ধীজীর কাছে যাওয়া নয়, সরাসরি আপনার লোক দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। হাই কমাণ্ড ঢেলে সাজা। ফলে প্রত্যেকটি প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলের রদবদল। তখন তো গদী যেতই, গেলে বেড়াল কুকুরও কাঁদত না। তাই এখন থেকেই মানে মানে বিদায়। যেন মস্ত বড়ো একটা ত্যাগ। একেই বলে, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।"

মানসও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে। তা বলে সে একমত নয়। বলে, "এটা কিন্তু কংগ্রেসনেতাদের প্রতি কটাক্ষপাত। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।"

"মল্লিক সাহেব," হালদার মাফ চেয়ে বলেন, "আপনি রাজনীতিক্ষেত্রে একটি খোকা। শেফার্ড সাহেবও যে আপনার চেয়ে বেশী বোঝেন তা নয়। দেখি তিনি মহা উত্তেজিত। কংগ্রেস মন্ত্রীরা জেলে যাবেন বলে আগেভাগে জেল কোড সংস্কার করে রেখেছেন। এমন ধড়িবাজ যে দল তাকে বিশ্বাস কী? আমি তখন কংগ্রেসের পক্ষেই ওকালতি করি। অথচ আপনি বলছেন কটাক্ষপাত। তা নয়। আমি

সম্পূর্ণ নির্দলীয়। সুভাষও আমার কেউ নয়। তবে ওই বুড়োরা ছেলেটাকে ফাঁকি দিল। শেফার্ডকে বলি, সাহেব, তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়। ওরা মাস কয়েক বাদে ফিরে আসবেই। যখন দেখবে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদে ওদেরই নমিনী জিতেছেন। সুভাষদের আরো একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন কি ওরা ধৈর্য ধরতে পারবে? ছেলেমানুষের দল। হৈ হৈ করে জেলে চলে যাবে। তখন মন্ত্রীদের পুনঃপ্রবেশ। ইতিমধ্যে একটা মুখরক্ষাকারী সূত্র খুঁজে বার করা চাই। যাতে মানে মানে প্রত্যাবর্তন সুগম হয়। নইলে লোকে দুয়ো দেবে। কেন্দ্রে একটা রদবদল কি সম্ভব নয়? শেফার্ড সাহেব তো রেগে টং। বলেন, আগে তো ওরা মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করুক। নইলে মুসলমানরা আমাদের সিপাহী সংগ্রহে বাগড়া দেবে। লড়াইটা চালাবে তবে কারা? ওইসব পেটমোটা হিন্দু বানিয়া? যাদের মুখপাত্র দ্যাট ম্যান গ্যাণ্ডী। আমি বলি, দ্যাট ম্যান ইজ আ মহাত্মা। তা শুনে সাহেব আরো ক্ষেপে যান। বলেন, টেল দ্যাট টু হিটলার। আমি তো বোকা বনে যাই। অথচ এই শেফার্ডই আমাকে মাস খানেক আগে বলেছেন, থ্যাঙ্ক গড ফর মহাট্‌মা গ্যাণ্ডী। তখন গান্ধীজী সহানুভূতি জানিয়েছিলেন কিনা। সাহেবকে বলি, ইংরেজদের মতো কূটনীতিবিশারদ আর কোন্‌ জাত! ভেবে চিন্তে বার করুন আপনারা একটা কমপ্রমাইজ ফরমুলা। তা হলে দেখবেন কংগ্রেস নেতাদের বদলে যাবে মতটা। সাহেব গোসা হয়ে বলেন, গ্যাণ্ডী যা বলবেন কংগ্রেস নেতারা তাই করবেন। তাই কমপ্রমাইজ অসম্ভব।"

মানস আর কথা বাড়ায় না। করমর্দন করে বিদায় নেয়। তিনি তাকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "দেখবেন গরিবের কথা বাসী হলেই ফলে।"

রোজগারের দিক থেকে পয়লা নম্বর উকিল মোহিনীমোহন ধর ইদানীং তার ওকালতির পেশা ছেড়ে রাজনীতির নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। সেটা কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতি নয়, যা নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। তিনি কৃষক প্রজা দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শীর্ষস্থানীয় নেতা। কংগ্রেসে যেমন বহু মুসলমান রয়েছেন কৃষক প্রজা দলেও বহু হিন্দু। দলটি ধর্মনিরপেক্ষ। যে যার ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে, সে যার সমাজে বিয়ে সাদী করতে পারে, কিন্তু রাজনীতি অর্থনীতির বেলা কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই কৃষক প্রজা বা তাদের দরদী। বড়ো বড়ো মামলায় তিনি এখনো আদালতে হাজির হন, মোটা ফী নেন। কিন্তু তার বেশীর ভাগই চলে যায় দলের তহবিলে। তা দিয়ে তিনি একরাশ কর্মী পুষছেন। বেশীর ভাগই মুসলমান। আদালতের বাইরে তিনি সারাক্ষণ মুসলিম পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। নিষিদ্ধ মাংস

ছাড়া আর সবই একসঙ্গে বসে খান। ফলে হিন্দু মহলে বিশেষ অপ্রিয়। হিন্দু উকিলরা বলেন তিনি প্রচ্ছন্ন মুসলমান। অথচ দুর্গাপূজায় কালীপূজায় সরস্বতী পূজায় হিন্দুরাই তার কাছ থেকে চৌথ আদায় করে সব চেয়ে বেশী। তিনিও হাসিমুখে তাদের খাঁই মেটান। একশো দু'শো টাকা তাঁর কাছে নস্যি। কাউকে একশোর কমে দেন না। কাজেই হিন্দু ভোট নির্বাচনের দিন তাঁর পাতেও পড়ে।

তাঁর এক ভাই মুস্তাফীর সঙ্গে গতবার যুদ্ধে যান। সেই সুবাদে মুস্তাফীরও তিনি দাদা। একদিন মুস্তাফীর ওখানে নিমন্ত্রণে মানসের পাশে মোহিনীবাবুর আসন। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ মিলির নিরাপদে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ। ডোভার থেকেই সে লম্বা এক কেবল পাঠিয়েছে। বলেছে সব ভালো যার শেষ ভালো। ধন্যবাদ জানিয়েছে মানসকে, যুথিকাকে, শেফার্ডকে, জাফর হোসেনকে ও আরো কয়েকজনকে। তাই এঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন মুস্তাফী। শেফার্ড ও জাফর হোসেন এখন টুরে। তাঁদের খালি জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মোহিনীবাবুকে ও হালদার মশাইকে। বারের দুই নেতাকে। বিভিন্ন মামলায় এঁরা দু'জনেই পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়ান। হালদারের ফী পরিমিত, ধরের অপরিমিত। তা বলে হালদারের হাত কম দরাজ নয়। কিন্তু তিনি রাজনীতির পেছনে টাকা ঢালেন না। তিনি ভোটপ্রার্থী নন, মন্ত্রিত্বপ্রার্থীও নন। মানস শুনেছিল যে হক সাহেব নাকি মোহিনীবাবুকেও মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, গভর্নর তাতে রাজী হননি। কৃষক প্রজাদের বরাদ্দ আসন শুধুমাত্র মুসলমানদেরই বরাতে জোটে।

এই নিয়ে কথা উঠতেই মোহিনীবাবু বলেন, "দশচক্রে ভগবান ভূত। হক সাহেবও আমাদের মৌলানা ইসলামাবাদীর মতে আর একটি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। নিজের দল ছেড়ে এখন পরের দলে মোড়লী করছেন। বোঝেন না যে প্রথম সুযোগেই নাজিমউদ্দীন আর সুহরাবর্দী সাহেবরা ওঁকে মোড়ল পদ থেকে হটাবেন। জিন্নার সঙ্গে এতকাল তাঁর রেষারেষি চলছিল। এখন শুনছি মিটমাট হয়েছে। উপরের দিকের রাজনীতিতে জিন্না যা বলবেন তাই হবে। তলার দিকের রাজনীতিতে হক যা বলবেন তাই হবে। হক সাহেবও জপ করছেন পাকিস্তান। তবে একটা নয়, একজোড়া পাকিস্তান। কিন্তু কৃষক প্রজা দল এতে কিছুতেই রাজী হতে পারে না, মিস্টার মল্লিক। এই ইস্যুতে দল ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে। আমরা কেন জিন্নার নির্দেশ মান্য করব? আমরা কেন পাকিস্তানে যাব?"

মানস দুঃখিত হয়ে বলে, "আপনাকে তা হলে রাজনীতিক্ষেত্রে অনাথ হতে হবে।"

"তার জন্যে আমি পরোয়া করিনে, মিস্টার মল্লিক। আমার পপুলারিটি তাতে একফোঁটাও কমবে না। পীপল আমার সঙ্গে। আমিও পীপলের সঙ্গে। মাসে যদি এক হপ্তা আদালতে যাই তো তাতেই আমার একমাসের খরচ উঠে আসে। তার বেশী এ বয়সে আর আমি চাইনে। ছেলেরা বড়ো হয়েছে, তারাও ভালোই করছে। আমার ছায়া সরিয়ে নিলে তারা আরো ভালো করবে। বুড়ো বয়সে লোকে কাশী বৃন্দাবন যায়। মনে করুন আমিও একহিসাবে তীর্থবাসী। আমার তীর্থ কিন্তু মানবতীর্থ। এদেশের কৃষক প্রজার দুর্দশার সীমা নেই। এদের জন্যে যদি কিছু না করে যাই তো স্বর্গে আমাব স্থান হবে না, মিস্টার মল্লিক। স্বর্গ যদি থাকে।"

মুস্তাফী কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, "কৃষক প্রজার দুর্দশার কথাটা তো শেফার্ড স্বীকারই করতে চান না, দাদা! শেফার্ডের মতে ওদেশের কৃষক প্রজাদের তুলনায় এদেশের কৃষক প্রজারা ভাগ্যবান। ওদেশে নাকি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেও জমিদারের অনুমতি নিতে হয়। বিংশ শতাব্দীতেও ফিউডাল ব্যবস্থা খাস বিলেতেই এখনো কায়েম রয়েছে। সাহেব আমাকে বলেন, হোয়াই নট সেণ্ড মোহিনী টু মাই কান্ট্রি? কৃষক প্রজা আন্দোলন এদেশের চেয়ে ওদেশেই আরো দরকার।"

"তার মানে," মোহিনীবাবু হেসে বলেন, "শেফার্ড আমাকে শীপ বানাতে চায়। আমি শীপ নই। আমি সাহেবদের কথায় ওঠ বস করিনে। তোমার ওই নাজিম-উদ্দীনের মতো। কী কৌশলেই না ওরা ও বেচারাকে রাজনীতিতে টেনে এনেছে। প্রথমে করে দেয় গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউনসিলের মেম্বর। সে পদ যখন উঠে যায় তখন ওকে বানাতে চায় নতুন মন্ত্রীমণ্ডলের প্রাইম মিনিস্টার। সার জন অ্যাণ্ডারসন আর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি গিয়ে বিদায়ী এম. এল. এ-দের জনে জনে সাধেন, আপনারা ফিরে এলে নাজিমউদ্দীনকেই প্রাইম মিনিস্টার করবেন। তা ও বেটাদের ফিরে আসতে দিচ্ছে কে? এদিকে যে হক সাহেবকে শীর্ষে রেখে কৃষক প্রজা দল গড়ে তুলেছি আমরা পুরনো কংগ্রেস ও খেলাফৎ কর্মীরা। আমরা যারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি যে কংগ্রেস আর কোথাও না হোক বাংলাদেশে রায়তের নয়, জমিদারের পক্ষে। খেলাফৎ তো একটা লস্ট কজ। খলিফা কোথায় যে খেলাফৎ থাকবে? খলিফার জায়গায় মুসলিম লীগ এখন জিন্নাকেই বানাতে চায় আরেক রকম খলিফা। বাংলার মুসলমান কেন তাঁকে খলিফার মতো মানবে? দিল ওরা হক সাহেবের দলকেই জিতিয়ে। নাজিম সাহেব গেলেন দুই জায়গায় হেরে। কিন্তু এমনি আমাদের অদৃষ্ট যে আমাদের দল একক মেজরিটি পায় না। কোয়ালিশনের জন্যে কংগ্রেসকে ডাকে। কংগ্রেস সাড়া দেয় না। ওদের পলিসি

নাকি আর কোনো দলের সঙ্গে কোয়ালিশন না করা। ওদের ইচ্ছাটা নাকি এই যে হক সাহেবকেও সদলবলে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। তার পরে সবাই মিলে স্থির করবে কাকে প্রধানমন্ত্রী করবে। হক সাহেবকে না শরৎ বোসকে। সেটা হক সাহেব কেন মেনে নেবেন? এমন অবস্থায় মুসলিম লীগের সঙ্গেই হাত মেলাতে হয়। ওদের দলকেই ছেড়ে দিতে হয় হোম মিনিস্টার প্রভৃতি কয়েকটি হোমরা চোমরা গদী। স্বয়ং হকসাহেবকেই নিতে হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রীর যা পাওনা। ক্রমে ক্রমে মালুম হয় মুসলিম লীগই সিনিয়র পার্টনার। কৃষক প্রজা দল জুনিয়র পার্টনার। নাজিম সাহেবই আরো শক্তিমান। হক সাহেবের মুখে এখন শোনা যাচ্ছে ন্যাশনালিস্ট যে সে মুসলিম নয়, ন্যাশনালিজম আর ইসলাম পরস্পরবিরোধী। আর একটি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড।"

মানস শুনে দুঃখিত হয় যে কৃষক প্রজাদের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব ক্রমে ক্রমে ধর্মভিত্তিক নেতৃত্বের খপ্পরে পড়ে চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে কংগ্রেসের অদূরদর্শিতাও কম দায়ী নয়। বাংলাদেশে কোয়ালিশন ছাড়া আর কী সম্ভব হতে পারে? কস্মিন্ কালেও কি কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে? বাধ্য হয়ে একদিন তাকে অপর একটি দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হবে। সেই দলটি যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর তার প্রধান নেতা যদি ধর্মভিত্তিক দলের দলপতি হয়ে মুসলিম লীগকেই দলে ভারী করেন তা হলে আর কোয়ালিশনেরই প্রয়োজন হবে না। কংগ্রেস কোণঠাসা হবে।

হালদার মশায় এতক্ষণ মৌন ছিলেন। এবার তিনি মুখর হন। "পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে ক্রিকেটখেলার মতো একটা দল যখন ব্যাট ধরে তখন আরকটা দল বোল করে। একটা দল যখন গভর্নমেণ্ট চালায় আরেকটা দল তখন অপোজিশন চালায়। নির্বাচনে হার জিৎ নির্ধারিত হলে অপোজিশন হয়তো মেজরিটি পেয়ে গভর্নমেণ্ট গঠন করে, শাসকদল অপোজিশনের ভূমিকা নেয়। নয়তো শাসকদলই আবার শাসন চালায়, অপোজিশন বিরোধিতা করে যায়। কিন্তু বরাবরই তার মনে এই আশা থাকে যে তার উপরেও একদিন শাসনভার বর্তাবে। এই আশাটুকু যদি নিবে যায় তবে সে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপরেই আস্থা হারায়। তখন সে বামপন্থী হয়ে থাকলে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে আর দক্ষিণপন্থী হয়ে থাকলে দেশভাগের। বামপন্থীরা এদেশে সংখ্যালঘু। নির্বাচনে যাদের জয়লাভ সুদূরপরাহত। তারা তো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবেই। তেমনি মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা জানেন যে নির্বাচনে তাঁরা কয়েকটি প্রদেশে মেজরিটি পেতে পারেন, কিন্তু সারা

ভারতে কখনো নয়। তাঁদের একমাত্র আশা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী চুক্তি, যেমন ১৯১৬ সালের লখ্‌নউ প্যাক্ট। কিন্তু চুক্তি হয় সমানে সমানে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেসের ভোট মুসলিম লীগ ভোটের প্রায় তিন গুণ। ভবিষ্যতে সব ক'টা মুসলিম আসন লীগের দখলে এলেও কংগ্রেসের একক মেজরিটি অটল অনড়। সুতরাং কংগ্রেসই হবে কোয়ালিশনের সীনিয়র পার্টনার। যদি তেমন কোনো চুক্তি সম্ভব হয়। অথচ জিন্না সাহেবের স্বপ্ন ইকুয়াল পার্টনারশিপ। এ স্বপ্ন তিনি এখনো ছাড়েননি। তবে ক্রমশই উপলব্ধি করছেন যে হিন্দু জনমত কিছুতেই তাঁর সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় স্তরে প্যারিটি দেবে না কিংবা শতকরা চল্লিশ অবধি ওয়েটেজ দেবে না, দিলে অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অনুরূপ ওয়েটেজ দিয়ে হিন্দু মেজরিটিকে মাইনরিটিতে পরিণত হতে হয়। এই উপলব্ধি তাঁকে নিজের স্বপ্ন ছেড়ে ইকবালের স্বপ্ন দেখতে প্ররোচিত করছে। তার মানে পাকিস্তানের স্বপ্ন। মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে সংগঠিত হবে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। এক বা একাধিক। সেখানেও কংগ্রেস লীগ দুই দলই থাকবে, কিন্তু উল্টে যাবে তাদের ভূমিকা। লীগ হবে সীনিয়র পার্টনার, কংগ্রেস হবে জুনিয়র পার্টনার। যদি তারা চুক্তিবদ্ধ হয়। নয়তো লীগই তার একক মেজরিটির জোরে গভর্নমেণ্ট চালাবে, কংগ্রেস হবে তার অপোজিশন। দুই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যেও পরে একটা চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তি হতে পারে। যদি তারা হয় সমান সমান। সেকথা মনে রেখে জিন্নাসাহেব মুসলিমপ্রধান পাঁচটি প্রদেশের উপর ওয়েটেজ হিসাবে আসামকেও জুড়ে দিতে চান। ইকবালের স্বপ্নের চেয়ে জিন্না সাহেবের স্বপ্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে আরো মনোমুগ্ধকর। এখন কথা হচ্ছে হিন্দু বেড়ালের গলায় ঘণ্টি বাঁধবে কে? ইংরেজ সরকার? না কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি? আমি তো ভেবে পাইনে। তোমার কী মনে হয়, মোহিনী?"

মোহিনীবাবু চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন। চোখ মেলে বলেন, "বাসুদেব, তুমি ধরে নিয়েছ যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী ব্রিটেনের মতো ভারতেরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? কমিউনিস্টরা তা বিশ্বাস করে না। প্রথম সুযোগেই ওরা ধনতন্ত্র তথা গণতন্ত্র লোপ করবে। লীগপন্থী মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু যেখানে তাঁদের সম্প্রদায়ের মেজরিটি সেখানেই করেন, অন্যত্র নয়। এই বিশ্বাস তাঁদের প্রেরণা দিচ্ছে পার্টিশনের। একান্নবর্তী পরিবারের ছোট ভাইয়ের মতো। কিংবা এজমালী জমিদারির ছোট শরিকের মতো। আমি তো এতে নীতিগতভাবে অন্যায় কিছু দেখিনে। অন্যায় যেটা সেটা হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দ্বিতীয় এক কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড হিসাবে গাওয়া।"

॥ আঠারো ॥

যুদ্ধ এতদিন সুদূর ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই শহরের বুক দিয়েই সৈন্য চলাচল শুরু হয়ে গেছে। আস্ত একটা রেজিমেণ্ট এখানে এসে বিশ্রাম করছে, কিছুদিন পরে দক্ষিণমুখে যাত্রা করবে। চট্টগ্রাম থেকে জলপথে বা স্থলপথে বর্মা মালয় সিঙ্গাপুর অভিমুখে। রেজিমেণ্টাল মেস থেকে নিমন্ত্রণ এল। সান্ধ্য পার্টিতে মিস্টার ও মিসেস মল্লিক যদি যোগ দেন কমাণ্ডাণ্ট তাঁদের আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবেন।

যুথিকা সাফ শুনিয়ে দেয়, "তুমি চাকরি করছ। তুমি যেতে বাধ্য। আমি তো চাকরি করিনে। আমার কী বাধ্যবাধকতা!"

মানস চুপ করে থাকে। যুদ্ধযাত্রী মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে তাঁদের সহধর্মিণীরা নেই। সিভিল অফিসারদের পত্নীরা যদি বিব্রত বোধ করেন তবে তাঁদের বাড়ীতে রেখে যাওয়াই তো সুবুদ্ধি। অথচ সেটাও অস্বস্তিকর। এসব ক্ষেত্রে ক্যাপটেন লাহার মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হয়।

"কেন, তোমার মিসেস কি লাটসাহেবের পার্টিতে যোগ দেননি? তা হলে কমাণ্ডাণ্টের বেলা আপত্তি কিসের? ওরা বাঘও নয়, ভালুকও নয়, খাসা ভদ্রলোক। মিলিটারিকে লোকে যমের মতো ভয় করে। যম ওরা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধকালে ওদের শত্রুপক্ষের।" ক্যাপটেন লাহা অভয় দেন।

"না, দাদা, ওর আপত্তিটা ভয় থেকে নয়। কথা হচ্ছে, অত বড়ো একটা শোকের পর তুচ্ছ সামাজিকতায় ওর অরুচি ধরে গেছে। দেবে তো রকমারি মদ। ওসব আমাদের চলে না।" মানস যুথিকার হয়ে কৈফিয়ৎ দেয়।

"আরে, ওটা কি একটা কথা হলো! মদ খেতে না চাও খেয়ো না। সফ্‌ট

ড্রিংকস তোমাদের জন্যে মজুত থাকবে। কিন্তু মিসেস মল্লিক যদি না যান কথা উঠবে। কে না জানে তিনি এখানকার ফার্স্ট লেডী? মিসেস শেফার্ড বা মিসেস বার্লো না থাকলে মিসেস মল্লিকই তো এই স্টেশনের অগ্রগণ্য মহিলা। তিনি যোগ না দিলে আর কে তাঁর স্থান নেবেন? মিসেস হায়দার, মিসেস জাফর হোসেন এঁরা তো পর্দানশীন। মিসেস বক্সী? হা হা হা! আমি তো ভেবে পাইনে মিসেস মল্লিক থাকতে মিসেস বক্সী কী করে ফার্স্ট লেডীর পার্ট প্লে করবেন? এটা কি টেনিস?" ক্যাপটেন লাহা হাসি চাপতে পারেন না। টেনিসের বেলা ঐ মহিলা হাফ প্যাণ্ট পরে দৌড় ঝাঁপ করেন।

"তা হলে আপনিই বুঝিয়ে বলুন আপনার বোনকে।" মানস সে ভার নেবে না।

ক্যাপটেন লাহার কথা শুনে যূথিকা বলে, "আমাকে মাপ করবেন, দাদা। আমি ক্লাবেই যাইনে, ক্লাবের পার্টিতেই যোগ দিইনে, লক্ষ করেছেন নিশ্চয়। নেহাৎ অভদ্রতা হবে বলে পারিবারিক নিমন্ত্রণ এড়াতে পারিনে, কিন্তু এটা হলো পরিবারের বাইরের নিমন্ত্রণ। এ ধরনের জীবনে আমার বৈরাগ্য এসেছে। আগে যদি আসত তা হলে হয়তো অমন শোচনীয় ঘটনা ঘটত না। বিপথে চলেছি বলেই বিপদে পড়েছি। কারো জন্যে কিছু আটকায় না। কামাণ্ডাণ্টের পার্টি এসব ছোট খাটো মফস্বল স্টেশনে জমতে পারে না, এটা ওঁরাও জানেন। না জমলে মিসেস শেফার্ডকে বা মিসেস বার্লোকে দোষ দিন। কেন ওঁরা বিলেতে গিয়ে বসে আছেন?" যূথিকা অনুযোগ করে।

"মিসেস শেফার্ড এমনতরো ছোটোখাট স্টেশনে আরাম পান না বলেই বিলেতে সময় কাটাচ্ছেন। আর শেফার্ডও তো মাসে বিশ দিন টুর করে বেড়ান, বাকী দশ দিন স্তূপীকৃত ফাইল সাফ করেন। স্ত্রীকে সঙ্গ দেবেন কখন? আর বার্লোর তো ডিভোর্স ঘটে গেছে। কার দোষে তা বলতে পারব না। মিসেস বার্লো এখন অন্যের স্ত্রী। তা ছাড়া বিলেতে থেকে ছেলের পড়াশুনা দেখাও তো মায়ের কর্তব্য।" ক্যাপটেন তাঁদের মুখরক্ষা করেন।

"মায়ের কর্তব্য যদি বলেন তো আমারও সেই একই জবাবদিহি। আমার কোলের বাছাকে কার কাছে রেখে আমি পার্টিতে যাব? আয়াদের আমি বিশ্বাস করিনে, তাই আয়া রাখিনে। বুড়ো বেয়ারাটি খুব বিশ্বাসী। ওই ওদের ভুলিয়ে রাখে বলেই আমি মাসে একদিন কি দু'দিন বেরোতে পারি। তাও দিনের বেলা। ব্যতিক্রম একবার কি দু'বার ঘটেছে। যেমন মধুমালতী মুস্তাকীর বিয়ে।" যূথিকা স্মরণ করে।

ক্যাপটেন লাহা এর পরে মিলির আনকোরা খবর জানতে আগ্রহ দেখান। আছে কেমন মেয়েটা আচমকা বিয়ে করে ও তড়িঘড়ি বিলেত গিয়ে? বিশেষত অমন যে চণ্ডিকা চামুণ্ডী।

যুথিকা সলজ্জভাবে বলে, "কোন্ মেয়ে না চায় বিয়ে থা করে সুখী হতে? সুখী করতে? আপনি তো মেয়েদের সবাইকে ফাঁকি দিলেন, দাদা। নইলে দেখতেন মিলির মতো কোনো এক চণ্ডিকা কি চামুণ্ডী আপনাকেও সুখী করে সুখী হতো। আপনার বোধহয় এদেশের মেয়েদের কাউকেই মনে ধরে না। মনটা বোধহয় পড়ে রয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে কোনো এক রাজকন্যার কাছে।"

লাহা কবুল করেন যে ওটা ওঁর প্রথম বয়সের স্বপ্ন। যে বয়সে বিলেত যাবার কথা সে বয়সে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়েই না সব গোলমাল হয়ে যায়। এখন কমাণ্ডাণ্টকে ধরে যদি ফ্রন্টে যেতে পারেন তা হলে আপাতত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় গেলেও পরে ফ্রান্সে বেলজিয়ামে জার্মানীতেও বদলী হতে পারেন। যুদ্ধের পরে তিনি অবসর নিয়ে বিলেতেই ঘর বাঁধবেন। তখন ঘরণীরও প্রয়োজন হবে। এদেশ থেকে কেই বা ওদেশে যেতে চাইবে? অগত্যা তিনি ওদেশেই স্বপ্নের সার্থকতা অন্বেষণ করবেন।

মিলির খবর যুথিকা ইতিমধ্যে আরো কিছু পেয়েছে। বেডফোর্ড কলেজ ওকে নিতে রাজী হয়নি। একজনের বদলে আরেকজনকে নেওয়া ওদের রীতি নয়। জুলি পড়াশুনা করেছিল বলে তার কেসটা ওরা সদয়ভাবে বিবেচনা করেছিল। মিলি তো এই প্রথম ওদেশে যাচ্ছে। এদেশের ডিগ্রীও নেই। বিপ্লব করতে গিয়ে কলেজের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারত, অসুখের দরুন সেটাও হয়ে ওঠেনি। বেডফোর্ড ওসব অজুহাত শুনবে না। তাই বেচারিকে নিরাশ হতে হয়েছে। তা বলে সে বসে থাকেনি। বইয়ের দোকানের কাজে ভিড়ে গেছে। আর কিছু না হোক রোজগার তো হচ্ছে। ভদ্রঘরের মেয়েরা কেউ রোজগার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। তা সে যত কমই হোক না কেন।

ক্যাপটেন লাহা হায় হায় করেন। "ওই অগ্নিকন্যার কিনা এই পরিণতি! বইয়ের দোকানের সেলসগার্ল! তার চেয়ে ও মেয়ে শহীদ হলো না কেন! লোকে ধন্য ধন্য করত। ওর বরের তো শুনেছিলুম লর্ড আর লেডীরা মুঠোর মধ্যে। তাঁদের একজন সুপারিশ করলে কলেজে জায়গা হতো না?"

"সুকুমারদা নাকি চেয়েছিলেন সার জন অ্যাণ্ডারসনের শরণ নিতে। কিন্তু মিলি নাকি আগুন হয়ে বলে, খবরদার! কালিদাস বলে গেছেন 'নাধমে লব্ধকামা'। উত্তমের

কাছে অনুরোধ করে ব্যর্থতাও বরং ভালো, তবু অধমের কাছে হাতযোড় করে সিদ্ধিলাভ ভালো নয়। মিলি এখনো অগ্নিকন্যা, তবে ছাইঢাকা আগুন।" যূথিকা ওকে শ্রদ্ধা করে।

যেখানে ছিল ফাঁকা খেলার মাঠ সেখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে সামরিক শিবির। হাজার দুয়েক সৈনিকের ছাউনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাপটেন লাহা তাঁর গাড়ীতে করে মানসকে নিয়ে যান অফিসারদের মেসে। রীতিরক্ষার জন্যে নামের কার্ড যথাস্থানে লগ্ন হয়। কমাণ্ডাণ্ট এসে সাদরে করমর্দন ও কুশলপ্রশ্ন করেন। তার পর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অতিথিদের সংখ্যা তো কম নয়। সারা শহরের গণ্যমান্যরা ভেঙে পড়েছেন মিলিটারির সঙ্গে মেলামেশা করতে। করমর্দন ও কুশলপ্রশ্ন। ওইপর্যন্ত বাক্যালাপ। বাকীটা পানভোজন।

ক্যাপটেন লাহা কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে লেপটে থাকেন। তিনিই তাঁর সিভিল অ্যাডভাইজার। আমন্ত্রিতদের কার কী পরিচয় তিনিই শোনান। মানস চেষ্টা করে চেনা মানুষ খুঁজে পেতে বার করতে। মহিলাদের মধ্যে চোখে পড়ে মিসেস বক্সীকে। শাড়ী পরা প্রজাপতির মতো সাজে শোভা পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করেন যূথিকাদি কোথায়। মানস মুশকিলে পড়ে। সত্য বলতে সাহসে কুলয় না, মিথ্যা বলতে বিবেকে বাধে, শুধু বলে, "তিনি মাফ চেয়েছেন।"

বক্সী তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে ফিক করে হাসেন। "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য। নহিলে খরচ বাড়ে। সাজগোজের খরচ।"

বক্সীরাও উধাও হয়ে যান। এমন সময় একটি ইংরেজ ছোকরা এসে মানসকে খুব খাতির করে চারদিক ঘুরিয়ে দেখায়। লেফটনাণ্ট উইলকিনসন তার নাম। বছর আঠারো কি উনিশ তার বয়স। এই সেদিন দেশ ছেড়ে সৈন্যদলে চাকরি করতে বেরিয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। একদল ডোগরা জওয়ানকে নিয়ে ফ্রণ্টে চলেছে। জানে না কী আছে কপালে। মরণ না বন্দীদশা।

"হোমের জন্যে মন কেমন করে না?" সস্নেহে প্রশ্ন করে মানস।

"ওয়েল, সার, হোমে যদি সবাই থাকতে চায় তো এম্পায়ার রক্ষা করবে কে? এটা কিন্তু আপনাদেরই দায়িত্ব। আপনারাও এগিয়ে আসুন। আমাদের এখানে ক্যাম্প করার উদ্দেশ্যই হলো আপনাদের মনে দেশরক্ষার আগ্রহ সঞ্চার করা। আর আপনাদের শুভকামনা লাভ করা। সৈনিকদের মনোবলের জন্যে এটারও প্রয়োজন।" ছেলেটি সরল মনে বলে যায়।

মানস বলতে পারত যে এর জন্যে চাই রাজনৈতিক মীমাংসা। কিন্তু বিষয়টা এত

জটিল যে বিলেত থেকে সদ্য আগত একটি অল্পবয়সী সাব-অলটার্নকে বোঝানো যাবে না। বলে, "আমার আন্তরিক শুভকামনা সৈনিকদের সকলের প্রতি। পারলে আমিও লড়তে যেতুম। ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে হবে। ভারতকেও।"

"অজস্র ধন্যবাদ, সার।" ছেলেটির চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা।

সাধারণ ইংরেজ সাধারণ ভারতীয়ের শত্রু নয়। সাধারণ ভারতীয়ও সাধারণ ইংরেজের শত্রু নয়। পরস্পরকে রক্ষা করাই পরস্পরের কর্তব্য। অথচ রাজনৈতিক কারণে জনমত ক্রমেই ব্রিটিশবিরোধী ও যুদ্ধে উদাসীন হচ্ছে। এখানে ওখানে শিবির করে জনসমর্থন অর্জন করা অত সহজ নয়। কিন্তু যারা মৃত্যুপথযাত্রী তাদের মনোবল বজায় রাখাও জরুরি।

শিবিরে অনেক রকম অস্ত্র শস্ত্র ছিল। সেসব পরিদর্শন করা সন্ধ্যাবেলা সম্ভব নয়। তার জন্যে দিনের বেলা আবার আসতে হয়। কিন্তু সময় কখন? আদালতে ব্যস্ত থাকতে হবে। লেফটেনান্ট উইলকিনসন মানসকে গছিয়ে দেয় মেজর সুইনারটনের হাতে। প্রায় দ্বিগুণবয়সী বহুদর্শী অফিসার। যথেষ্ট সৌজন্য দেখান। মিলিটারি ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। হয়তো আসন্ন অগ্নিপরীক্ষার চিন্তায় বিনম্র।

মেজর বলেন, "সেদিন কি আর আছে যখন আমিই আমার সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে উৎসাহভরে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তুম? সেটা হতো একটা অ্যাডভেঞ্চার। সামান্য তার প্রস্তুতি। আজকাল প্রত্যেকটি জওয়ানের প্রত্যেকটি অভাব অভিযোগ শুনতে হয়। রোজ পাঠাতে হয় ডাক্তারের কাছে। কারো চোখ খারাপ। কারো দাঁত খারাপ। কারো কান খারাপ। কারো পেটে ব্যথা। কারো পায়ে ব্যথা। কারো হাড়ে ব্যথা। এদের নিয়ে অন্তহীন ঝামেলা। এরা প্রাণ দিতে এসেছে, কিন্তু তার আগে যে যত পারে আদায় করে নিতে চায়। এদের প্রেরণা দেবার মতো ধর্মীয় উন্মাদনা কোথায়? কিন্তু তারই অনুরূপ জাতীয় উন্মাদনা? রাজার হুকুমে এরা লড়তে যাচ্ছে। রাজার নিমক খায়। নিমকহারামী করতে পারে না। আমরা এদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে পারি। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ কি মার্সিনারিদের দিয়ে জেতা যায়?"

বিষম প্রশ্ন। এতদিন মার্সিনারিদের দিয়ে যুদ্ধ জেতা গেছে, সাম্রাজ্যের সঙ্কটে মার্সিনারিরাই সঙ্কটত্রাণ করেছে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা কি বর্তমান সঙ্কটে ফলপ্রদ হবে? নাৎসীরা মার্সিনারি নয়, ফাসিস্টরা মার্সিনারি নয়, জাপানীরা মার্সিনারি নয়। কারো প্রেরণার উৎস দেশপ্রেম। কারো প্রেরণার উৎস সামাজিক মতবাদ।

কিন্তু এই ডোগরা জওয়ানদের প্রেরণার উৎস কী? রাজার প্রতি আনুগত্য? নিমকের প্রতি আনুগত্য? এদের মনোবল কি অগ্নিপরীক্ষার দিন অটুট থাকবে?

বলা বাহুল্য অফিসাররা সবাই মানসকে ড্রিঙ্কস অফার করেন। সে সফ্‌ট ড্রিঙ্কস চেয়ে নেয়। আর ক্যাপটেন ওদিকে দামী সুরা খেতে খেতে আধা মাতাল। তাঁকে কোনো মতে টেনে নিয়ে মানস গাড়ীতে তোলে।

তিনি তো প্রায় পাকাপাকি করে এনেছেন যে সিঙ্গাপুরে গিয়ে এই রেজিমেণ্টে যোগ দেবেন। এই কমাণ্ডাণ্টের অধীনেই কাজ করবেন। কিন্তু মানস তাঁকে ঘাবড়িয়ে দেয়। বলে, "ক্যাপটেন ল, আপনি কি ঠিক জানেন যে এরা দুর্ধর্ষ জাপানীদের রুখতে না পেরে আত্মসমর্পণ করবে না? তারপর যুদ্ধবন্দী হয়ে বছরের পর বছর কাটাবে না?"

"কেন? কেন তোমার ওকথা মনে এল?" লাহা সুধান।

"জাপানীদের প্রেরণার উৎস তাদের দেশের স্বাধীনতা, যার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়। আর ভারতীয়দের প্রেরণার উৎস তাদের রাজানুগত্য, যার জন্যে ত্যাগস্বীকারের সীমা আছে। দেখবেন, আপনাকে যেন জাপানে ধরে নিয়ে না যায়।" মানস ভয় দেখায়।

"হুঁ! আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। এত বড়ো কথা!" গর্জে ওঠেন লাহা। "আমাদের জওয়ানরা যখন 'দুর্গা মাইকী জয়' বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন জাপানী সেনার 'বানজাই' আওয়াজ শূন্যে মিলিয়ে যাবে, ওরাও ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, কিন্তু সমুদ্রের জলে। তারপর সাঁতার কেটে নিপ্পনে।" লাহা হা হা করে হেসে ওঠেন।

মানস আর কথা বাড়ায় না। লাহা গজ গজ করতে থাকেন। "তুমি একজন কবি, তাই ওসব তোমার কবিকল্পনা। আরে, কোথায় জাপান, আর কোথায় সিঙ্গাপুর! জাপানীরা আসবে কী করে সেখানে? জাহাজে করে? কেন, ইংরেজদেও কি ড্রেডনট নেই? ডেস্ট্রয়ার নেই? টর্পেডো নেই? সিঙ্গাপুর বেস হলো ব্রিটিশ নেভীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। জাপানীরা সেখানে ল্যাণ্ড করতে পারবে না। তা হলে সেখানে ফৌজ মোতায়েন করা কেন? এরা যাচ্ছে কী করতে? এটা হলো মিলিটারি সীক্রেট। আমি যতদূর আঁচ করতে পারি এদের কাজ হবে আচমকা আক্রমণ প্রতিরোধ করা। আক্রমণ তো আকাশপথেও হতে পারে। যেটা ইংলণ্ডের লোক আশঙ্কা করছে সেটা মালয়ের লোকও আশঙ্কা করতে পারে। যদি জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে।" ক্যাপটেন যুক্তি দেখান।

মানস সেটা মেনে নিয়ে বলে, "তা হলেও আপনার ওদেশে না যাওয়াই শ্রেয়। সব চেয়ে খারাপটা যদি ঘটে তবে আপনার কপালে আছে বন্দী দশা। আপনার

অন্তিম লক্ষ্য তো ইংলণ্ড। সেখানে যাবার পথ সিঙ্গাপুর দিয়ে নয়। আপনি বরং শিখদের সঙ্গে ফ্রান্সে বা বেলজিয়ামে যাবার উমেদারি করুন। বন্দী হলেও মুক্তির পর ইংলণ্ডে হাজির হবেন।"

লাহা মানসকে বাড়ী পৌঁছে দেন। যূথিকা তাঁকে ঠেস দিয়ে সুধায়, "ফার্স্ট লেডীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কে?"

"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল যে।" লাহা কারো নাম করেন না।

মানস বলে, "মহিলাদের সংখ্যা তো একটি কি দুটি। ফরাসী জমিদারপত্নী মাদাম দুপোঁ তাঁদের একজন। মিসেস বক্‌সীকেও লক্ষ করা গেল।"

এখন পরিষ্কার হয় আপনি মোড়ল কে। যূথিকার মুখে হাসি ফোটে।

এর পরে সে এক মোক্ষম প্রশ্ন করে। "তার পর মিলিটারি অফিসারদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান অফিসার কেউ ছিলেন? না সবাই ইউরোপীয়?"

লাহা মানসের দিকে তাকান। মানস লাহার দিকে। দু'জনেই অপ্রস্তুত। সেই যে ভারতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কতদূর প্রগতি হলো?

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না।" যূথিকা ঝাঁঝালো স্বরে বলে, "এত বড়ো দুর্দিনেও শাদা কালোর ভেদ যেমনকে তেমন। যুদ্ধে যাবার জন্যে নাচছেন যাঁরা তাঁদের কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না? ইংরেজ যাচ্ছে তার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। আপনারা যাবেন আপনাদের দাসত্ব রক্ষা করতে। ধিক্!"

এর পরে ক্যাপটেন লাহা আর এমুখো হন না। ক্লাবে মানসের সঙ্গে মুখোমুখি হলে শিষ্টাচার বিনিময়ের পর সরে পড়েন। বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর স্টেশনে ফিরে তল্পিতল্পা গোটান। মানসদের ওখানে পার্টিং কল দিতে এসে বিগলিত কণ্ঠে বলেন, "এখন আমি মেজর ল। মিলিটারি সার্জন হয়ে কলম্বো হয়ে সিঙ্গাপুরযাত্রী।"

ইতিমধ্যে সৌম্য ফিরেছিল সেগাঁও থেকে। সেখানে হপ্তা তিনেক ও কলকাতায় হপ্তা খানেক কাটিয়ে সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সঙ্গে ভাববিনিময় করেছে।

"কবিগুরুর অভিমত কী?" জিজ্ঞাসা করে মানস, সৌম্যকে বাড়ীতে পেয়ে।

"জার্মানীতে তিনি শান্তিপ্রচার করে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন ওরা শান্তির পথেই ওদের মহত্ত্বের পরিচয় দেবে। এখন তাঁর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটেছে। এবার যিনি সর্বাধিনায়ক হয়েছেন তিনি সর্ব মানবের শত্রু। শুধু ব্রিটেনের বা ফ্রান্সের নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সবাইকে অস্ত্র ধরতে হবে। ভারতকেও। হ্যাঁ, ব্রিটিশশাসিত ভারতকেও।

ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া একসময় হবে। এইমুহূর্তে নয়।'' সৌম্য যা শুনেছে তার মর্ম শোনায়।

"কবি তা হলে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে? আর সে সংগ্রাম জার্মানীর বিরুদ্ধে?" মানস খুঁটিয়ে জানতে চায়।

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো।" সৌম্য স্মরণ করে বলে, "নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেন কৌরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ওদের সঙ্গে লড়তে হবে অর্জুনের মতো। বিষাদমুক্ত হয়ে। বিদ্বেষমুক্ত হয়ে। অর্জুন তো নিমিত্তমাত্র।"

মানস এটা অনুমান করেছিল। অবাক হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে বলে আসছিলেন কিছুদিন থেকে। আর সে দানব দেশের শত্রু ইংরেজ নয়, মানবের শত্রু হিটলার।

"তার পর গান্ধীজীর কী অভিমত?" মানস মিলিয়ে দেখতে চায়।

"গান্ধীজী এখন পড়ে গেছেন মহা দোটানায়। তাঁর অনুগামীদের একদল অবিকল কবিগুরুর মতো নাৎসীবিরোধী, কৌরববিরোধী। তারা প্রথম সুযোগেই সশস্ত্র সংগ্রামে নামবে ইংরেজদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে। অহিংসার ধার ধারবে না। কিন্তু পরে যদি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে হয় তখন কোন্ মুখে জনগণকে ডাক দেবে নিরস্ত্র সংগ্রামে অহিংসভাবে লড়তে? জনগণ বিভ্রান্ত হবে। সহিংস সংগ্রামে পরাস্ত হবে। গান্ধীজীর সারাজীবনের বাণী তখন ব্যর্থ হবে। তিনি তাঁর সেইসব অনুগামীদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সুবিধামতো অহিংসা ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্বধর্মে স্থির থাকতে হবে, তিনিও চান তাঁর বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ইতিহাস একদিন তাঁকেও একটা সুযোগ দেবে। না দেয় তো স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। তিনিও গীতার ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু কৌরবনিধনে অর্জুনের মতো নিমিত্তমাত্র হতে বলেন না। কৌরবকে জয় করতে হবে অহিংসা দিয়ে। সেইখানেই গৌরব।" সৌম্য অন্য অর্থ করে।

"এ তো গেল একদল অনুগামীর কথা। আরেক দল অনুগামী তাঁকে কোন্ দিকে টানতে চায়?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"ওঁরা ঠিক অনুগামী নন, অহিংস উপায় সম্বন্ধে বরাবরই সন্দিহান। তবু একসঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, এখনো করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নাৎসীদের বিরুদ্ধে নয়। আর সে সংগ্রাম সর্বপ্রকার উপায়ে, কেবলমাত্র অহিংস উপায়ে নয়। গান্ধীজী এঁদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন। কিন্তু এঁদের নেতা হতে নারাজ। তিনি এঁদেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন, এঁরা যে যার উপায়ে

লড়াই করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে জড়াতে পারবেন না, তাঁর নির্দিষ্ট উপায়কেও না। অমন করলে জনগণ অহিংসার গুণাগুণ বিচার করতে শিখবে না। বিভ্রান্ত হবে। আর তাঁকেও হিংসার দায় বহন করতে হবে। প্রতিপক্ষ বিশ্বাস করবেন না যে তিনি হিংসার নির্দেশ দেননি। এটা তাঁর মিশনের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেও যে হিতকর তাও নয়। তাঁকেও তাঁর কর্মপদ্ধতির স্বাধীনতা দিতে হবে। দেশের লোক বিচার করবে কার কর্মপদ্ধতি শ্রেয়স্কর।" সৌম্য গান্ধীজীর বক্তব্য বিশদ করে।

"তা হলে এই দোটানার থেকে পরিত্রাণ কিসে?" মানস অস্থির হয়।

"পরিত্রাণ গঠনের কাজে। আমাদের বলা হয়েছে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে। গ্রামের মানুষকে ভাত কাপড়ে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করতে। এক একটি গ্রাম হবে এক একটি রেপাবলিক। সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর। সাত কোটি গ্রাম যদি আত্ম-নির্ভর হয় তবে তাদের সঙ্ঘশক্তিই তাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবে। শস্ত্রশক্তির প্রয়োজন হবে না। তাদের সেই সঙ্ঘশক্তির দ্বারা যে আত্মরক্ষা সেটাই তো বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশরক্ষা। গান্ধীজী যতদূর দেখতে পাচ্ছেন অহিংস উপায়ে স্বাধীনতার পর দেশরক্ষার জন্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন থাকবে না, যদি থাকে তবে সেটা হবে আকারে প্রকারে পরিমিত। আকস্মিক আক্রমণ রোধ করার জন্যে সে বাহিনী সীমান্তে মোতায়েন থাকবে। এই পর্যন্ত আপস করতে গান্ধীজী সম্মত। এর বেশী নয়। কিন্তু সেগাঁওতে গিয়ে দেখি গান্ধীজীকে ঘিরে রয়েছে একটি মিলিটারিস্ট লবি। তাদের মতে ভারতরাষ্ট্রকে দেশরক্ষার খাতিরে সশস্ত্র বাহিনী সব সময় তৈরি রাখতেই হবে আর সে বাহিনী আকারে প্রকারে চীন জাপানের সমতুল্য হবে। তেমন একটি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। এখন থেকে গড়ে তোলাই সুবুদ্ধি। আগেকার দিন হলে ওরা বাধা দিত, এখন বুঝতে পেরেছে যে ভারতরক্ষা ওদের একার সাধ্য নয়, ভারতীয়দেরও সহযোগিতা চাই। তাই লক্ষ লক্ষ জওয়ান নেওয়া হবে, হাজার হাজার অফিসার। তাদের ইউরোপীয় রীতিতে ক্যাপটেন, মেজর, কর্নেল ইত্যাদি পদ দেওয়া হবে। যথাকালে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করা হবে। গান্ধীজীকে ঘিরে আরো একটি লবিও দেখা গেল। ক্যাপিটালিস্ট লবি। যুদ্ধকালে শিল্পায়নের অবাধ বিস্তৃতি হতে যাচ্ছে। সৈন্যদলের জন্যে সর্বপ্রকার উপকরণ এদেশেই নির্মিত হবে, বাইরে থেকে আমদানী বন্ধ থাকবে। বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে উঠবে। শ্রমিকদেরও সুরাহা হবে। শুধু তাঁত চরকার দৌলতে তো একটা দেশ সমৃদ্ধ হতে পারে না। জাপানের দিকে তাকান। এই

তুই লবি এখন মেনকা রম্ভার মতো তপস্বীর তপোভঙ্গে সচেষ্ট।" সৌম্য পরিহাস করে।

মানসের মনে পড়ে একটি বিলিতী পত্রিকার মন্তব্য। গান্ধীজীর পলিসিকে ওরা বলে গত মহাযুদ্ধে লেনিনের পলিসির মতো 'রেভোলিউশনারি ডিফিটিজম'। তিনি সাম্রাজ্যকে জয়ী হতে সাহায্য করবেন না, সে যদি পরাজিত হয় তবে তার সেই পরাজয়টাকে বিপ্লবের পাদপীঠ করবেন। অথচ অকালে আঘাত হানবেন না। অপেক্ষা করবেন।

"পত্রিকার ওই মন্তব্য যথার্থ হলে গান্ধীজীই সত্যিকার বিপ্লবী, জবাহরলাল তা নন। যুদ্ধে সাহায্য করলে আর যাই হোক বিপ্লব হবে না। জবাহরলাল যা বিনা বিপ্লবে লাভ করবেন তা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। ঠিক ওই জিনিসটা আবার সুভাষচন্দ্রের চোখে বীরত্ববর্জিত বুর্জোয়া কৌশল। জবাহরলাল লড়তে চান হিটলারের বিপক্ষে, তাই ইংরেজ তাঁর মিত্র। সুভাষচন্দ্র লড়তে চান ইংরেজের বিপক্ষে, তাই হিটলার তাঁর শত্রু নন। শত্রুর শত্রু। শত্রুর শত্রুকে মিত্র বলেই গণ্য করতে হয়।" মানস বোঝাতে চেষ্টা করে।

"বুঝেছি। কিন্তু কংগ্রেসের ঐতিহ্য সে রকম নয়। গত মহাযুদ্ধে কংগ্রেস একমত হয়ে ব্রিটেনের পক্ষ নিয়েছিল, এবার একমত না হলেও বিপরীত মতাবলম্বী নয়। অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য ব্রিটেনের পক্ষে, যদি কেন্দ্রীয় সরকারে বড়োরকম রদবদল হয়। তা না হলে তাঁরা নিরপেক্ষ থাকবেন, ব্রিটেনের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াবেন না। এটাই হচ্ছে সাধারণ জনমত। এই যুদ্ধে ভারতের জনসাধারণ ইংরেজ বা জার্মান কারো সঙ্গে শত্রুতাও করতে চায় না, কারো সঙ্গে মিত্রতাওকরতে চায় না। তাদের মত না নিয়ে তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা দুনিয়াকে জানাতে চায় যে তারা মত দেয়নি। পদত্যাগের দ্বারা কংগ্রেস মন্ত্রীরা ঠিক এইটুকুই বিশ্বজনকে জানিয়েছেন। এর বেশী না। এর থেকে কেউ যেন টেনে না নেন যে ভারতের জনমত ব্রিটেনের বিপক্ষে বা জার্মানীর পক্ষে। এটাও তো একটা ভুল ধারণা যে গান্ধীজী মনে করেন ব্রিটেন এ যুদ্ধে হেরে যাবে ও তখন তিনি বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। না, তিনি তাঁর বিপ্লববিরোধী অনুগামীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করেন না। বিচ্ছেদ যদি ঘটে তো অনিবার্য কারণেই ঘটবে। ক্যাপিটালিস্ট ও মিলিটারিস্টদের লবি যদি কংগ্রেসকে ইংরেজের শিবিরে টেনে নিয়ে যায় ও ইংরেজ যদি কংগ্রেসকে পার্টনার করে নেয় তা হলে গান্ধীজীকে আর কংগ্রেসের প্রয়োজন থাকবে না। গান্ধীজীরও আর কংগ্রেসকে প্রয়োজন থাকবে না। বিচ্ছেদ অনিবার্য

হবে। লোকেও জানবে যে গান্ধী ও কংগ্রেস এক ও অভিন্ন নয়। যাঁরা তাঁর খুব কাছের মানুষ তাঁরা আঁচ করতে পারছেন যে এরকম একটা সম্ভাবনা তাঁর ভাবনার বাইরে নয়। যুদ্ধে যোগ দিলে ভারতের বণিকরা বড়ো বড়ো কন্ট্রাক্ট পাবেন, আর সৈনিকরাও পাবেন বড়ো বড়ো কমিশন। কংগ্রেস নেতারাও পাবেন বড়ো বড়ো পদ। সংবাদপত্র হাতে থাকলে জনমতকেও যুদ্ধানুরাগী করে তোলা শক্ত নয়। তবে কংগ্রেসের মুখ্য স্রোতটা গান্ধীজীকে ঘিরে। বড়লাটকে ঘিরে নয়। সেগাঁওকে ঘিরে। দিল্লীকে ঘিরে নয়। গান্ধীজীর সঙ্গে বিচ্ছেদ যদি ঘটে তবে সেটা হবে মুখ্য স্রোতের সঙ্গে বিচ্ছেদ। যুদ্ধসমর্থকরা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হবেন। পক্ষান্তরে বিপ্লবসমর্থকরাও ব্রিটেনের দুর্যোগকে ভারতের সুযোগ করতে গিয়ে মুখ্যস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।” সৌম্য এ বিষয়ে নিশ্চিত।

মানস অর্জুনের মতো যুদ্ধ করার কথাই ভাবছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তার মতের মিল। চেকোস্লোভাকিয়ার পর পোলাণ্ড, পোলাণ্ডের পর হলাণ্ড ও বেলজিয়াম, তার পরে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একথা কল্পনা করতেই তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তখন তার মনে থাকে না যে সে স্বাধীন নয় পরাধীন ভারতীয়, সে শ্বেতাঙ্গ নয়, সে কৃষ্ণাঙ্গ। সে একলাফে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে চায়, যুথিকা না থাকলে সে এতদিনে ঝাঁপ দিয়ে থাকত।

সৌম্য জানত মানস কী ভাবছিল। বলে, “ছাখ, মানস, ব্যক্তিহিসাবে তুমি যা ভালো মনে কর তা করবে, রবীন্দ্রনাথও তাই। কিন্তু দেশের লোককে সঙ্গে নিয়ে চলা যদি তোমার কর্তব্য হয় তবে দেখবে দেশের অধিকাংশ লোক তোমার সঙ্গে চলতে রাজী নয়। যুদ্ধে তাদের লাভ যত হবে ক্ষতি হবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারা ধনে প্রাণে মারা যাবে। ফুলে ফেঁপে উঠবে আর ক'জন! ইংলণ্ডের সাধারণ লোক লড়তে চলবে তাদের অধিকার রক্ষা করতে। ভারতের লোকের অধিকার বলতে কী আছে? ভোট দেবার অধিকারও তো সকলের নেই। বুভুক্ষুকে তুমি আরো বুভুক্ষু করবে, বিবস্ত্রকে তুমি আরো বিবস্ত্র করবে, নির্জীবকে তুমি আরো নির্জীব করবে, নীট ফল যা হবে তা পরাজয়ের চেয়ে কি কম ভয়ঙ্কর? পরাজয়ও যে এড়াতে পারবে তাও নয়। ইংলণ্ড হেরে গেলে তুমিও হেরে যাবে। আর ইংলণ্ড যে হারবে না তা তুমি কেমন করে জানলে? এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য নিয়ে যে বসে আছে তার নৈতিক শ্রেষ্ঠতা কোথায়? ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম এদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই বা কোথায়? এরা সাম্রাজ্যের মায়া কাটিয়ে এদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করুক। তারপর তুমি এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অর্জুনের মতো লড়বে। আর তোমার দেশের লোকও ত্যাগ-

স্বীকারে সম্মত হবে। নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী এদেশে খুব বেশী নেই। গান্ধীজীও সেকথা জানেন। সারা দেশে হয়তো হাজার খানেক লোক সব অবস্থায় যুদ্ধবিরোধী। এমন কি দেশ আক্রান্ত হলেও তাই। নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী যাঁরা তাঁদের মত তাঁদের ব্যক্তিগত মত। যেমন আমার। কিন্তু রাজনীতিগত ভাবে যুদ্ধবিরোধী এদেশের সাধারণ জনমত। এমনটি গত মহাযুদ্ধের বেলা দেখা যায়নি। গত মহাযুদ্ধের পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যুদ্ধবিরোধিতা। গান্ধীজী এর জন্যে দায়ী নন। উনি তো বরাবর ইংরেজদের বন্ধু। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে জুলু যুদ্ধে ও বুয়র যুদ্ধে উনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। গত মহাযুদ্ধেও তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে নেমেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্বতোভাবে যুদ্ধবিরোধী। যেমন নীতিগতভাবে তেমনি রাজনীতিগতভাবে। তাঁর মতের পরিবর্তন হতে পারে, যদি ইংলণ্ড তার সাম্রাজ্য থেকে নিজে মুক্ত হয় ও অপরকে মুক্তি দেয়। তা যদি হয় তবে যুদ্ধবিরোধী হলেও তিনি কংগ্রেসকে তাঁর মতবাদ অনুসরণ করতে বলবেন না। সে তার স্বকীয় নীতি অবলম্বন করবে। সে যদি স্বেচ্ছায় গান্ধীবাদী হয় সেকথা আলাদা। তা যদি হয় তবে পৃথিবীতে ভারতই হবে একমাত্র দেশ যে তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করবে যুদ্ধজয়ের জন্যে নয়, শান্তিজয়ের জন্যে। স্বাধীন ভারত অস্ত্র প্রতিযোগিতার দুষ্ট চক্র ভেদ করবে। নিরস্ত্রীকরণের জন্যে তৎপর হবে। হিটলার তো দুষ্ট চক্রেরই যোগফল। যেখানে দুষ্ট চক্র নেই সেখানে হিটলারও নেই। গান্ধীর জয়ই হিটলারের পরাজয়। বিনা যুদ্ধেই হিটলারের পরাজয় ঘটতে পারে। কিন্তু সেটাকে পরাজয় না বলে সম্মানজনক সন্ধি বলা যেতে পারে। মানুষে মানুষে যতরকম বিরোধ আছে সমস্তই মেটানো যায়, যদি হিংসা ছেড়ে মানুষ অহিংসার দিকে মোড় ঘোরে।"

মানস তারিফ করে। কিন্তু মানতে নারাজ হয়। "হিটলারের পরাজয় অত সহজ হবে না, সৌম্যদা। গান্ধীজী হয়তো ইংরেজকে হটাতে পারবেন, সত্যাগ্রহই তার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু হিটলারকে সম্ভব করেছে প্রথম মহাযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লব। হিটলারকে হটাতে হলে শুধু সাম্রাজ্য ত্যাগই যথেষ্ট নয়, ধনতন্ত্রও বর্জন করতে হবে। ধনতন্ত্র তো ভারতেও প্রবল। কংগ্রেসও তার একটা শক্তিশালী ঘাঁটি।"

॥ উনিশ ॥

যুথিকা বাড়ী ছিল না। বাচ্চাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সৌম্যকে দেখে বলে, "ওমা, সৌম্যদা যে! কতক্ষণ!"

"এই কিছুক্ষণ। কই, মণি কোথায়? দীপক কোথায়?" সৌম্য খোঁজ করে।

"জেঠু" বলে মণিকা ছুটে আসে। "জ্যাঠামশায়" বলে দীপক। ওদের কাছে টেনে নিয়ে সৌম্য আদর করে। এবার দীপকের জন্যে এনেছে একটা শান্তিনিকেতনী ঝোলা আর মণিকার জন্যে ইলামবাজারের গালার খেলনা।

যুথিকা বলে, "মিলির খবর শুনেছ, আশা করি। লণ্ডনে পৌঁছে ঘর সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। বরের সঙ্গে দোকানেও যাওয়া আসা করছে ও দোকানে কাজ শিখছে। বর যদি যুদ্ধে যায় ওকেই তো দোকান চালাতে হবে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। মিলির খবর তো পাচ্ছি, কিন্তু জুলির খবর কী?"

"ভালোই আছে। ওদের বাড়ী গিয়ে দেখা করেছি, একবেলা খেয়েছি। ওর মা শক্ কাটিয়ে উঠেছেন। সুকুমারের বিশ্বাসঘাতকতার শক্। আর জুলি তো এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কত বড়ো একটা আপদ থেকে বেঁচে গেছে। কৃতজ্ঞতার খাতিরে বিবাহ। তবে এখনো ওই চিন্তা। কবে বিপ্লব ঘটবে।" সৌম্য হাসে।

"তার মানে জেলে না গিয়ে ছাড়বে না। কী যে মতিগতি ও মেয়ের! কিন্তু এবার জেল থেকে উদ্ধার করবে কে? সুকুমার তো ফিরেও তাকাবে না। যাঁর তাকানো উচিত তিনিও তো জেলে গিয়ে বসে থাকবেন।" যুথিকা কটাক্ষ করে।

"কার কথা ভেবে ওকথা বললে, যুথী?" সৌম্য গম্ভীর হয়ে বলে, "যদি আমার কথা হয়ে থাকে তবে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে বাপু আমাকে এবার জেলে যেতে দেবেন না। হিন্দু মুসলমানকে দৈনন্দিন কর্মে একসাথ করতে হবে। এটাই

আমার উপর বরাত। জাহাজ পুড়ছে দেখলে জাহাজের প্লাটফর্মের উপর কাসাবিয়াঙ্কার মতো খাড়া থাকতে হবে। জলে ঝাঁপ দিয়ে আপনা বাঁচানো চলবে না। তবে তার আগে চেষ্টা করতে হবে জাহাজ যাতে না পোড়ে।" সৌম্য ধাঁধার মতো করে বলে।

"বুঝতে পারলুম না, সৌম্যদা।" যূথিকা আরো মনোযোগী হয়।

"বুঝতে পারলে না? স্বরাজ যতই নিকট হচ্ছে হিন্দু মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ততই প্রকট হচ্ছে। এতদিনে আমাদের ধারণা ছিল ইংরেজরাই মুসলমানদের একদলকে খেলার ঘুঁটির মতো চালছে। এখন দেখছি মুসলমানদের একদলই ইংরেজদেরকে খেলার ঘুঁটির মতো চালছে। দশরথ এখন কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এতবড়ো দুর্বিপাকেও ইংরেজ কর্তারা কংগ্রেস কর্তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরতে পারছেন না। মুসলিম লীগ কর্তা চোখ রাঙাচ্ছেন। কংগ্রেসমন্ত্রীরা পদত্যাগ করছেন। কিন্তু সেটা তো অন্তর থেকে নয়। গান্ধীজী এখন মহা ভাবনায় পড়ে গেছেন। তিনি নিজে যুদ্ধবিরোধী। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রমাণ করাই তাঁর নিজের কাজ। কিন্তু কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে তাঁকে তাঁর অনুগামীদেরও সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে পাঁচজনের পরামর্শ শুনতে হয়। শ্রদ্ধাভাজন সহযোগীরা তাঁকে বোঝাতে চাইছেন যে ইংলণ্ড, ফ্রান্সের মতো স্বাধীন দেশকেও আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হয়। ভারত যদি স্বাধীন দেশ হতো তাকেও আত্মরক্ষার জন্যে মিতালি পাতাতে হতো। স্বাধীন ভারতের স্বাভাবিক মিতা চীন বা জাপান নয়, কমিউনিস্ট রাশিয়া তো নয়ই। ওই ইংলণ্ড বা ফ্রান্স। বা আমেরিকা। এটা যে শুধু ধনিকদের স্বার্থে তা নয়। শ্রমিকদের এত বেশী অধিকার আর কোথায় আছে? মধ্যবিত্তদেরও এতবেশী সিভিল লিবার্টি আর কোন্‌খানে? সুতরাং গান্ধীজী যেন যুদ্ধবিরোধিতা না করেন, কংগ্রেসকে করতে না বলেন। কংগ্রেস যেন মুসলিম লীগের মতোই ভালো ছেলে হয়। কংগ্রেস মন্দ ছেলে বলেই না মুসলিম লীগের প্রতি ইংরেজ সরকারের এত টান। এখন ভালো ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো ভালো ছেলে হওয়াই পলিসি। গান্ধীজী এঁদের পরামর্শ চুপ করে শুনে যান। হ্যাঁ কি না বলেন না। তবে আমরা যাঁরা তাঁকে চিনি তারা বিশ্বাস করতে পারিনে যে তিনি অমন করে আত্মবিলোপ করবেন। অন্তত একটি কণ্ঠস্বর এত বড়ো দেশে থাকবে যা কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে যুদ্ধবিরোধী। কংগ্রেসকে তিনি আরো সময় দেবেন মনঃস্থির করতে। দেখাই যাক না ভালো ছেলে মুসলিম লীগের দৌড় কতদূর। আর সেই দৌড়ের শেষে সে কোন্ পুরস্কার পাচ্ছে।" সৌম্য মুচকি হাসে।

এবার মুখ খোলে মানস। "তার মানে কি স্টেলমেট? ইংরেজ বনাম কংগ্রেস। কংগ্রেস বনাম লীগ।"

"সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। স্টেলমেট যাদের অসহ্য হবে তারা ইচ্ছে করলে বিপ্লব ঘোষণা করতে পারে, সাধ্য থাকলে ক্ষমতা দখল করতে পারে। নয়তো জুলির মতো দিনরাত ফরন্দর করতে পারে। এবেলার থাসিস ওবেলা বদলে যায়। কেবল গালিগালাজ সার। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, বুর্জোয়া কংগ্রেস, ধনিকদের সখা গান্ধী। তবে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের ফলে হাই কমাণ্ডের নিন্দাবাদ অত বেশী জনপ্রিয় হচ্ছে না। বল্লভাচারী সম্প্রদায়কে নিয়ে হাসি টিটকারি কমে আসছে। জুলির মা সেদিন বললেন, মন্ত্রীদের বেতন যদি আগেকার মতো পাঁচহাজার টাকা হতো তা হলে কি ওঁরা অত সহজে পদত্যাগ করতেন? পাঁচশো টাকা বলেই এটা সহজ হলো। গান্ধীজীর দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হবে।" সৌম্য তার কলকাতার অভিজ্ঞতার কথা শোনায়।

"আর জুলি কী বলল?" জানতে চায় যূথিকা।

"জুলি? ও কি কোনোদিন কংগ্রেসের প্রশংসা করেছে না করবে? জুলি বলল, পদত্যাগ করে ওঁরা পা দিয়ে ভোট দিয়েছেন। নইলে ওঁদের পদাঘাত করে তাড়াতে হতো। আর কিছুদিন বাদে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হতেন আবার সুভাষচন্দ্র বা তাঁর মতো আর কোনো বামপন্থী। তাঁর প্রথম কাজ হতো ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন। তার পরের কাজ হাই কমাণ্ড কব্জা করে মন্ত্রীদের বিতাড়ন। তার পরে আপসহীন বিরামবিহীন সংগ্রাম। সেগাঁওতে বামপন্থীদের মুখেও এইসব কথা শুনেছি। জুলির ওটা ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি! ওঁরাও গান্ধীজীকে ভজাচ্ছেন যে আর কালবিলম্ব নয়। এইমুহূর্তেই সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া উচিত। নইলে উত্তাপ জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। জনচিত্তের উত্তাপ। একবার জুড়িয়ে গেলে ফের কতকাল লাগবে তপ্ত করতে! দেশ প্রস্তুত, নেতারা প্রস্তুত নন। মুসলিম লীগের নেতাদের প্রসঙ্গ তুললে ওঁরা এককথায় উড়িয়ে দেন। জনাকতক নাইট আর নবাব আর খান্ বাহাদুর আর খান্ সাহেবই নাকি সরকারের পক্ষে। আর-সব মুসলমান নাকি বিরোধী পক্ষে। বিপ্লবে ঝাঁপ দেবার জন্যে নাকি পা বাড়িয়ে রয়েছে। জিন্নাকে এঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনতে রাজী নন। পার্লামেণ্টের বাইরে নাকি ওঁর শিকড় নেই। গান্ধীজী এঁদের পরামর্শ চুপ করে শুনে যান। হ্যাঁ কি না বলেন না। তবে আমরা যাঁরা তাঁকে চিনি তারা ভাবতেই পারিনে যে তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে পরের কথায় নাচবেন।" সৌম্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলে।

"তা হলে শেষপর্যন্ত দাঁড়ায় স্টেলমেট।" মানস মন্তব্য করে।

"তার মানে যুদ্ধে যারা সহযোগিতা করতে চায় তাদেব কেউ বারণ করছে না। যারা করতে চায় না তাদেরও কেউ মানা করছে না। যারা সরকারের পক্ষে লড়তে চায় তারাও স্বাধীন। যারা সরকারের বিপক্ষে লড়তে চায় তারাও স্বাধান। আর গান্ধীজীও স্বাধীন, কিছু করা না করার স্বাধীনতা তাঁর আছে।" সৌম্য তাৎপর্য শোনায়।

"বুঝতে পারছি। গান্ধীজী ও তাঁর দলবল এক নয়, বিভক্ত।" যূথিকা বলে।

"যা বলেছ। এমন অবস্থায় নেতৃত্ব করা যায় না। অপেক্ষা করতে হয় যতদিন না একতা ফিরে আসে। কংগ্রেস যা করবে এক হয়ে করবে। সেটা যদি হয় যুদ্ধে সহযোগিতা তবে সেও ভালো। কিন্তু সেক্ষেত্রে গান্ধীজীকে নেতারূপে পাওয়া যাবে না। কংগ্রেস পাবে নারায়ণকে বাদ দিয়ে নারায়ণী সেনা। তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে বিবেকচালিত সত্যাগ্রাহীর কর্তব্যে মন দেবেন। তিনি বেশী লোকজন চান না। যাঁদের চান তাঁরা হবেন খাঁটি সোনা। আটজন কি দশজন হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। উদ্দেশ্য স্বরাজ্যলাভ নয়। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন। হিংসার উত্তরে হিংসা, তার উত্তরে হিংসা, এ ভাবে চললে পৃথিবী প্রাণশূন্য হবে। তখন সেই মরুভূমিতে বাস করবে কে? তেমন বিজয়ের কী মূল্য? পরাজিত হলেও তবু একটা প্রতিকার থাকে। সত্যাগ্রহ। কিন্তু হিটলারের উপর টেক্কা দিতে গিয়ে যা হবে তা মনুষ্যত্বের দিক থেকে দেউলেপনা। ভারতকে যদি আমরা এর আওতার বাইরে রাখতে না পারি তো অন্তত তার অজ পাড়াগাঁগুলোকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহ সেই কোণ থেকে আসবে।" সৌম্য দৃঢ়নিশ্চয়।

"তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় তোমরা সত্যি সত্যি রেভোলিউশনারি ডিফিটিস্ট। যোদ্ধাদের মনোবল জোগাবে না। তারা হেরে গেলে সত্যাগ্রহ করবে। অবিকল লেনিনের স্ট্র্যাটেজী। শুধু ট্যাকটিক্স আলাদা।" মানস রায় দেয়।

সৌম্য হেসে উঠে বলে, "আমরা ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু শুধু তোমার কাছেই। জুলি তো মনে করে আমরা রিয়াকশনারি।"

আবার জুলির প্রসঙ্গ ওঠে। যূথিকা বলে, "জুলিরা যা মনে করে তা যদি ঠিক না হয় তো বাধছে কোথায়? কেন ওদের সঙ্গে তোমাদের এত অমিল?"

সৌম্য একটু চমকে উঠে বলে, "তা কি এককথায় বোঝানো যায়? আমরা সবাই চাই দেশের স্বাধীনতা ও সমাজের পুনর্বিন্যাস। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হলেও

উপায় এক নয়। আর উপায় যদি এক না হয় তো উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্যও প্রভাবিত হয়। অহিংস উপায়েব দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতা রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান কবে না, তার সৈন্যবল খর্ব করে, খর্বতর করে, খর্বতমও করতে পারে। পুলিশবল সম্বন্ধেও সেই কথা। সমাজের পুনর্বিন্যাসে রাষ্ট্রের ভূমিকাও খর্ব থেকে খর্বতর, খর্বতর থেকে খর্বতম হয়। আমরা সেইজন্যে উপায়শুদ্ধির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করি। গান্ধীজী তো এখন বলতে শুরু করেছেন যে উপায়ই সব। উপায় থেকেই প্রবাহিত হবে উদ্দেশ্য। এণ্ড্স আগে থেকে স্থির করে নিয়ে সেই অনুসারে মীনস্ নয়। মীনস আগে থেকে স্থির করে নিয়ে সেই অনুসারে এণ্ড্স। এতে কংগ্রেস নেতারা ক্ষুব্ধ। একটা গান্ধীবিরোধী মনোভাব এখন কংগ্রেসের সকল অঙ্গে। কেবল বাম অঙ্গে নয়। উপায়কে অহিংস করতে যারা রাজী তারাও সেটাকে উদ্দেশ্যানুগ কবতে চায়। উদ্দেশ্যকে উপায়ানুগ করতে চায় না। অথচ সবাই মানে যে গান্ধী ভিন্ন আব কেউ নেতা হলে কংগ্রেস নতুন কোনো সংগ্রামে নামতে পারে না। যারা নামবে তারা কংগ্রেসের নামে নয়, অন্য কোনো সংস্থার নামেই নামবে। কংগ্রেস অপেক্ষা করবে যতদিন না গন্ধীজী নেতৃত্ব নিতে রাজী হন, আর গান্ধীজীও অপেক্ষা করবেন যতদিন না উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে একমত হয়। জুলি যদি অপেক্ষা করতে নারাজ হয় তো পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। প্রাণে বাঁচলে হয়।"

যূথিকা কুপিত হয়ে বলে "আর তুমি ওকে না বাঁচিয়ে আপনা বাঁচবে! ধিক্, সৌম্যদা, ধিক্। কে যে ওকে বাঁচাবে তাই ভাবি। এখন তো সুকুমারদাও নেই।"

"বোন, তুমি কেন ধরে নিচ্ছ যে আমরা অহিংসাবাদীরাও প্রাণে বাঁচব? দেশ যদি আক্রান্ত হয় তা হলে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হিংসাবাদীরা যদি এ কাজ না করেন বা এতে ব্যর্থ হন তা হলে আমাদের উপরেই বর্তাবে এ দায়। প্রাণ হাতে করেই আমাদের বাঁচতে হবে। যেমন সেগাঁওতে তেমনি প্রত্যেকটি গ্রামে। তাই প্রত্যেকটি গ্রামকেই করে তুলতে হবে সেগাঁও। গান্ধীজী একদিন না একদিন সংগ্রাম ঘোষণা করবেনই, যদি না ব্রিটিশ রাজশক্তি মানে মানে বিদায় হয়। সংগ্রাম শুরু হলে গান্ধীজীকে তো জেলের বাইরে পাওয়া যাবে না, তখন কর্মীদের প্রত্যেকেই হবে যে যার নেতা। কর্মীদের সবাইকে জেলে পুরলে সাধারণ মানুষকেই মনোনয়ন করতে হবে কে হবেন কোন্ অঞ্চলের নেতা। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে সাধারণ মানুষকেই শিখে নিতে হবে নেতৃত্বহীন সংগ্রামের পদ্ধতি। জুলি যদি আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে এ দায় বহন করতে রাজী হতো তা হলে আর ভাবনা কী ছিল? কিন্তু তা তো হবার নয়। জুলি সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ করলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে

যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। যাদের সঙ্গে ওর নিত্য মেলামেশা তারা উপায় সম্বন্ধে নির্বিবেক। আমার উপরে ওর বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার কর্মপন্থার উপরে বিশ্বাস নেই। ওকে নিয়ে আমি করব কী? আর আমাকে নিয়ে ওই বা কী করবে? তুমি কী চাও, তা আমি জানি। কিন্তু আমি, বোন, নিরুপায়।" সৌম্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যূথিকাও হাল ছেড়ে দেয়। "যাক্, জুলি তো কচি খুকীটি নয়। কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় তা নিশ্চয় জানে। জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের মতো পুড়বে। আমার তো মনে হয় না সেরকম কিছু ঘটবে। গদী ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা এখন আবার জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন শান্ত। আর সেই বিক্ষোভই তো ছিল জুলির ধারণায় বিপ্লবের পূর্বাভাষ। জুলিরা আসলে ছিল মন্ত্রিত্ববিরোধী। ওদের উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীদের মসনদ থেকে নামানো। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তার চেয়ে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন। তার ফলে দেশ অরাজক হলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। তারপরে দেশ আক্রান্ত হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ। এসব দায়িত্ব জুলিরা সাধ করে ঘাড়ে নিতে যায় তো পশতাবে। জনতা যদি ওদের পেছনে থাকে তো জনতাই ওদের ফেলে পালাবে। ওরা বিচ্ছিন্ন হবে।"

মানস বলে, "বিপ্লব যেদেশে ঘটেছে সেদেশে এটাও দেখা গেছে যে বিপ্লবীরা কেবল তাদের শাসক বা শোষকদের নিপাত করেই নিরস্ত হয় না, নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকেও নির্মূল করে। ফ্রান্সের ইতিহাসে এটা আমরা দেখেছি, রাশিয়ার ইতিহাসে দেখছি। কে বলতে পারে যে ভারতের ইতিহাসেও বিপ্লবীরা পরস্পরকে মেরে সাবাড় করবে না? তারপর এটাও কি দেখা যায় না যে বিপ্লবীদের ঘরোয়া গোলমাল মেটাতে ডাক পড়ে সেনাপতিদের, আর তাঁদেরই একজন সর্বেসর্বা হয়ে বিপ্লবকেই বিসর্জন দেন? যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। রাশিয়ায় এখনো সে পর্যায় আসেনি। কে বলতে পারে যে কখনো আসবে না? স্টালিন নিজেই একদিন সেনাপতি হয়ে নেপোলিয়নের ভূমিকায় নামতে পারেন। জুলিরা ইংরেজকে হটাবে হয়তো, কিন্তু যাঁর জন্যে পথ করে দেবে তিনি যে ওদের আমল দেবেন তা নয়। মাথা তুলতে গেলেই মাথা গুঁড়িয়ে দেবেন।"

"সম্ভব। সম্ভব। সব কিছুই সম্ভব।" সৌম্য সায় দেয়, "তবে আমরা যে এতকাল ধরে তপস্যা করলুম সেও সম্ভাবনাময়। কোথাও কি এর তুলনা বা নজির আছে? যুদ্ধের সময় তো মন্ত্রীদের হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, আত্মসাৎও হয়।

আমাদের মন্ত্রীরা সে প্রলোভন স্বেচ্ছায় দমন করেছেন। জুলির মতো অনেকেই ভাবছে এটা একটা চাল। কিন্তু ওঁরা যদি চাল ফিরিয়ে না নেন, গোটা যুদ্ধকালটাই সরকারের বাইরে কাটিয়ে দেন, তা হলে লোকে ওঁদেরই জয়ধ্বনি করবে।"

যূথিকার ওই একই ভাবনা। "এখন জুলির কী হবে বলতে পারো? সময় আর জোয়ার আর কতকাল সবুর করবে? জোয়ার যদি সত্যি সত্যি আসে জুলিও কি জোয়ারের মুখে ভেসে যাবে? আহা, বেচারি।"

"কী করে বলব, বোন?" সৌম্য ঈষৎ হাসে। "যুদ্ধঘোষণা করলেই যেমন যুদ্ধে নামা যায় না বিপ্লব ঘোষণা করলেই তেমনি বিপ্লবে এগোনো যায় না। ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেও যুদ্ধ করছে না। তেমনি জুলিরা বিপ্লব ঘোষণা করেও বিপ্লবে ঝাঁপ দেবে না। বন্দী হওয়া বোধ হয় জুলির বরাতে নেই। খুব সম্ভব ও মাটির তলায় যাবে। ওই যাকে বলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড।"

"আণ্ডারগ্রাউণ্ড!" যূথিকা অবাক হয়। "আণ্ডারগ্রাউণ্ড তো লণ্ডনের টিউব রেলকে বলে। এদেশে তো টিউব রেল নেই। ওরা কি তা হলে মাটির তলায় সুড়ং খুঁড়বে? না পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে সুড়ং খুঁজবে?"

"হা হা। আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাকে বলে জানো না?" মানস হেসে ওঠে। "ওই কলকাতা শহরেই এমন সব গলি ঘুঁজি আছে যেখানে গা ঢাকা দিলে টিকটিকির বাবাও টের পাবে না। জুলিকে ওর বন্ধুরা পিস্তল বা রিভলবারের মতো বেমালুম পাচার করে দেবে। ও নিরাপদে থাকবে। তবে ওর মা বেচারির বিপদ।"

"সেটা তো ভালো নয়। ওঁকে বাঁচাবে কে?" যূথিকা উদ্বিগ্ন হয়।

সৌম্য অভয় দিয়ে বলে, "উনিও নিরাপদ। ওঁর এক জামাই স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল। তবে ধরপাকড় একচোট হবেই। জুলিকে বাগে পেলে ওরা ছাড়বে না। কিন্তু জুলিরাও কম ফন্দীবাজ নয়। ওদেরও টিকটিকি আছে। ঠিক সময়ে খবর এনে দেবে। শঠে শাঠ্যম্! এই হলো ওদের নীতি। হিংসার জুটি অসত্য। যেমন অহিংসার জুটি সত্য। জুলিদের সঙ্গে আমাদের নীতিগত বিভেদ।"

"কিন্তু আরো একটা ভয়ের সম্ভবনা আছে, সৌম্যদা সেটা শুধু ওদের বেলা নয় তোমাদের বেলাও খাটে। কিছু একটা করতে গেলেই ইংরেজরা রটাবে যে জুলির দল হিটলারের পঞ্চমবাহিনী। আর তোমারাও হিটলারের শত্রুর শত্রু, অতএব মিত্র। এই অপবাদের ছাপ জেলখানার দাগের চেয়েও কলঙ্কময়। কুকুরকে বদনাম দিয়ে ওরা ফাঁসীতে লটকাবে।" মানস হুঁশিয়ারি দেয়।

সৌম্য স্বীকার করে যে ইংরেজদের হাতে ওটাও একটা তাস। বেকায়দায় পড়লে

ওই তাসটা ওরা খেলবে। কিন্তু সব অপবাদ কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতা তাদের আছে যারা সত্য আর অহিংসায় কায়মনোবাক্যে প্রতিষ্ঠিত। একথা অবশ্য জুলিদের বেলা পুরোপুরি খাটে না। হুঁশিয়ারিটা জুলিদের মনে রাখা উচিত।

মানস বলে, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে, যুদ্ধকালে প্রথমেই নিহত হয় সত্য। সত্য কী কাউকেই জানতে দেওয়া হয় না। অসত্য বা অর্ধসত্যকেই সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটা তো মহাভারতের যুগ থেকেই চলে আসছে। যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যনিষ্ঠ পুরুষকেও উচ্চারণ করতে হয় অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ। শেষ অংশটুকু ঢাক ঢোল পিটিয়ে চাপা দেওয়া হয়। একালের যুদ্ধে যত রকম মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে সব চেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে কলম আর কণ্ঠ। ইংরেজরা বড়াই করে যে গত মহাযুদ্ধে তারা প্রোপাগাণ্ডার জোরেই জিতেছে। এবারেও তাই হবে, সৌম্যদা। যুদ্ধকালে যদি ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দাও তোমাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া জুড়ে কুৎসা রটনা হবে খবরের কাগজে আর রেডিয়োতে। তোমরা আত্মসমর্থন করতে গেলে দেখবে সভাসমিতি নিষেধ, মুখ ফুটে কিছু বলতে গেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ছাপার উপরে কড়া সেনসরশিপ, চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত। তোমরা একেবারে নীরব। সুতরাং সর্বপ্রকারে নিরস্ত্র।"

সেগাঁওতে যে এ নিয়ে আলোচনা হয়নি তা নয়। সৌম্য বলে, "বাপুর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ সুহৃদরাই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন যে যুদ্ধকালে ইংরেজরা তাঁকে একটি কথাও বলতে দেবে না। সত্যকে বিকৃত করতেও ওদের বাধবে না। এ তোমার লবণ সত্যাগ্রহ নয় যে আমেরিকা থেকে ওয়েব মিলার এসে রিপোর্ট করবেন। আর আমেরিকার লোক ব্রিটিশ অত্যাচারের বিবরণ পড়ে স্তম্ভিত হবে। এবার কোনো রিপোর্টারকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। কেউ রিপোর্ট পাঠালে মাঝপথে আটক করা হবে। আর আমেরিকানরাও যদি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তো রিপোর্ট ছাপছেই বা কে? পড়ছেই বা কে? যুদ্ধকালে সংগ্রাম স্থগিত রাখাই শ্রেয়। গান্ধীজী এঁদের কথা মেনে নেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকেন। তাঁর সংগ্রাম নিছক ভারতের স্বার্থে নয়, ইংলণ্ডেরও স্বার্থে, সারা বিশ্বের স্বার্থে। স্বাধীন ভারত হিটলারকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করবে। হিটলার যদি অবুঝ হয় তবে স্বাধীন ভারতের নৈতিক সমর্থন পাবে সাম্রাজ্যহীন ব্রিটেন। স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রধারণ করবে। তিনি আপনাকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু তাঁর সত্যভাষণের স্বাধীনতা থাকবে। তিনি সত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সহ্য করবেন না। সত্য তাঁর কাছে অহিংসার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্যে তাঁর সংগ্রাম-

পদ্ধতির নাম সত্যাগ্রহ। ব্রিটিশ প্রোপাগাণ্ডাকে তিনি ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্রের মতোই ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবেন। কিন্তু ব্রিটেনকে তিনি বিব্রত করতে অনিচ্ছুক। তাই যতদিন সম্ভব সংগ্রাম সংবরণ করবেন। তা বলে গোটা যুদ্ধকালটা নয়। ইংরেজরা যদি তাদের কাজকর্মের দ্বারা ভারতীয়দের অতিষ্ঠ করে না তোলে তা হলে তিনিও তাদের অতিষ্ঠ করে তুলবেন না। কিন্তু জোর করে যদি সৈন্য বা শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়, জোর করে যদি ট্যাক্স বসানো বা চাঁদা আদায় হয়, জোর করে যদি মুখের অন্ন বা গায়ের কাপড় চালান দেওয়া হয় তবে সংঘাত অনিবার্য। সংঘাতকে তিনি অহিংস আকার দিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু ইংরেজরা যদি খেলোয়াড়ের মতো খেলার নিয়ম মেনে না খেলে তবে দেশের লোককে তিনি কাঁহাতক ঠেকিয়ে রাখবেন?"

মানস আশ্বস্ত হয়ে বলে, "সংগ্রামটা আপাতত বছর কয়েক সংবরণ করে দেখা যাক ব্রিটেন কতদূর সামলে উঠতে পারে। যুদ্ধ তো চার বছরের আগে থামছে না। আমেরিকা ইতিমধ্যে নামবেই। হিটলার পাগলের মতো ইহুদীদের মেরে তাড়াচ্ছে। ওরাও আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকানদের উসকাচ্ছে। সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে টোমাস মানের মতো স্বদেশপ্রেমিক জার্মানদের। তাঁর সহধর্মিণী ইহুদীবংশীয়া। তা বলে কারো চেয়ে কম স্বদেশপ্রেমিক নন। কিন্তু এখন জাতীয়ত্বের নিরিখ জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতি নয়, নর্ডিক রক্ত। মানের নিজেরই সেটা নেই, মাতৃকুল ক্রিওল। গত মহাযুদ্ধে তিনি কাইজারের সমর্থক ছিলেন, সবাই জানত তিনি পাকা জার্মান। এবার তিনি হিটলারের সমর্থক নন, তাই নাৎসীদের মতে কাঁচা জার্মান। তাদের মতে তাঁর সহধর্মিণী জার্মানই নন। আর সন্তানদেরও ওরা জার্মান বলে স্বীকার করবে না। পারিবারিক নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। আমেরিকা যদি যুদ্ধে যোগ না দেয় তবে তিনি দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত হবেন না। নয়তো তাঁকে গণ্য করা হবে দেশের শত্রু বলে। তাঁর পরিবারের আর সবাইকেও। গত মহাযুদ্ধের সেই জার্মান ন্যাশনালিস্ট টোমাস মানের এই মহাযুদ্ধে কী দুঃসহ সঙ্কট!"

যূথিকা তা শুনে বলে, "কেন? তোমার সঙ্কটটাই বা কম দুঃসহ কিসে? এই যুদ্ধে তুমি ইংরেজ পক্ষে। কিন্তু যুদ্ধকালে যদি গান্ধীজী তার সংগ্রাম শুরু করেন তবে দেশের লোকের চোখে তুমিও দেশের শত্রু। দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামীদের তুমি জেলে পাঠাবে। ওরা যদি হিংসার পথ ধরে তবে ওদের ফাঁসীও দিতে পারো। আর আমি তোমার সহধর্মিণী বলে তোমারই মতো দেশদ্রোহী। চাকরি ছাড়তে চাইলেও অনুমতি পাবে না। অনুমতি পেলেও এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষেই থেকে যাবে। দেশের লোক তোমাকে সাধুবাদ দেবে না, অথচ সরকারী কর্মচারীরাও তোমাকে ছেই ছেই

করবে। তুমি হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা। আর তোমার হাত ধরেছি বলে আমিও তাই। অর্থনৈতিক সমস্যা তো থাকবেই, তোমার তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা উপার্জন নেই। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ পক্ষে থেকেও খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ ও স্বস্তি এর কোনোটাই হারাবেন না। আর তুমি হবে সর্বহারা।"

মানস একেবারে মূক। টোমাস মানের প্রসঙ্গ তুলে বোকা বনে গেছে। সোমার দিকে করুণভাবে তাকায়।

"হ্যাঁ, তোমার অবস্থাটা উদ্বেগজনক বইকি।" সোমা সহৃদয়ভাবে বলে। "তবে তুমিই একমাত্র নও। আরো অনেকেই তোমার মতো ইংরেজদের পক্ষে। যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল। হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে চান না। কিন্তু গান্ধীজী যদি সংগ্রাম শুরু করেন তাঁকেও চোখ বুজে ঝাঁপ দিতে হবে। গান্ধীজী এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু জবাহরলাল তা নন। তিনি ইউরোপে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে এসেছেন যে তিনি ও তাঁর দেশ ঘোরতর নাৎসীবিরোধী ও সেই কারণে হিটলারের সঙ্গে আপসবিরোধী। তিনি যদি এ যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে না দাড়ান তো ইউরোপে তাঁর মানসম্মান ধূলোয় লুটোবে। সেও তবু ভালো, কিন্তু যদি উল্টে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেন তবে সবাই ধরে নেবে যে তিনি একজন প্রচ্ছন্ন নাৎসী। এর মতো অপবাদ তাঁর পক্ষে আর কী হতে পারে? হিটলারের অত বড়ো শত্রু কি খাস ইংলণ্ডেও বেশী আছে? কল্পনা করো জবাহরলালের অবস্থা। গান্ধীজী সব জানেন, সব বোঝেন। তাই অপেক্ষা করছেন। কে জানে যদি ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংরেজের একটা বোঝাপড়া হয়। যেটা উভয় পক্ষেই সম্মানের।"

"তা হলে তো আমি বেঁচে যাই। চাকরি ছাড়তে আমি মনে মনে তৈরি, কিন্তু ইংরেজ পক্ষ থেকে ডিগবাজি খেয়ে ইংরেজের বিপক্ষে যেতে পারব না। দেশের লোকের সাধুবাদে আমার কাজ নেই। হিটলার হচ্ছে মূর্তিমান শয়তান। স্বাধীন ভারত প্রথম দিনই তারও বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবে। আমিও লড়তে না হোক লড়াই দেখতে যাব। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া কি এ জন্মে হবে? মুসলিম লীগ কি হতে দেবে? ভুলে যেয়ো না যে বাংলা, পাঞ্জাব আর সিন্ধু তিনটে প্রদেশই ভিন্নদলের শাসকদের দখলে। এঁরা কংগ্রেসকে কেন্দ্রে মেজরিটির অধিকার দিতে নারাজ। এঁদের উপর কংগ্রেসপ্রাধান্য চাপিয়ে দিলে এঁরাও আন্দোলন শুরু করবেন। যুদ্ধকালে ইংরেজরা এঁদের সহযোগিতা হাতছাড়া করবে না। বিশেষ করে পাঞ্জাবে। সেখানে সৈন্যসংগ্রহ পুরো দমে চলেছে। পাঞ্জাবী মুসলমানরা বেঁকে বসলে কে তাদের উপর

জোর খাটাবে? আমি তো শুনতে পাই যে ভারতীয় সৈন্যদলের ওরাই শতকরা চল্লিশজন।" মানস ভাবনায় পড়ে।

"কঠিন সমস্যা।" সৌম্য বলে, "বাপু সমস্তই জানেন ও বোঝেন। এসব কথা তাঁর অন্তরঙ্গরাও তাঁকে শুনিয়েছেন। কিন্তু আমি যতদূর আভাস পেয়েছি তিনি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেও চিরকাল অপেক্ষা করবেন না। যুদ্ধ যদি আপনা থেকে না থামে তবে তাকে থামাবার জন্যে পৃথিবীতে ওই একজন আছেন। সেটা তাঁর পবিত্র কর্তব্য। তাঁর মুখের কথায় কোনো পক্ষই সাড়া দেবে না। সুতরাং তাঁকে সত্যাগ্রহে নামতেই হবে। এটাও তাঁর পবিত্র কর্তব্য। মানবিক কর্তব্য। যদিও দৃশ্যত জাতীয়তাবাদী কর্তব্য। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে হিংসার চেয়ে অহিংসার জোর আরো বেশী। অসত্যের চেয়ে সত্যের জোর আরো বেশী। তাঁর পেছনে যদি সারা দেশের সমগ্র জনগণ না-ও থাকে তবু তিনি একাই এগিয়ে যাবেন। কিন্তু যেদিন অন্তরের নির্দেশ পাবেন সেদিন। তার একদিন আগেও নয়, একদিন পরেও নয়। তাঁর সময়বোধ লেনিনের মতোই সঠিক।"

এর পরে সৌম্য বিদায় নিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু যূথিকা আহারের আয়োজন করেছিল। না খাইয়ে ছাড়বে না। ওজর আপত্তি শুনবে না। সৌম্য বলে, "এসব যদি খাই তো জেলখানার পথ্য আমার মুখে রুচবে না। আমার অভ্যাস নষ্ট হবে। কী করি? পড়েছি মোগলানীর হাতে। খানা খেতে হবে সাথে।"

"তোমাদের একটা খবর দেওয়া হয়নি।" সৌম্য বলে, "মালিকান্দায় এবার গান্ধী সেবাসঙ্ঘের অধিবেশন হচ্ছে। স্বয়ং গান্ধীজী যোগ দিচ্ছেন। আমাকেও যেতে হবে। সেবাসঙ্ঘের পক্ষে এটা জীবনমরণ প্রশ্ন। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। সঙ্ঘের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকতে অনিচ্ছুক।"

"মালিকান্দা?" মানস জানতে চায়, "কোথায় সে জায়গা?"

"স্টীমারে আসবার সময় পাশ দিয়ে এসেছ। পদ্মার ধারে। ঢাকা জেলায়। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের স্বস্থান।" সৌম্য উত্তর দেয়।

"তা হলে তো কাছেই। একবার ঘুরে আসা যায় না? বাপুকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।" মানস তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

"তা হলে তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করতে হয়। তোমার হয়ে আমি তার বন্দোবস্ত করতে পারি। কিন্তু তোমার উপর সরকারের নিষেধ নেই তো? পরে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে।" সৌম্য আশঙ্কা প্রকাশ করে।

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমার উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিক নয়। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে নচিকেতার জিজ্ঞাসা। যমরাজকে তো হাতের কাছে পাচ্ছিনে, তাঁর কাছে যাবারও সময় হয়নি। তাঁর মতো যোগ্য উপদেশক আর কে হতে পারেন? মানুষের মধ্যে মহাত্মাই তো সব চেয়ে বিজ্ঞ।" মানস মনে করে।

এই স্থির হলো যে অধিবেশনের একদিন আগে সৌম্য এসে মানসকে সঙ্গে করে সমস্ত পথ নিয়ে যাবে। ফেরবার সময় মানস একাই ফিরবে। তার দেরি আছে।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, সৌম্যদা, আমাকে বলতে পারো ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে অহিংসার ভবিষ্যৎ কী? ব্যক্তি অহিংস হতে পারে, কিন্তু আস্ত একটা জাতি! আস্ত একটা রাষ্ট্র!"

সৌম্য চকচকিয়ে যায়। "সেইটেই তো এ যুগের সর্বপ্রধান জিজ্ঞাসা। মার্কস লেনিন এর উত্তর দিয়ে যাননি। দিলে আর একটা মহাযুদ্ধ বাধত না। গান্ধীজী যদি দিতে পারেন তা হলে এই মহাযুদ্ধই হবে শেষ মহাযুদ্ধ, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবে না। আর নয়তো একটার পর একটা মহাযুদ্ধ বাধবেই, তার মাঝখানে বা পরে সশস্ত্র বিপ্লবও। মানবজাতির অস্তিত্ব যদি-বা থাকে সে জাতি নীতির দিক থেকে রুচির দিক থেকে ক্রমাগত অধোগামী হবে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার প্রগতিই তো সব নয়। তাই যদি হতো রাবণের লঙ্কার মতো প্রগতিশীল আর কোন্ দেশ ছিল সেকালে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। অন্তত একটি দেশকে বেছে নিতে হবে সত্যিকার মনুষ্যত্বের পথ। আপাতমনোহর রাক্ষসত্বের পথ নয়। সেই দেশটি কি ভারত? না ভারত নয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে গান্ধীজীকে। নয়তো তিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতারূপেই ইতিহাসে থাকবেন, তার বেশী নয়।"

যূথিকা তা শুনে বলে, "কিন্তু সৌম্যদা, মহাযুদ্ধের রকমারি কারণ যদি থাকে, সেসব কারণ যদি সবাই মিলে দূর না করে তবে মহাযুদ্ধ তুমি ঠেকাবে কী করে?"

"ঠেকাতে না পারলে যুদ্ধবিগ্রহের একটা অহিংস পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। মামলা মোকদ্দমাও একপ্রকার অহিংস বিকল্প। বিশ্ব আদালতে বিচার হবে। বিচারকরা নিরপেক্ষ। তা যদি না হয় তবে অহিংস অসহযোগ থেকে গণ সত্যাগ্রহ পর্যন্ত সব রকম অহিংস উপায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাদের এসব পরীক্ষা বিশ্বজনের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ব্যর্থতাও সিদ্ধির সোপান।" সৌম্য স্থির-নিশ্চয়।

॥ বিশ ॥

কলকাতা থেকে স্বপনদার চিঠি। চিঠিখানা যূথিকার হাতে দিয়ে মানস বলে, "পণ্ডিচেরী থেকে মুকুলদা এসেছেন। তাঁর থাকবার মেয়াদ সাতদিন কি আটদিন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা আমি যেন একবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। ইচ্ছাটা শুধু তাঁর নয়, স্বপনদারও। কেউ-বা যুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যাজুয়ালটি হয়, কেউ-বা ঘরে বসেই ক্যাজুয়ালটি। স্বপনদা এদের একজন।"

যূথিকা চমকে উঠে সুধায়, "কেন? কী হয়েছে তোমার বন্ধুর? বেঁচে আছেন তা তো চিঠি থেকেই প্রমাণ। জখম হলেন কবে ও কী করে?"

"আরে না, না। জখম টখম নয়।" মানস অভয় দেয়। "ওটাকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিনি। মুকুলদা যেমন গান নিয়ে পাগল স্বপনদারও তেমনি আরেক রকম পাগলামি। এত বয়স হলো, তবু বিয়ে করেনি, করবেনও না। ফ্লোরেয়ার ওঁর আদর্শ। সারাজীবন সাহিত্য নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। এমন কিছু সৃষ্টি করে যাবেন যা 'মাদাম বোভারি'র মতো অমর ও বিশ্বজনীন। কিন্তু ওঁর প্রস্তুতিপর্ব এখনো শেষ হলো না। কবে যে সত্যি সত্যি লিখতে বসবেন তা নিজেও জানেন না। ওঁর স্টাডিতে গেলে দেখবে চারিদিকে কেবল বই আর বই। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, বাংলা। শুনবে বাংলাকে ওদের পর্যায়ে তুলতে হবে। নয়তো জীবন বৃথা। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, লণ্ডনের মিডল টেম্পলে বছরে চারবার ডিনার খেয়ে বাকী সময়টা প্যারিসে আর হাইডেলবার্গে কাটিয়েছেন। সেই যে বিখ্যাত গান আছে, 'হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি', সেটা ওঁর বেলাও খাটে কি না জানিনে, কিন্তু আছে ওঁর জীবনের নেপথ্যে একটা প্রেমের উপাখ্যান।

একসঙ্গে বহুদিন আমরা ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনো আমাকে ওঁর গোপন কথা বলেননি যতদূর জানি কন্যাটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, তাঁকে ঘরে আনার উপায় নেই। কিন্তু ঘরে বসেই ক্যাজুয়ালটি আমি সেকথা ভেবে বলিনি।"

"তবে কোন কথা ভেবে?" যূথিকা জিজ্ঞাসু হয়।

"পুরুষের জীবনে বিবাহই কি সব? স্বপনদার ব্রত হলো ফ্লোবেয়ারের মতো অমনি একটি উপাখ্যান লেখা। তার জন্যে নানা ভাষার বইপত্র পড়া। সঙ্গীতের রেকর্ড শোনা। চিত্রকলার রিপ্রোডাকশন দেখা। ওঁর রেকর্ড সংগ্রহটিও অসাধারণ। যা শুনতে চাইবে শোনাবেন। আর আলবামের পর আলবাম তোমার সামনে মেলে ধরবেন। কার কার আঁকা ছবি দেখতে চাও বলো। এক এক করে দেখাবেন। এখন ওর সমস্যাটা হচ্ছে এই যে জার্মানী থেকে ওঁর বন্ধুবন্ধুনীদের চিঠিপত্র আসছে না, বইপত্রও সরকার আটক করছেন। ফ্রান্স এখন আক্রমণের মুখে। প্যারিস যে-কোনোদিন শত্রুর হাতে পড়বে। ছবির রিপ্রোডাকশন আর আসবে না। রেকর্ড কিছু কিছু লণ্ডন থেকে আনিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু আনলেও সমস্যা মিটবে না। রোজ রাত্রে ওঁর বাখ্, বেঠোভেন, মোৎসার্ট, শুবার্ট, ভাগনার শোনা অভ্যাস। নইলে ওঁর ঘুম হবে না। এতদিন কেউ কিছু মনে করেনি। এখন বাড়ীর লোক ভয় পাচ্ছে। পুলিশ যদি টের পায় তবে নাৎসী গুপ্তচর বলে সন্দেহ করবে। বাড়ী খানাতল্লাস হবে। ধরে নিয়ে যেতেও পারে। ব্যারিস্টারকে জেলে পুরতে পারবে না। তবু চারি দিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে। কেলেঙ্কারিকে দাদা বড্ড ডরান।" মানস তার বন্ধুর দুঃখের কাহিনী শোনায়।

"ওঃ। এইজন্যেই বলছ ক্যাজুয়ালটি।" যূথিকা মন্তব্য করে।

"আরো কথা আছে।" মানস বলে, "ইউরোপ থেকে ফিরে দাদা একটি ক্লাব পত্তন করেন। ইস্ট ওয়েস্ট ক্লাব। কিপলিংয়ের প্রত্যুত্তর। আমিও তার মেম্বর। তা তুমি জানো। সেই ক্লাবও একটি ক্যাজুয়ালটি হতে চলেছে।"

"ওমা! ক্লাব আবার কী অপরাধ করল?" যূথিকা অবাক। সেখানেও সন্দেহ।"

"না, না। কথাটা সে অর্থে বলিনি।" মানস খোলসা করে। "আমাদের মেম্বররা কেউ নাৎসীদের পক্ষে নন। যাঁরা জার্মানীফের্তা তাঁরাও ইংরেজ-ফরাসীদের পক্ষে। তাঁরা জার্মানীকে ভালোবাসেন, কিন্তু নাৎসীদের ঘৃণা করেন। তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা টোমাস মান, হাইনরিখ্ মান প্রভৃতি পলাতক জার্মান বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। নতুন একটা সমিতি স্থাপনের উদ্যোগও চলেছে। ফাসিস্টবিরোধী সমিতি। তাঁরাও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন। স্বপনদা কিন্তু

সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তিনি রাজনীতির উর্ধ্বে। ক্লাবটিকেও রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চান। কিন্তু সদস্যরা এ বিষয়ে একমত নন। অনেকেই নীরব সাক্ষী হতে নারাজ। যেমন আমি। স্বপনদা এতে ক্ষুন্ন। সরব হওয়া মানে সরকারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে নেওয়া। আর সাক্ষীর ভূমিকা ছেড়ে সৈনিকের ভূমিকায় নামলে তো মসী ছেড়ে অসি ধরতে হয়। তার মানে সরস্বতীকে ছাড়পত্র দেওয়া। তা হলে কোন্ সুবাদে আমি ক্লাবের মেম্বর থাকব? মেম্বরশিপের একটা অলিখিত শর্ত হচ্ছে স্বাধীনভাবে মসাচালনা। এ ছাড়া আরো একটা শর্ত আছে।"

যুথিকা কৌতূহলী হয়। "জানতে পারি?"

'তা হলে শোন।' মানস বিশদ করে। "দেয়ালির রাতে একজনের দীপ নিবে গেলে সে আরেকজনের দীপ থেকে নিজের দীপ জ্বালিয়ে নেয়। তেমনি সংস্কৃতির জগতেও এক দেশের দীপ থেকে আরেক দেশের দীপ। এক সভ্যতার দীপ থেকে আরেক সভ্যতার দীপ। এমনি করেই ইটালীতে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রেনেসাঁসের দীপ জ্বলেছে। তার থেকে বাংলাদেশে তথা ভারতে। আমাদের রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। তাকে সমাপ্ত করার দায় আমাদের উপরে। তাই আমরা ইউরোপের দীপ থেকে আমাদের দীপ জ্বালিয়ে নিতে সচেষ্ট। কিন্তু এখন দেখছি জার্মানীর দীপ নিবে গেছে। বুদ্ধিজীবীরা কে যে কোথায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা ও সৃষ্টিরক্ষা করছেন তার খবর মিলছে না। যাঁরা দেশে পড়ে আছেন তারা হয় কারারুদ্ধ নয় রুদ্ধবাক্। সভ্যতা বলতেও দেশে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। ফ্রান্সের দীপশিখাও নিবু নিবু। নাৎসীরা আক্রমণ করলে প্যারিস কি প্রতিরোধ করতে পারবে? বুদ্ধিজীবীরা দোটানায় পড়বেন। লড়বেন, না গা-ঢাকা দেবেন? পালাবার অভিপ্রায় নেই। এ অবস্থায় ফ্রান্সের কাছ থেকেই বা আমরা নতুন কী পেতে পারি? বাকী থাকে ইংলণ্ড। বইপত্র ওদেশ থেকে কিছু কিছু আসছে। কিন্তু লিখছেন কারা, বেশীর ভাগই তো যোগ দিয়েছেন সেনাবাহিনীতে বা দমকল বাহিনীতে বা বোমাবর্ষণের থেকে নাগরিকরক্ষা বাহিনীতে। অনবরত চর্চা না করলে সঙ্গীতেরও উন্নতি হয় না, চিত্রকলারও না, সাহিত্যেরও না। এই যুদ্ধ যদি চারবছর গড়ায় তো ইংলণ্ডের দীপশিখাটিও নিবে যাবে। ইংরেজদের কাছ থেকেই বা আমরা নতুন কী পেতে পারি? বুদ্ধিজীবীদের দিক থেকে বলছি, রাজনীতিকদের দিক থেকে নয়। তা হলে আমাদের ক্লাব আর প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনকেন্দ্র হবে না। তার চরিত্র বদলে যাবে। স্বপনদা তার দায়িত্ব নিতে চান না। আমাকে ডাকছেন এর একটা

বিহিত করতে। আমরা কি পাট গুটিয়ে নেব না সুদিনের ভরসায় অস্তিত্ব বজায় রাখব ?"

যূথিকা চিন্তান্বিত হয়। "তা তুমি একবার কলকাতা ঘুরে আসতে পারো। স্বপনদা আর মুকুন্দদা দু'জনের সঙ্গেই ভাববিনিময় হবে। এখানে তো সরকারী মহলের বাইরে পা বাড়াবার জো নেই তোমার। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখবে ?"

মানস ঠাওরায় কিছু একটা কিনে আনাব বরাত। তা নয়। জুলিকে খুঁজে বার করতে হবে। ও কেমন আছে ? ওর মা কেমন আছেন ? যূথিকার মন কেমন করে।

শিয়ালদা স্টেশনে স্বয়ং স্বপনদা হাজির। দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। "কী আফসোস, তুমি পরশু ফিরে যেতে চাও ? আরো দু'তিন দিন থাকলে ভালো হতো না ? ক্লাবটার একটা সদগতি করতে হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে সেটা হয় একটা অ্যান্টিফাসিস্ট ফোরাম।"

স্বপনদার নিজের গাড়ী ছিল না। এক বন্ধুর গাড়ী। পথে যেতে যেতে মানস বলে, "ছুটি চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু মামলা পেছিয়ে দেওয়া আমি পছন্দ করিনে, স্বপনদা। কত লোকের কত ক্ষতি হয়। তা ছাড়া যূথিকা এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে একলা রেখে আসা সুখের নয়।'

"ছাখ, মানস, তোমাকে আমি ডিস্টার্ব করতুম না। কিন্তু আমাদের বন্ধুদের মনোভাব লক্ষ করে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে আমি সব দিক থেকেই একটি ফেইলিওর। কোর্টে যাই আসি। পসার জমে না। তাই গাড়ী কিনতে পারিনে। ভাগ্যে একখানা বাড়ী আছে। বাবার সারাজীবনের সঞ্চয়ের ফল। ওঁরও তো বয়স হয়েছে। উনি আর কদ্দিন! যাবার আগে আমাকে সেটলড দেখে যেতে চান। আর সকলের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংসারী। তোমার যেমন পুত্রশোক বাবার তেমনি পৌত্র শখ। কিন্তু বিয়ে আমার কপালে থাকলে তো! যাক্, ছেড়ে দাও ওকথা। এই ক্লাবটাই আমার সন্তান। এ যদি গত হয় আমিও শোকসন্তপ্ত হব। কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখা আমার একার সাধ্য নয়।" স্বপনদা খেদোক্তি করেন।

"কেন ? কী হয়েছে ? কেউ চাঁদা দিচ্ছে না ?" মানস অনুমান করে।

"না, সেটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু তুমি তো জানো আমার ব্রত হলো পূর্ব পশ্চিম মিলন। পশ্চিমের তিনটি দেশ আমি বিশেষ করে বেছে নিয়েছি। ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স। ইটালীকেও বেছে নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ক্রোচের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে গিয়ে যে শিক্ষা হয় তার পরে ইটালী সম্বন্ধে আমি হতাশ। ইটালী মজেছে। মুসোলিনি ওকে মজিয়েছে।" স্বপনদা বিলাপ করেন।

"কই, আমাকে বলনি তো ক্রোচে তোমাকে কী বলেছিলেন ?" মানস সুধায়।

"ক্রোচে আমার প্রশ্নের উত্তরে মুখে হাত চাপা দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝান যে তিনি মৌনীবাবা। লিখিত উত্তরও দেবেন না। মুসোলিনির নিষেধ। না মানলে দেশত্যাগ। এত বড়ো লাইব্রেরী ফেলে কোথায় তিনি যাবেন ? তাঁর লাইব্রেরীই তাঁর বোধিবৃক্ষ। তেমনি আমারও। আমিও দেশত্যাগ করব না স্থির করেছি। তাই মৌনব্রত গ্রহণ করেছি। যুদ্ধই হোক আর বিপ্লবই হোক আমি নীরব সাক্ষী। কিন্তু আমার বন্ধুরা তা নন! তাঁরা সবাই সরব। কেউ কেউ তো সাক্ষী না হয়ে সক্রিয় হতে চান। এই যুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী। তা না হয় হলো, কিন্তু পূব পশ্চিমের মিলন ঘটল কোথায় ? জার্মানীর সঙ্গে লড়লে কি মিলন হয়, না বিরোধ হয় ? ওঁরা বলেন বিরোধটা জার্মানীর সঙ্গে নয়, নাৎসীদের সঙ্গে। কেন, নাৎসীরা কি জার্মান নয় ? দৃশ্যত তারাই তো অধিকাংশ।" স্বপনদা তাই মনে করেন।

বালীগঞ্জে স্বপনদাদের বাড়ী। উপরতলায় থাকেন বাবা, নিচের তলায় ছেলে। মা নেই সৎ মা আছেন। মানস তাঁদের প্রণাম করে। অবসরপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান অধ্যাপক যা বলেন তা মনে রাখবার মতো। "মানস, তোমার ছেলেদের আমি দেখেছি। কী সুন্দর উতরেছে! ওইরকম আরো কয়েকটি তৈরি করো।" ভদ্রলোক জানেন না যে ইতিমধ্যে ওদের একটি এ জগতে নেই। মানসের মনে লাগে।

কথাটা স্বপনদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বেচারা মুখ বুজে পালান। মানসের স্নানাহারের আয়োজন করেন। আহারের সময় আবার সেই ক্লাবের প্রসঙ্গ। ক্লাব যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে তাকে জীইয়ে রেখে কার কী লাভ ? যাক না ওরা, অ্যান্টি-ফাসিস্ট সমিতি গড়ুক। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিক।

মানস বলে, "ওঁরা যে জার্মানীকে ভালোবাসেন এটা যদি সত্য হয় তবে পূর্ব পশ্চিমের মিলনের পক্ষে এই যথেষ্ট নয় কি ? জার্মানীকে ভালোবাসেন বলে কি নাৎসীদেরও ভালোবাসতে হবে ? গের্নিকার উপর যারা অকারণে বোমাবর্ষণ করেছে তাদের ঘৃণা করা চলবে না ? চেকদের স্বাধীনতা হরণ করার পরও ক্ষমা করতে হবে ?"

"কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখতে হবে যে ক্ষমাহীন ঘৃণার লজিকসম্মত পরিণাম কী। পরিণাম সংঘর্ষ, রক্তপাত, যুদ্ধ। নাৎসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা মানেই জার্মানদের

সঙ্গে যুদ্ধ করা। তাতে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে মরবে। তাদের ঘরবাড়ী নির্বিশেষে ধ্বংস হবে। তাদের সভ্যতাও নির্বিশেষে লুপ্ত হবে। তা হলে মিলনটা হবে কার সঙ্গে কার? মিলনের জন্যে যদি চাড় থাকে তবে আমার মতো মৌন হও। একমনে নিজের কাজ করে যাও। ক্রোচে যেমন করে গেছেন।"

স্বপনদার যুক্তি মানসের চিত্ত স্পর্শ করে। প্রসঙ্গটা পালটে দিয়ে সুধায়, "তোমার জার্মান বন্ধুবান্ধবীদের খবর পাচ্ছ তো?"

"সরাসরি পাচ্ছিনে। সুইডেন বা সুইটজারলণ্ডের মারফৎ পাচ্ছি। ফ্রাউ নয়মানকে তোমার মনে আছে?" স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

"থাকবে না? ওঁদের বাড়ীতে তিনদিন ছিলুম। কী যত্ন! কী আদর! ওঁর মা বাবা কি এখনো বেঁচে? ওঁর স্বামী ডাক্তার নয়মান আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন। আর ওঁর ভাই হাইনরিখ তো ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। ওঁর মেয়েটির বোধহয় বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেটিও বড়ো হয়েছে এতদিনে।" মানস বলে যায়।

স্বপনদার মুখে বিষাদের প্রলেপ। "তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে হাইনরিখকে যুদ্ধে ধরে নিয়ে গেছে। সে এখন ইস্টার্ন কি ওয়েস্টার্ন কোন্ ফ্রন্টে, জানিনে। যদি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে নিযুক্ত হয়ে থাকে তবে বেলজিয়ান আর ফরাসীদের মারবে বা তাদের হাতে মরবে। দুই পক্ষই ক্যাথলিক। তা যদি বলো, পোলরাও ক্যাথলিক। ধর্মমত এ যুদ্ধে অবান্তর। এ তোমার সপ্তদশ শতাব্দী নয়। এবারকার যুদ্ধের বিশেষত্ব ধর্মের স্থান নিয়েছে ইডিওলজি। অর্থাৎ কমিউনিজম অথবা ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম। হাইনরিখ কখনো ইডিওলজি নিয়ে মাথা ঘামাত না। কিন্তু মন্দার সময় যাট লক্ষ বেকারের মধ্যে সেও ছিল একজন। নাৎসী দলে নাম না লেখালে বেকার দশা ঘুচবে না বলে নাৎসী বনে যায়। সেটা তো মন থেকে নয়, পেট থেকে। ওই মতবাদের কল্যাণে ক্যাথলিক হিটলার এখন প্রটেস্টান্ট জার্মানীর কর্ণধার হয়েছেন। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়াকে একসঙ্গে মিশিয়েছেন। নাৎসী না হলে আর কেউ কি এ কাজ পারত? বিস্মার্ক যে কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারলেন না হিটলার তা পারলেন। এটা একটা অলিখিত ম্যাণ্ডেট যা হিটলারকে নেতার আসনে বসায়। তেমনি আর একটা অলিখিত ম্যাণ্ডেট ভেরসাই সন্ধি রদবদল করা। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এতে রাজী হলে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে লড়াই অমনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

মানস চমৎকৃত হয়। "আর ইস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই?"

"বলা শক্ত। গত যুদ্ধের পর জার্মানীতেও কমিউনিস্টরা বিপ্লব বাধিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। তাদের ভয়েই তো লোকে নাৎসীদের দিকে ঝোঁকে। নাৎসীরাই

কমিউনিস্টদের বিপরীত মেরু, সোশিয়াল ডেমক্রাটরা নয়। জার্মানীর ভিতরেই একটা পোলারাইজেশন ঘটে গেছে। সোশিয়াল ডেমক্রাটরা ধুলিসাৎ। আর কখনো মাথা তুলবে না। আহা, কী সুখের ছিল সেই দিনগুলি যখন আমরা ওদেশে ছিলুম! তুমি কয়েক সপ্তাহ। আমি ঘুরে ফিরে বছর দুই। এখন নাৎসীরা কমিউনিস্টদের ঘরে হারিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু বাইরে হারিয়ে দেয়নি। ওদের ওটা তো একটা আন্তর্জাতিক মতবাদ। যেমন মুসলমানদের। ওদের মক্কা হচ্ছে মস্কো। ওদের হারিয়ে দিতে হলে মস্কো অবধি তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। পোলাণ্ড তার পথে পড়ে। আপাতত একটা চুক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু আখেরে রাশিয়াতে জার্মানীতে বেধে যাবে। কমিউনিস্টে নাৎসীতে। পেছনে আরো অনেকে দাঁড়াবে। শেষ ফল কী হবে তা কে বলতে পারে! সেইজন্যেই বলছিলুম যে ইস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই বন্ধহবার নয়। যদিও ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের লড়াই থেমে যেতে পারে।" স্বপনদার অভিমত।

মানস একটু ভেবে নিয়ে বলে, সেটা জার্মানীর পক্ষে সুবিধের। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফরাসীদের একটা বচন আছে—'সাডোয়ার পরে সেডান।' উচ্চারণটা বোধহয় সেদাঁ। সাডোয়াতে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিয়ে প্রাসিয়া সেডানে ফ্রান্সকে হারিয়ে দেয়। তেমনি পুবদিকের কোনো এক যুদ্ধে রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়ে জার্মানী পশ্চিমদিকে ফ্রান্সকে হারিয়ে দেবে, ইংলণ্ডকে হারিয়ে দেবে। শুধু যে আলসাস লোরেন ফিরে পাবে তা নয়, উপনিবেশগুলো ফেরৎ পাবে। এ যুদ্ধ মাঝপথে থামবার নয়, স্বপনদা। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে আরো বাড়তে দেবে না। দিলে ব্যালান্স অভ পাওয়ার বিপর্যস্ত হবে। কমিউনিজমের আতঙ্ক ওদের নেই। ফাসিজমকেই ওদের শঙ্কা। রাশিয়া বহুৎ দূরে। জার্মানী নাকের ডগায়। যুদ্ধ কি কেবল মতবাদের সঙ্গে মতবাদের হব? জাতীয় স্বার্থও যুদ্ধ ডেকে আনে।"

"যে কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছিলুম," স্বপনদার মনে পড়ে, "হাইনরিখ্ যেমন পেটের দায়ে নাৎসী হয় তেমনি আরো লক্ষ লক্ষ তরুণ। তাদের আমি ঘৃণা করি কেমন করে? নাৎসী না হলে ওরা যে না খেয়ে মারা যেত। হিটলার ওদের অন্নদাতা। তবে এটাও ঠিক যে আরো লক্ষ লক্ষ তরুণ নাৎসী হয়েছে ভেরসাই সন্ধি বরবাদ করার উদ্দেশ্য বা কমিউনিজমকে সমূলে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আরো অনেক লক্ষ নাৎসী বনেছে ইহুদীদের ঘরবাড়ী চাকরিবাকরি কলকারখানা দোকানপসার আত্মসাৎ করতে। যেহেতু তারা আর্য বংশ নয়, সেমিটিক বংশ। এতকাল জাতীয়তার আইন ছিল ius soli অর্থাৎ যে-দেশে যার জন্ম সেই দেশের সে নাগরিক। এখন তার বদলে ius sanguinis প্রচার করা

হচ্ছে। জন্মভূমি অনুসারে নাগরিক নয়, রক্তধারা অনুসারে নাগরিক। ইহুদীদের রক্তধারা স্বতন্ত্র। সুতরাং ওরা জার্মান নাগরিক হবার অযোগ্য। যদিও ওরা দেড় হাজার বছর ধরে জার্মানীর অধিবাসী। জার্মানীতেই ওদের পুরুষানুক্রমে জন্ম ও মৃত্যু। নাৎসীরা তাদের আর্যত্ব জাহির করার জন্যে স্বস্তিক ধারণ করে। সেটা সংস্কৃত শব্দ। শুভ আর অশুভ উভয়েরই প্রতীক। ডান দিকে মোড় না বাঁ দিকে মোড় সেই অনুসারে। নাৎসীদেরটা অশুভ।"

মানস সংশোধন করে। "শব্দটা সংস্কৃত, কিন্তু চিহ্নটা নিশ্চিতভাবে আর্য নয়। আমেরিকার আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ওর প্রচলন। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করব না। আক্ষেপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ইহুদীরাও রাজা ডেভিডের পঞ্চকোণ তারকা ধারণ করে। ওদের অনেকের আনুগত্য প্রাচীন জায়নের প্রতি, আধুনিক জার্মানীদের প্রতি নয়। ওরাও একটা হোমল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছে। আর ওরাও আর্য জাতিতত্ত্বের মতো ইহুদী জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। ইংলণ্ডে ওরা ইংরেজ, ফ্রান্সে ফরাসী, জার্মানীতে জার্মান, কিন্তু সর্বত্র ইহুদী। সর্বত্র ওদের জ্ঞাতি। যুদ্ধকালে কে ওদের বিশ্বাস করবে? কে জানে কার চর। নিষ্কণ্টক হবার জন্যে নাৎসীরা ওদের বিদায় করে দিতে চাইছে। কিন্তু ওরা যাবেই বা কোথায়! যেখানেই যাবে সেখানেই বিরোধ বাধবে। এমন কি তাদের প্রাচীন হোমল্যাণ্ডেও। সেখানে এখন আরব বসতি। সেও প্রায় দেড় হাজার বছরের। আমি তো এ সমস্যার কূল খুঁজে পাইনে। যদি না দুই পক্ষ মিশ্রণে সম্মত হয়। অর্থাৎ অন্তর্বিবাহে।"

"তাতেও কি রক্ষা আছে? টোমাস মান তো তাই করেছেন। এখন স্ত্রীপুত্র-কন্যার জন্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।" স্বপনদা ব্যথিত।

রাত্রে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। মানস দুপুরে একটু গড়ায়। তার উঠতে কিছু দেরি হয়। স্বপনদা চায়ের টেবলে প্রতীক্ষা করছিলেন। উঠে এসে জাগিয়ে তোলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মানস বলে, "কই, ফ্রাউ নয়মানের কাহিনী শেষ করলে না তো?"

"শুনে দুঃখ পাবে। বাপ মা বুড়ো হয়েছিলেন, মারা যান। তার পর মারা যায় ছেলেটি। যার টি বি হয়েছিল। এখন ওই বিশাল বাড়ীতে উনি আর ওঁর মেয়ে মারিয়া। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তিনি আবার বিয়ে করেছেন। ছিলেন তো ঘরজামাই। সেটা বোধহয় মনোমালিন্যের হেতু। ওঁদের সঙ্গে তুমি তো মাত্র তিনদিন কাটিয়েছ। আমি পুরো সিমেস্টার। সেইখান থেকেই রোজ বন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করতুম।" স্বপনদা স্মরণ করেন।

"আমি তো জানতুম হাইডেলবার্গ।" মানস জেরা করে।

"হাইডেলবার্গেও এক সিমেস্টার। জার্মানীতে আমি মোট চার সিমেস্টার পড়াশুনা করেছি। হাইডেলবার্গ, বন্, বার্লিন আর লাইপৎসিগ। ওদের দেশে ওরা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হতে দেয়। ক্রেডিটও মেলে। চারটের যে কোনো একটার থেকে ডক্টরেট নিতে পারা যেত। কিন্তু থীসিস লিখতে আমি গা করিনি। লিখলে জার্মান ভাষায় লিখতে হতো। আমার জার্মান বিদ্যা শতং বদ মা লিখ। ফরাসীও তাই। সরবনেও তো একবছর পড়েছি। বাকী একবছর গ্রেনোবলসে। ডিগ্রী চাইনি, পাইনি। বার-এ কল্ড হয়ে দেশে ফিরেছি। সেইটেই ছিল আমার আসল লক্ষ্য।" স্বপনদা স্মৃতিচারণ করেন।

চায়ের পরে মানস মুকুলদার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ভেবেছিল। স্বপনদা ওকে উঠতে দেন না। "এইখানেই ক্লাবের মেম্বরদের সঙ্গে আড্ডা বসবে। মুকুলকে আমি কথা দিয়েছি কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব ওর গুরুভগিনী মিসেস মুখার্জির ওখানে।"

এক এক করে সদস্য সমাগম হয়। মানসের সঙ্গে কারো কারো পরিচয় ছিল, কারো কারো নতুন করে ঘটে। জার্মানীফের্তাই বেশীর ভাগ।

"নীরব সাক্ষী হয়ে থাকা উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকা। স্বপন হয়তো সেটা পারে, আমি তো পারিনে," বলেন কান্তি পালিত। "হিটলার এসে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। জার্মানরা জাতকে জাত পেগান হয়ে গেছে। যীশুর ধর্মে বিশ্বাস করে না। যেহেতু তিনি ইহুদী। আর যেহেতু সে ধর্ম শক্তিমানকে বিবেকবান ও হৃদয়বান হতে শেখায়। হিটলারের আদর্শ নাটশের সুপারম্যান আর ভাগনারের অপেরার সিগ্‌ফ্রীড। আর ওঁর পূর্বসূরী বিসমার্কের মতো ওঁরও মূলমন্ত্র 'রক্ত আর লোহ'। ওঁর লক্ষ্য আপাতত ইউরোপের উপর আধিপত্য। 'আপাতত' বলেছি, 'আখেরে' বলিনি। আখেরে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও রাশিয়া কুপোকাৎ হলে আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখি।"

বেণীমাধব কাঞ্জিলাল তা শুনে বলেন, "আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখির আগে আধখানা এশিয়া মুখে পুরবে। বুঝলে, স্বপন?"

"আমি নিয়তি মানি। যা হবার তা হবেই। তোমার আমার কথায় একচুলও নড়চড় হবে না। সেইজন্যেই চুপ করে থাকি।" স্বপনদার কৈফিয়ৎ।

"তোমাকে লক্ষ্য করেই জুলিয়া বাঁদা লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সন্দর্ভ। বাংলা করলে যার মানে দাঁড়ায় বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা। সঙ্কটের দিন চাচা আপনা

বাঁচা, সঙ্কট কেটে গেলে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কেন অমন হলো, কেন তেমন হলো না। তখন সবাই মুখর। কিন্তু কার্যকালে মূক। বোবার শত্রু নেই, এই হচ্ছে তোমার পলিসি।" কাঞ্জিলাল খোঁচা দেন।

"ক্রোচেরও পলিসি তাই।" স্বপনদার সাফাই।

তা শুনে সরোজ পুরকায়স্থ মন্তব্য করেন, "আমি কিন্তু মেনে নিতে পারব না যে আজকের এই ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে আমার কোনো ভূমিকা নেই, আমার স্থান রঙ্গমঞ্চের বাইরে যেখানে দর্শকরা সমাসীন।"

সিঙ্গাড়ার থালা বাড়িয়ে দিয়ে স্বপনদা বলেন, "সবাই যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে যায় তো রঙ্গ দেখবে কে? মুচি আর মুদ্দফরাস, ভিস্তি আর ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রি আর ময়রা, দর্জি আর গয়লা এদেরও কি রঙ্গমঞ্চে তুলতে চাও? সবাই হবে অভিনেতা, দর্শক কেউ নয়? যুদ্ধ ব্যাপারটা কি একটা জেলেপাড়ার সঙ্, না একটা সীরিয়াস ব্যাপার?"

পুরকায়স্থ অপ্রস্তুত হন। "আমি কি তাই বলেছি? আমার বলার উদ্দেশ্য বুদ্ধিজীবীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে ঘটনার সাক্ষী হতে পারেন না। তাঁদের অ্যাকশনে নামতে হবে। কেউ হয়তো অসি হাতে নিয়ে সৈনিক হবেন, কেউ হয়তো মসীকেই অসির মতো এফেকটিভ করবেন। সৈনিক যেমন নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, থাকলে নির্ঘাত পরাজয়, বুদ্ধিজীবীও তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। থাকলে নিশ্চিত পরাজয়। পরাজয়ের ঝুঁকি আগেকার যুগে নেওয়া হয়েছে, এযুগে নেওয়া যায় না। কারণ এযুগে রাজত্ব বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কাঠামো বদলে যায়, সমাজের বিন্যাস বদলে যায়। এটা ইডিওলজির যুগ। দরকার হলে মুচি আর মুদ্দফরাসকেও একভাবে না একভাবে লড়তে হবে। রম্যাঁ রলাঁ সেবার ছিলেন 'অ্যাবভ দ্য ব্যাটল'। এবার তা নন। তেমনি বারট্রাণ্ড রাসেল সেবার ছিলেন যুদ্ধের না হোক কন্‌স্ক্রিপশনের বিরোধী। তার জন্যে জেল খেটেছিলেন। এবার তিনিও নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থন করেন, কন্‌স্ক্রিপশনেও তাঁর আপত্তি নেই। "অ্যাবভ দ্য ব্যাটল' কি তবে তুমিই?"

স্বপনদা সেইসব মহান সাহিত্যিকদের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ করেন। "আরে নাও, নাও, আর-একটা সিঙ্গাড়া নাও। ফুলুরি আসছে। কী যে বলো, আমি কি রাসেল বা রলাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য? গতবারের যুদ্ধে রিল্‌কের মতো কবিকেও কন্‌স্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল। ফল কী হলো তাতে? অস্ট্রিয়া জিতল? মাঝখান থেকে কাব্যের ক্ষতি হলো। একবার ভেবে দ্যাখ ফ্লোবেয়ার যদি

অসিযুদ্ধ বা মসীযুদ্ধ চালাতেন তা হলে আর-একজন অসিযোদ্ধা বা মসীযোদ্ধা বাড়ত, কিন্তু কোথায় থাকত 'মাদাম বোভারি'র মতো অপূর্ব সৃষ্টি ? ফরাসীরা কী নিয়ে আজ অবধি গর্ব করত ? কতক লোককে সৃষ্টির কাজ নিয়ে থাকতে হবে। যেমন নারীকে থাকতে হয় গর্ভধারণের কাজ নিয়ে, শিশুপালনের কাজ নিয়ে। তার বেলা সে-যুগ এ-যুগ নেই। স্রষ্টারা সব যুগেই স্রষ্টা, মাতারা সব যুগেই মাতা। তেমনি চাষীকেও চাষবাস নিয়েই থাকতে হবে, নইলে সবাই অভুক্ত থাকবে, যোদ্ধারাও। তাঁতীকেও কাপড় বোনা নিয়ে থাকতে হবে, নইলে সবাইকে বল্কল পরতে হবে, সৈনিকদেরও। মানুষ ফিরে যাবে কোন্ আদিযুগে, যদি যুদ্ধের দাবী সর্বগ্রাসী হয় ? আমি যুদ্ধবিরোধী নই। শান্তিবাদী নই। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্প নিয়ে থাকতে চাই।"

তা শুনে আদিত্য বর্মণ সবাক হন। "আজকের দিনে বিশুদ্ধ শিল্প বলে কিছু আছে নাকি ? পিকাসোকেও গের্নিকার ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানাতে হয়। তাতে স্পেনের লোকের প্রতিরোধেরও শক্তি বাড়ে। অথচ কে বলবে যে সেটা শিল্প নয় ?"

'রক্ষে করো।" স্বপনদা বলেন, "পিকাসোকে আমার আদর্শ করতে যেয়ো না। উনি অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, একখানা একটু অন্যরকম হলে কী আসে যায় ! আর আমি তো পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেই চলেছি। ক্লাসিক লিখতে চাই, কিছুতেই পারছিনে।"

"আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে আজকাল চিত্রকরকেও চিত্রের ভিতর দিয়ে সমকালীন ব্যাপারে বক্তব্য জানাতে হয়, স্বপনদা। নইলে তিনি এ যুগের লোক নন। তুমিও সেকেলে বলে গণ্য হবে। ক্লাসিকের দিন গেছে। পরে ফিরে আসতেও পারে, যদি সভ্যতা স্থিতি পায়। নাৎসীদের দৌরাত্ম্যে সভ্যতা বিপন্ন।" বর্মণ উদ্বিগ্ন।

তা শুনে স্বপনদা জলে ওঠেন। "সভ্যতা বিপন্ন কি শুধু নাৎসীদের দৌরাত্ম্যেই ? কমিউনিস্টদের দৌরাত্ম্যেও নয় ? ডেমক্রাট বলে যারা ঢাক পেটায় সেইসব প্লুটোডেমক্রাটদের দৌরাত্ম্যেও নয় ? যত দোষ নন্দঘোষ ! আমি তিন তিনটে দেশে চার চারটে বছর কাটিয়েছি। সাধারণ মানুষ কোথাও খারাপ নয়, ধনপতি গণপতি রণপতিরা কোথাও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। সমস্তক্ষণ যদি অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চলতে থাকে তবে নিরস্ত্রীকরণ কি কোনোদিন সম্ভব ? একতরফা নিরস্ত্রীকরণ কোন্ রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে ? জার্মানরা নাৎসী না হয়ে কমিউনিস্ট হলেও অস্ত্রবল বাড়াত, প্লুটোডেমক্রাট হলেও অলক্ষে তাই করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওই সোনার দিন-

গুলিতে আমি ইউরোপে ছিলুম। সেই স্বর্ণ সুযোগ ইউরোপের লোক হেলায় হারিয়েছে। নিরঙ্কুশ অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যুদ্ধক্ষেত্রে বলপরীক্ষা। দোষ ধরতে গেলে সকলেরই দোষ ধরতে হয়। বুদ্ধিজীবীরা যদি নীরব দর্শক না হয়ে সরব অভিনেতা হতে চান তো বাক্যবীর না হয়ে কর্মবীর হোন। ঘর্মপাত করুন। যেমন করছেন গান্ধীজী। অন্তত একটা দেশকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার থেকে বিরত থাকতে শেখাচ্ছেন। তোমাদের যুক্তিতর্কের সারমর্ম তো এই যে ভারতকেও অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়তে হবে। আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। আমি কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইনে। আমার হাতে সৃষ্টির কাজ। সৃষ্টির অবহেলা করলে সভ্যতা বলে কিছু থাকবে না। এইচ জি ওয়েলসের ভাষায় আমিই সেই সভ্যতা যাকে রক্ষা করার জন্যে তোমরা লড়াই করছ।”

গরম গরম ফুলুরি খেতে খেতে নিখিল বাগচী চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, “ভাই স্বপন, তুমি যখন জার্মানীতে ছিলে তখন ওদেশের শাসকদের অধীনে সেনাবাহিনী ছিল, পুলিশ বাহিনী ছিল, কিন্তু ছদ্মনামে একটা গুণ্ডাবাহিনী ছিল না। রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, কিন্তু নাৎসী আমলে যেটা হলো সেটা দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন। ইতিহাসে কোথাও এর নজির নেই, এক মুসোলিনির ফাসিস্ট ইটালী বাদে। এর যদি মূলোচ্ছেদ না করো তো এইটেই সব দেশের নিয়তি, ভারতও তাদের অন্যতম। এখন থেকেই জবাহরলাল তার লক্ষণ দেখে সরব। আমরা যারা দর্শক তারা পূর্বাভাষ দেখে শিউরে উঠছি। তবে অভিনেতা হবার মতো যোগ্যতা যে আমাদের সকলেরই আছে, তা নয়। যদি কেউ হতে চান তাঁর কাজ হবে যুদ্ধে যোগদান। যেমন জবাহরলালের।”

জবাহরলালের নাম শুনে তর্কাবিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। মানবেন্দ্রনাথ কেন নন? সুভাষচন্দ্র কেন নন? কেউ চান ঘোড়ার সামনে গাড়ী। কেউ গাড়ীর সামনে ঘোড়া। যুদ্ধের সামনে বিপ্লব। বিপ্লবের সামনে যুদ্ধ। মানস নীরব শ্রোতা।

স্বপনদা তার দিকে তাকান। “মানু, তুমিও কিছু বলো।”

মানস বলে, “মানবতার এত বড়ো সঙ্কট আর কখনো হয়নি। এত বেশী মানুষও আর কখনো অস্ত্র হাতে নেয়নি। এতরকম মারাত্মক অস্ত্রও আর কখনো তৈরি হয়নি। আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীরা যদি উদাসীন থাকেন তবে ভাবীকাল তাঁদের ক্ষমা করবে না। যদি না তাঁরা যুদ্ধকালে একখানি অনবদ্য কাব্য উপন্যাস রচনায় নিমগ্ন থাকেন, যেমন রয়েছেন স্বপনদা। কিন্তু মুশকিল এই যে বাইরে যেমন সঙ্কট ভিতরেও তেমনি সঙ্কট। যারা স্বদেশের জন্যে অস্ত্র ধরেননি ও ধরবেন না তাঁরা

বিদেশের জন্যে অস্ত্র ধরতে দেশের লোককে ডাক দেবেন কোন্ মুখে? তা হলে কি তাঁরা এককভাবে লড়বেন? লড়তে যাঁরা প্রস্তুত নন তাঁরা কলরব করলেই কি নাৎসীরা নিরস্ত বা পরাস্ত হবে?"

এর পরে আড্ডা জমে না। ঘর খালি হয়ে যায়। তখন স্বপনদা বলেন, "তুমি আজ আমার মুখরক্ষা করেছ, মানু। অ্যান্টিফাসিস্ট বলে যাঁরা পরিচয় দিচ্ছেন তাঁদের অনেকেই বর্ণচোরা কমিউনিস্ট। তাঁদের মতে হিটলার নাকি দানব আর স্টালিন নাকি দেবতা। হিটলারকে এঁরা রুখবেন, স্টালিনকে রুখবেন না। স্টালিন এসে আমাকে লিকুইডেট করার আগেই আমি এই ক্লাবকে লিকুইডিশনে দিতে চাই।"

॥ একুশ ॥

আড্ডায় যে কথা অনুক্ত থেকে যায় সেকথা নৈশভোজনের সময় উত্থাপন করেন। স্বপনদা। "সভ্যতা বিপন্ন বলে রাত্রে ঘুম নেই কাদের? না বুদ্ধিজীবীদের। কী করে তুমি এঁদের বোঝাবে যে বিপদটাকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলছেন সভ্য দেশের বুদ্ধিজীবীরাই? নিত্য নতুন মারণাস্ত্র উদ্‌ভাবন করছেন কারা? সেসব অস্ত্র রণপতিদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন কারা? রণপতিরা যদি সেসব অস্ত্রের অপপ্রয়োগ করেন তবে সেই পাপের ভাগী হবেন কারা? একবারও তাঁরা চিন্তা করে দেখছেন না যে পরস্পরের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হবে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের লুভর, ইটালীর ফ্লোরেন্স তথা রোমের অসংখ্য পুরাকীর্তি, জার্মানীর কোলন, মিউনিক, ড্রেসডেন ও ন্যূর্নবার্গের অমূল্য শিল্পসম্পদ। আর অস্ট্রিয়ার নগরীরানী ভিয়েনা। সভ্যতা বলতে কোথায় কতটুকু থাকবে যুদ্ধ যদি আরো দূরে ছড়ায়? মস্কো আর লেনিনগ্রাড যদি পুড়ে ছাই হয়? এই সর্বনাশ থেকে সভ্যতাকে বাঁচানোর উপায় কি সাহিত্যিককে সৈনিক করা ও সেই সৈনিকের উপর আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের বরাত দেওয়া? তার চেয়েও আরো মারাত্মক কাজ খবরের কাগজে বা রেডিওতে মিথ্যাপ্রচার করে জনমনকে বিষাক্ত করা। সাহিত্যিকরাও যদি পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই অপকর্ম করতে যান তবে সরস্বতী তাঁদের ক্ষমা করবেন না। তাঁদের দিয়ে মহৎ কোনো সৃষ্টি হবে না। সভ্যতা তার সত্যতা হারাবে।"

মানস বলে, "তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? তবু সভ্যতার এই সঙ্কটে উদাসীন থাকা যায় না, স্বপনদা। সৃষ্টির কাজ নিয়ে আমি ব্যাপৃত থাকতে চাই, কিন্তু সমস্তক্ষণ অস্বস্তি বোধ করি। রোম পুড়ছে, নীরো বাঁশি বাজাচ্ছেন!"

"এর উত্তরে আমি বলব, ভিয়েনার উপর গোলাবর্ষণ হচ্ছে, বেঠোভেন কানে শুনতে

পাচ্ছেন না, একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন। অমর সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে।" স্বপনদা উদাহরণ দেন।

"সেটা সম্ভব হয়েছিল তিনি বধির ছিলেন বলে। নইলে তিনিও অস্বস্তি বোধ করতেন, স্বপনদা।" মানস সুনিশ্চিত।

"তা হলে তুমিও কানে তুলো গুঁজে চোখে ঠুলি পরে সৃষ্টির কাজ নিয়ে থাকবে। যুদ্ধের খবর তোমার কানে পৌছবে না, চোখে পড়বে না।" স্বপনদার পরামর্শ।

"চোখে ঠুলি পরলে লিখব কী করে?" মানসের প্রশ্ন।

"সে বিদ্যা তোমাকে অভ্যাস করতে হবে।" স্বপনদা হাসেন। ওটা একটা ধাঁধা।

"আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছিনে স্বপনদা, চোখ মুখ বুজে আমি কেমন করে সৃষ্টির কাজে তন্ময় হতে পারি। ওটা তো উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে থাকা। তুমি কি বুদ্ধিজীবীদের উটপাখী হতে বলবে? তা হলে সব চেয়ে অতন্দ্র প্রহরী হবে কারা? এটা সেকালের সেই মঠবাড়ীতে আবদ্ধ থাকার ঐতিহ্য। রেনেসাঁসের পর থেকে দেখা যাচ্ছে লেওনার্দো, মিকেল আঞ্জেলো প্রভৃতি শিল্পীরা স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন নাগরিক হিসাবে তাঁদের কর্তব্য করতে। দুর্গ নির্মাণ করতে, অস্ত্র ধারণ করতে।" মানস তর্ক করে।

"প্রাচীন গ্রীসেও তুমি তার নজির পাবে, মানু। কিন্তু সেকালের যুদ্ধ একালের মতো এমন সর্বগ্রাসী ছিল না। কতক লোককে বীজধান রক্ষা করতে হবে, সেই বীজ থেকে নতুন ধান গজাবে। সেই কাজটাই বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত কাজ। নয়তো দেখবে বানের জলে সব ভেসে গেছে, বীজধানটুকুও নেই। যুদ্ধকালে চাষীকে চাষ করতে দেওয়া হয়, নইলে সৈনিকদের খোরাকে টান পড়ে। আমরাও আরেকপ্রকার খোরাক জোগাই। নইলে মনের খোরাকে টান পড়ে। মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। সাধুসন্তরাও আরো একপ্রকার খোরাক জোগান। সেটা আত্মার খোরাক। তার জন্যে মঠবাড়ীরও সার্থকতা আছে। হিটলার নাকি পাদ্রীদেরও যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। চ্যাপলেন হবার জন্যে নয়, অফিসার হবার জন্যে। হিটলার খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু যাঁরা করেন তাঁদের কর্তব্য কি হিটলারের শাসন মানা, না খ্রীস্টের অনুশাসন মানা? রুশদেশেও একই সঙ্কট। যীশু তো যীশু খোদ ঈশ্বরকেই কমিউনিস্টরা খারিজ করেছে। এখন আত্মার খোরাক যে ধান সে ধানের বীজধান রক্ষা করবে কারা? কতক লোককে প্লাবনের দিন নোয়ার মতো ভেলা বানিয়ে ভাবী সৃষ্টির বীজধান বাঁচাতে হবে।"

দুই বন্ধুতে মতভেদ যখন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে তখন বসবার ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। স্বপনদা উঠে যান। ফিরে এসে বলেন, "জুলি বলে কে একটি মেয়ে তোমাকে ডাকছে। ও কি তোমার জুলিয়েট না জুলেখা?" স্বপনদা রঙ্গ করেন।

"ওর নাম মঞ্জুলিকা সোম। বন্ধুপত্নী। যুথিকা আমাকে বলেছে ওর খোঁজ নিতে। ফোন করা হয়নি।" মানস উঠে যায়।

টেলিফোনে জুলি অভিমানের সুরে বলে, "বেশ! বেশ মানসদা! এই তোমার বন্ধুতা! আমি যেমন তোমাদের ওখানে উঠেছিলুম তেমনি তুমিও কেন আমাদের এখানে উঠলে না? অন্তত একটা খবর দিতে পারতে কোথায় উঠবে। তা হলে আমি স্টেশনে গিয়ে তোমাকে রিসিভ করে সেই ঠিকানায় পৌঁছে দিতুম।"

"কিন্তু তুমি জানলে কী করে আমি কলকাতা এসেছি ও এখানে উঠেছি? আমার ইচ্ছে ছিল তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া।' মানস বলে।

'হা হা। ওটা আমার সীক্রেট। আমাদেরও একটা সীক্রেট সার্ভিস আছে। তোমার গতিবিধি আমরাও লক্ষ করছি।" জুলি কৌতুক করে।

"এতই যদি জানতে তো স্টেশনে গেলে না কেন?" মানস জেরা করে।

"কারণ যুথীদির চিঠিখানা আমি সবে বাড়ী ফিরে পাচ্ছি। এই যাঃ! ফাঁস হয়ে গেল আমার সীক্রেট। যাক. তুমি কি এখন ফ্রী আছো? দিনের বেলা আমি ফ্রী থাকিনে। কালকেও দিনের বেলা দেখা হবে না। হতে পারে রাত্রে এইরকম সময়। আমাদের এখানে ডিনারে আসবে? তোমার বন্ধুকে নিয়ে? বলো তো আমি তাঁকে আজ এখনি গিয়ে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করি। তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে, মানসদা।" জুলি এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"চলে এসো।" মানস এককথায় উত্তর দেয়।

"জুলি আসছে তোমাকে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করতে।" স্বপনদাকে বলে মানস।

জুলির পরিচিতি শুনে স্বপনদা বলেন, "ওর ভগ্নীপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। মহা ধুরন্ধর ব্যারিস্টার। আদালতে বেস্ট ড্রেসড ম্যান বলে ওঁর সুখ্যাতি। কিন্তু দিনরাত মামলা মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন বৌকে সময় দিতে পারেন না। বৌকে বেড়াতে যেতে দেন জুনিয়রের সঙ্গে। বেড়াতে বেড়াতে বৌ একদিন হাওয়া।"

স্বপনদা হো হো করে হেসে ওঠেন। মানস স্তম্ভিত হয়।

"বৌকে সময় দিতে পারো না তো বিয়ে করতে যাও কেন? সেইজন্যেই তো

ফ্লোবেয়ার বিয়ে করেননি। নইলে লুইজ কোলে কি তাঁকে কম সাধাসাধি করে-ছিলেন? শেষে একদিন প্যারিস ছেড়ে তাঁর মফস্বলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। ফ্লোবেয়ার সেই বিখ্যাত লেখিকাকে ঘাড় ধরে বার করে দেন। তা দেখে মর্মাহত হন তাঁর মা মাদাম ফ্লোবেয়ার। ছেলেকে বলেন, তুমি আজ সমগ্র নারীজাতির অবমাননা করলে। কাজটা সত্যিই গর্হিত হয়েছিল, মানস। কিন্তু নিয়তি! নারীর মনোরঞ্জন করতে গেলে আর্টের বিঘ্ন হয়। আর্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও এক ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। আর্টের পূজারী হওয়াই তাঁর নিয়তি। তাঁর নিয়তিই তাঁকে নির্মম করেছিল। নয়তো সত্যিই কি তিনি হৃদয়হীন ছিলেন? যাকে শরবৎ তন্ময় হয়ে ক্লাসিক লিখতে হবে সে নারীর দাবী মেটানোর জন্যে সময় পাবে কখন?” স্বপনদা বোধহয় নিজের নিয়তির ইঙ্গিত দেন।

মানস দুঃখিত হয়। “কিন্তু কথা হচ্ছিল জুলির ভগ্নীপতির।”

“হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বৌ হাওয়া হয়ে যাবার পর চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যায়। সে এক মহা কেলেঙ্কারি। হাইকোর্টে ডিভোর্সের মামলা। বারের মুখ চেয়ে জজ-সাহেব ক্যামেরাতে বিচার করেন। ডিভোর্সের পর দু'জনেই আবার বিয়ে করেন। জুলির দিদি হচ্ছেন দ্বিতীয় পক্ষ। তার কর্তা তাঁকে মাথায় করে রেখেছেন। আর সেই প্রথম পক্ষ পড়েছেন অনটনের কবলে। ওঁরা কলকাতা ছেড়ে চলে যান পাটনায়। সেখানে নতুন করে প্র্যাকটিস জমাতে কষ্ট হয়। দেখা গেল ধনের চেয়ে মনই বড়ো জিনিস। নারীর মন চায় পুরুষের মন। অনটনে পড়লেও তিনি অনুতপ্ত নন। মা হয়েছেন। একেই বলে নিয়তি। সবই নিয়তি। সবই নিয়তির খেলা।” স্বপনদার জীবনদর্শন।

জুলিকে রিসিভ করে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মানস বলে, “ইনি আমার বন্ধু স্বপনদা। আর এই আমার বন্ধুপত্নী জুলি।”

জুলি একবার ভেবে নেয় কী করবে। পা ছুঁয়ে প্রণাম, না হাতযোড় করে নমস্কার, না হ্যাণ্ডশেক, না লাল সেলাম। তার পর হ্যাণ্ডশেকের জন্যে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। “প্লীজড টু মীট ইউ, মিস্টার গুপ্ত।”

স্বপনদাও ব্যরিস্টারি ঢঙে জবাব দেন, “সো প্লীজড টু মীট ইউ, মিসেস সোম। আমি আপনার ভগ্নীপতিকে চিনি। এইমাত্র ওঁর কথা বলছিলুম।’,

“আমাকে মিসেস সোম বলে লজ্জা দেবেন না। আর আমাকে ‘আপনি’ বললে আমি আরো লজ্জা পাব।” এই বলে জুলি জাঁকিয়ে বসে।

তখন মানসকেই ব্যাখ্যা দিতে হয় যে বিয়ের অল্পদিন পরেই ওর স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তার পর ঘটে অকালবৈধব্য। তখন থেকেই ও কুমারী নাম

ব্যবহার করে আসছে। পিতৃপরিচয় ক্যাপটেন সিন্‌হা। সিভিল সার্জন। স্বর্গত।

"হাউ স্যাড! হাউ ভেরি স্যাড, মিস সিন্‌হা!" স্বপনদা প্রথমে ইংরেজীতে বলে পরে শুধরে নেন। "নিয়তি! তোমার নিয়তি।"

"আমাকে জুলি বললেই আমি খুশি হব, মিস্টার গুপ্ত। আরো খুশি হব, যদি আমাকে স্বপনদা বলার অধিকার দেন।"

"স্বচ্ছন্দে। তুমি আমাকে তুমি বললেও আমি রাগ করব না। বরং না বললেই রাগ করব, জুলি।" স্বপনদা অভয় দেন।

এর পর মানস বলে, "যূথিকা তোমার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন। তুমি কি জেলে গেছ না জেলের বাইরে আছো না মাটির তলায় লুকিয়ে রয়েছ না দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছ? একখানা চিঠি লিখতে সময় পাও না?"

জুলি খিল খিল করে হেসে ওঠে। "কেন? আমার কি ফ্লার্ট করার বয়স গড়িয়ে গেছে? না আমি দেখতে খুব বিশ্রী? না আমার বিবাহে বাধা আছে?"

মানস অপ্রস্তুত হয়ে স্বপনদার দিকে তাকায়। স্বপনদা আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমরা কেউ কিছু মনে করব না। তুমি নির্ভয়ে বলে যাও।"

"মানসদা, তুমি তো জানো আমি একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। দলের লক্ষ্য বিপ্লব। কিন্তু আগেকার মতো সন্ত্রাসবাদী অর্থে নয়। এখন মার্কসবাদী অর্থে। তাই নিয়ে আমরা আজকাল সারাক্ষণ ব্যস্ত। আর কিছু পারি না পারি পুলিশকে কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো ঘোরাচ্ছি। ওরাও বিরক্ত হয়ে বলে, একটা কিছু ঘটাচ্ছ না কেন? আমরাও বিরক্ত হয়ে বলি, গান্ধী বুড়ো কেন ঘটাতে দিচ্ছে না?" জুলি শুনিয়ে যায়।

"দেশ প্রস্তুত না হলে গান্ধীজী ডাক দেবেন না। আর প্রস্তুত বলতে তিনি বোঝেন অহিংস অর্থে প্রস্তুত। তোমরা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছো কেন?" মানস জানতে চায়।

"আমরা যদি আগ বাড়িয়ে আরম্ভ করি আর তিনি যদি বুদ্ধের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন তো আমরাই আইসোলেটেড হব।" জুলি অকপটে স্বীকার করে।

"তার মানে জনতা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।" মানস এই অর্থ করে।

"তার মানে গান্ধীজী ওদের হিপনোটাইজ করেছেন। এটা একটা আজব দেশ। এদেশে ভেক না পরলে ভিখ মেলে না। নির্বাচনে দাঁড়ালে ভোট মেলে না। সংগ্রামের ডাক দিলে সাড়া মেলে না। গান্ধীজীর ভেক হচ্ছে খদ্দরের নেংটি। আর

খদ্দরের টুপি। আমাদের বাধ্য হয়ে খাদি পরতে হচ্ছে, তবে নেংটি পরতে কেউ রাজী নয়। সেইজন্যে তো আমরা হিপনোটাইজ করতে পারছিনে। প্রতিদিন আমরা এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি। বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অন্বেষণ করি। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা মেলে না। গান্ধীজী থাকতে মিলবেও না।" জুলিকে শান্ত মনে হয়।

স্বপনদা মৌনভঙ্গ করেন। "ছাখ, জুলি, রুশ বিপ্লবের পরে জার্মানীতেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল। তোমাকে দেখে আমার রোজা লুকসেমবুর্গের কথা মনে আসে। তুমিও তেমনি আদর্শবাদী এক বিপ্লবী নায়িকা। কিন্তু তার আদর্শবাদ তাঁকে বাঁচাতে পারে না। তাঁর বিপ্লববাদ তাঁকে সাফল্য এনে দিতে পারে না। গান্ধীজী না থাকলেও যে তোমরা বিপ্লব ঘটাতে পারতে বা তাতে সফল হতে পারতে তা নয়। তিনি আছেন বলেই তোমরা একটা অজুহাত দেখাতে পারছ। হিপনোটিজম দিয়ে এর ব্যাখ্যা হয় না। ভেক দিয়েও না। সোজা অর্থ এই যে কাইজারের শাসন জারের শাসনের মতো দুর্বহ ছিল না, ইংরেজের শাসনও জারের শাসনের মতো দুর্বহ নয়। যুদ্ধের চাপে যদি কোনোদিন দুর্বহ হয় তবে জনগণ তোমাদের ডাকেও সাড়া দেবে। তবে সব বিপ্লব সফল হয় না। ফরাসী বিপ্লবও শেষপর্যন্ত বিফল হয়। তোমাদের বিপ্লবেরও শেষ পরিণতি কী হবে কে জানে? গান্ধীজী সেইজন্যে বিপ্লবের নাম মুখে আনছেন না। তাঁর লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা। উপায় অহিংস সংগ্রাম। তাঁর সঙ্গে তোমাদের না উদ্দেশ্যের মিল, না উপায়ের মিল। কেন তবে তোমরা তাঁর দোষ ধরছ?" স্বপনদা সুধান।

"কারণ তাঁর জন্যেই সময় বয়ে যাচ্ছে। সময় আর জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। এ সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে আবার মিলবে না। ইংলণ্ড সামলে নেবে। আমেরিকা সাহায্য করবে। ভারতের স্বাধীনতা এক পুরুষ পেছিয়ে যাবে।" জুলি আশঙ্কা করে।

"স্বাধীনতা পাওয়া যত না কঠিন রাখা তার চেয়েও কঠিন। দেখলে না তুমি পোলাণ্ডের কী হাল হলো। পোলাণ্ড দেড়শো বছর পরাধীন ছিল। তোমরা কি পোলদের চেয়ে বেশী সংগ্রাম করেছ? পোলদের চেয়ে বেশী নির্যাতনে ভুগেছ? পোলদের চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছ? আগে স্বাধীনতার যোগ্য হও। পরে স্বাধীন হবে। মওকার উপর যারা নির্ভর করে তারা দুর্বল। তারা জুয়াড়ি।" বলে স্বপনদা মাফ চান।

জুলি ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

"তোমার বয়স কম। তুমি অনায়াসেই আরো বিশবছর অপেক্ষা করতে পারবে। গান্ধীজীর বয়স ঢের বেশী। তিনি বিশবছর অপেক্ষা করতে পারবেন না, তার আগেই শেষবারের মতো লড়বেন। কত আর দেরি হবে! ততদিন তাঁর কথামতো কাজ করো। তাঁকে পেছনে ফেলে তোমরা কেউ এগিয়ে যেতে পারছ না, পারবেও না। তুমি এত মিষ্টি মেয়ে, তুমি এর মধ্যে কেন? তোমাকে আমি উড়নচণ্ডী দেখতে চাইনে। চুলে চিরুনি পড়েনি কদ্দিন?"

জুলি মনে মনে খুশি হয়। কিন্তু বিপ্লবী নায়িকার ভাষায় উত্তর দেয়, "দ্রৌপদীর মতো আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে দেশ স্বাধীন না হওয়াতক কেশ বাঁধব না।"

"পাগল মেয়ে।" স্বপনদা সস্নেহে বলেন, "তার আগে জট পাকিয়ে যাবে। থাকত যদি তোমার বৌদি তা হলে এক্ষুনি ধরে নিয়ে গিয়ে মাথায় চিরুনি বুলিয়ে দিত। স্বাধীনতার অনেক দেরি। দিল্লী অনেক দূর।"

এরপর তিনজনে মিলে স্টাডিতে গিয়ে বসে। কফি আর ক্রীম পরিবেশিত হয়। চাকরকে দেখে জুলির খটকা বাধে। "স্বপনদা, বৌদি কোথায়? বৌদিকে দেখছিনে কেন?"

"বৌদি!" স্বপনদা সকৌতুকে বলেন, "বৌদি যে কোথায় তাই যদি জানতুম তবে এতদিন আইবুড় থাকতুম না।"

"ওঃ! তোমার বিয়েই হয়নি!" জুলি আশ্চর্য হয়। "কেন বলো তো?"

"কারণটা খুব সোজা। আমি যাকে চাই সে আমাকে চায় না। যে আমাকে চায় আমি তাকে চাইনে। এমনি করে প্রায় বুড়ো হতে চললুম। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাই। আমার নয়, আইরিশ কবি য়েটসের।" এই বলে স্বপনদা তাঁর বুকশেলফ থেকে একখানা কাব্যসংগ্রহ পেড়ে নিয়ে আসেন। আর পড়েন।

> "Pardon, old fathers, if you still remain
> Somewhere in ear-shot for the story's end...
> Pardon that for a barren passion's sake,
> Although I have come close on forty-nine,
> I have no child, I have nothing but a book,
> Nothing but that to prove your blood and mine."

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মানস। "তোমার বয়স উনপঞ্চাশ নয়, তোমার আশা আছে। য়েটস তো ওই কবিতা লেখার তিন বছর বাদেই বিয়ে করেন। দুটি সন্তান হয়। কিন্তু তোমার যে আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তুমি ফ্লোবেয়ারের মতো ক্লাসিক লিখবে।"

"সেটাই বা হচ্ছে কোথায় ? কেবল খগড়ার পর খগড়া মুসাবিদা করা চলেছে। আমার পরিস্থিতিটা না ঘরকা না ঘাটকা।" স্বপনদা স্বীকারোক্তি করেন।

"ওঃ!" জুলি সান্ত্বনা দেয়। তার চোখে জল এসে পড়ে। মুখ ফুটে জানায় না যে তার নিজেরও সেই একই পরিস্থিতি।

বইখানার পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় মানসের দৃষ্টি আটকে যায়। সে জুলির দিকে তাকায় আর তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চারণ করে—

"Dear shadows, now you know it all,
All the folly of a fight
With a common wrong or right.
The innocent and the beautiful
Have no enemy but time…"

মানস পড়া শেষ করে বলে, "জুলি, ওটা তোমাকেই উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে। মনে রেখো, তোমার আর কোনো শত্রু নেই, তোমার একমাত্র শত্রুর নাম সময়।"

স্বপনদারও চোখে জল এসে পড়ে। "জুলি, তুমিও সময়ে সচেতন না হলে ওই দুটি সুন্দরী মেয়ের মতো শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে যাবে। দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা করতে পারে, নারীর যৌবন অপেক্ষা করতে পারে না।"

জুলি দুই হাতে দুই চোখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "তুমি কি জানো না, মানসদা, কেন আমার এই দশা। কেন তবে নাকাল করতে যাও। আর স্বপনদা, তুমি যদি সব কথা জানতে তা হলে আমাকে ভুল বুঝতে না।"

এর পর জুলি স্বপনদাকে ও মানসকে পরের দিন ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বিদায় নেয়।

মানসের ঘুম পেয়েছিল। সে উঠতে চায়, কিন্তু স্বপনদা তাকে ছাড়বেন না। শুনতে হবে তাঁর বহুদিনের না বলা কথা।

"ভ্যানিটি অভ্ ভ্যানিটিজ। অল ইজ ভ্যানিটি!" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "যেন আমার একার মাথাব্যথা, আর কারো নয়।"

"কোন্ প্রসঙ্গে বলছ ?" মানস ঠাহর করতে পারে।

"প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়। যার স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে এসেছি। এমন করে স্বপ্নভঙ্গ হবে কে পেরেছিল ভাবতে! আমার চারিদিকের বাতাসে আজ কী উৎকট ইংরেজ বিদ্বেষ! যেন ওরা অমঙ্গলের প্রতীক। শনি কিংবা রাহু। ওদের গ্রাস থেকে মুক্ত হলেই বাঁচি। ওরা যে ইউরোপীয় সভ্যতার দূত একথা বলতে গেলে

উলটো বুঝলি রাম। গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাই অসভ্যতা। ইউরোপ বলতে ওরা বোঝে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, বস্তুবাদ, ভোগবাদ। আর আমি বুঝি প্রাচীন গ্রীস ও রোম যার প্রতিভূ হোমার ও ভার্জিল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে জুডিয়া থেকে আগত খ্রীস্টধর্ম, যার প্রতিভূ দান্তে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের থেকে উত্থিত রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট। যার প্রতিভূ শেক্সপীয়ার, রুশো, গ্যেটে। এঁদের বর্জন করে কি কোনো সমন্বয় হতে পারে? কিন্তু গ্রহণশীল মনোভাবটা আজ কোথায়? বিশুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতার স্বপ্নে যাঁরা বিভোর তাঁদের আমি কেমন করে বোঝাব যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আগত হেলেনিক প্রবাহকে প্রাচীন ভারত বিজেতা বলে বর্জন করেনি, আরব ইরান তুর্কিস্থান থেকে আগত সারাসেনিক মৌসুমী বর্ষণকে মধ্যযুগের ভারত বিধর্মী বলে বর্জন করেনি, তা হলে ব্রিটেন থেকে আগত আধুনিক ইউরোপীয় ভাবধারা তুমি বিদেশী বলে বর্জন করবে কোন যুক্তির জোরে? বিদেশী বস্ত্র বা বিদেশী লবণ বর্জন করা এক জিনিস, তা দিয়ে স্বদেশী শিল্পের সংরক্ষণ হয়, শিল্পীদের প্রতিপালন হয়। কিন্তু সেই যুক্তি কি বিদেশী জ্ঞান বিজ্ঞানের বেলা খাটে? বিদেশী কাব্য নাটকের বেলা? সেসব অন্য জিনিস। তার যেটুকু আমরা গ্রহণ করেছি তার সংযোগে কি আমাদের যাবনী মিশাল সংস্কৃতির নব রূপান্তর ঘটেনি? বলতে পারো, এই যথেষ্ট নয়, কিন্তু বলতে পারো কি, এটা সত্য ও সৌন্দর্যহীন ব্যর্থ অনুকরণ? বিজাতীয় উন্মার্গগামিতা?"

"কে বলছে এমন কথা, স্বপনদা? আমি তো বলিনি।" মানস ক্ষুণ্ণ হয়।

"না, তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে।" স্বপনদা শুধরে দেন। "প্রেজেণ্ট কম্পানী অলওয়েজ এক্সেপ্টেড। তুমি তো আমার দিকে। কিন্তু অন্য দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা খোদ রবীন্দ্রনাথেরই মহিমা অস্বীকার করছেন। রবি বাদ দিলে কী বাকী থাকে চন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। চন্দ্রকেও অনেকে বুর্জোয়া বলে বাতিল করবেন। চন্দ্রকেও বাদ দিলে বাকী থাকে কী? তারা। যাক্, আমি আর নাম করব না। পাছে কেউ ভাবে আমি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী। না, আমি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমি সকলের সঙ্গেই মিশি, সকলেরই তারিফ করি। সকলেই যে যার বক্তব্য বলছেন, আমি মন দিয়ে শুনছি। কিন্তু আমার সাধনা আমার নিজস্ব। এই যে লাইব্রেরী দেখছ এর গ্রন্থরাজি থেকে আমি তিল তিল করে রূপ আহরণ করে তিলোত্তমা সৃষ্টি করছি। তেমনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার থেকে বিন্দু বিন্দু করে রস আহরণ করে সেই তিলোত্তমাকে মাধুরী অভিষিক্ত করছি। আমারও কিছু দেবার আছে। সে দান আমি যদি না দিই আর কে দেবে? তাই আমি অনন্য। শুধু আক্ষেপ আমার এই যে মনের মতো পাঠকমণ্ডলী নেই।"

"আচ্ছা, মুকুলদা," মানস জিজ্ঞাসা করে, "তুমি যে লিখেছিলে শ্রী অরবিন্দ এই যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী সেটা কি নিঃশর্তে না শর্তাধীন ভাবে? যদি নিঃশর্তে হয়ে থাকে তো দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম কি ব্যাহত হবে না?"

মুকুলদা এর উত্তরে বলেন, "তোমার এই প্রশ্ন শ্রী অরবিন্দের কাছে আরো আগে আরো অনেকে করেছেন। তাঁর মতো ন্যাশনালিস্ট কে? কিন্তু সেটাই কি তাঁর একমাত্র পরিচয়? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে নানা দেশের জিজ্ঞাসু মানুষ। তিনি কি শুধু দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক নন? তিনি কি কেবল ন্যাশনালিস্ট, ইণ্টারন্যাশনালিস্ট নন? সব দিক বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারত স্বাধীন হলেও নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না, নিরপেক্ষ থাকাটা একটা পাপ, কারণ এই যুদ্ধটা হচ্ছে একটা মহাভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির সঙ্গে একটা কম ভয়ঙ্কর অপেক্ষাকৃত শুভ শক্তির। এককথায় কৌরবের সঙ্গে পাণ্ডবের। ভারতের ভূমিকা হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের। তাই যদি হয়ে থাকে তবে স্বাধীনতা পেলেও ভারত লড়বে, না পেলেও লড়বে। আর মিত্রপক্ষেই লড়বে। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম আপাতত অবান্তর। আগে তো অশুভ শক্তি পরাভূত হোক, বিশ্বমানব মহাভয় থেকে পরিত্রাণ পাক। তার পরে ভারতের স্বাধীনতার দাবী আরো জোরালো হবে। সে দাবী কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। স্বাধীনতা আপনি আসবে।"

এবার স্বপনদা মুখ খোলেন। "তার মানে স্বাধীনতার জন্যে আর কখনো সংগ্রাম করতে হবে না। বিনা শর্তে যুদ্ধে যোগদানের ফলে বিনা শর্তে স্বাধীনতালাভ। কিন্তু, মুকুল, দেশের লোক যে ইংরেজদের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে পারছে না। গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাটাকেই অভিশপ্ত ও পতনোন্মুখ ভাবছে। তা নইলে এঁরাই বা ইউরোপ ছেড়ে ভারতে বনবাস করতেন কেন? আমরা যারা ইউরোপের গুণমুগ্ধ তারা পড়ে গেছি বিষম সঙ্কটে। এ সঙ্কট কায়িক নয়, মানসিক। ইংরেজরা লড়ছে স্বাধীনতার ইস্যুতে, গণতন্ত্রের ইস্যুতে। আমরা যদি তাদের পক্ষে অস্ত্র ধরি ও প্রাণপাত করি তবে সেটাও স্বাধীনতার ইস্যুতে, গণতন্ত্রের ইস্যুতে। কিন্তু ইংরেজের পক্ষে যেটা সত্যিকার আমাদের পক্ষে সেটা অভিনয়। গান্ধী, সুভাষ, জবাহরলাল অভিনেতা নন, দেশনেতা। দেশের লোক এঁদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। দেশবাসীর কাছে এঁরা সত্যবদ্ধ। কেমন করে এঁরা সত্যভঙ্গ করবেন? আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের অন্তরে অন্তরে একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে, যদিও এত ভালোবাসি ওদের সাহিত্য, ওদের আইন, ওদের পার্লামেণ্টারি সীস্টেম। নিয়তি! আমাদের নিয়তি!"

॥ বাইশ ॥

এর পরে কখন একসময় অনুরাগীদের অনুরোধে গানের আসর বসে। মুকুলদার সঙ্গে যোগ দেন তাঁর প্রিয় শিষ্যা মাধুরী। ভিড় বাড়তে বাড়তে ঘর ভরে যায়। বারান্দায় উপচে পড়ে। "এ যে দেখছি অভিমন্যুর ব্যূহ।" মানস কানে কানে বলে স্বপনদার। "চল, পালাই " স্বপনদার উত্তর। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান।

"এটা আমি শিখেছি গ্যেটের কাছ থেকে।" স্বপনদা বলেন। "যখনি মনে হবে তুমি অবরুদ্ধ তখনি সাত পাঁচ না ভেবে দৌড় দেবে। প্রেমিকাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ফ্লাইট। তোমার মূলমন্ত্র হবে ফ্লাইট।"

"তোমার বয়সে ওঁকেও সংসার পেতে বসতে হয়। যদিও বিবাহসূত্রে নয়। পরে পুত্রকলত্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিয়ের মন্ত্রও পড়েন। ফ্লাইট তোমার জীবনে যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটু গুছিয়ে বসলে গ্যেটের মতো তুমিও সৃষ্টির কাজে মগ্ন হতে পারবে।' মানস মন্ত্রণা দেয়।

"দ্যাখ, মানু। এটা ইউরোপ নয়। আগে একসঙ্গে বসবাস, বনিবনা হলে তার পরে বিয়ে, ওদেশে ওটা জলচল। এদেশে নজির থাকলে না হয় ভেবে দেখা যেত। চোখ বুজে বিয়ে করলুম, তার পরে দেখলুম বনিবনা হচ্ছে না, তখন কোথায় তোমার মুক্তি? কোথায় তোমার শান্তি?" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

"বিবাহের বেলাও নিয়ম হচ্ছে, নো রিস্ক নো গেন। তোমাকেও রিস্ক নিতে হবে। গেন যদি না হয় তবে ডিভোর্সের কথা ভাবা যাবে। সমাজ তো অনেকটা উদার হয়েছে।" মানস প্রবোধ দেয়।

"ছাই উদার হয়েছে! হিন্দু আইনে এখনো ওটা নিষেধ। আর ব্রাহ্মরাও তেমনি পিউরিটান। চরিত্রদোষ দেখাতে না পারলে তো ডিভোর্স হয় না। আমার উনি

যদি নির্দোষ হন আমি কোন্ মুখে ডিভোর্স চাইব? তা হলে আমাকেই দোষী হতে হয়। অন্তত দোষী সাজতে হয়। তা হলেও কি উনি আমাকে ত্যাগ করতে রাজী হবেন? বিলেতে ওরা নিজেদের মধ্যে চক্রান্ত করে। দোষী না হয়েও স্বামী কলঙ্ক মাথায় নেয়। স্ত্রী মুক্তিপণ আদায় করে। দু'জনেই আবার সংসার পাতে। যদি সাথী জোটে। স্ত্রীর পক্ষে সেটা তেমন সহজ নয়। ছেলেমেয়ে হয়ে থাকলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও ঝামেলা। না, মানু, আমি কখনো আমার ছেলেমেয়েদের হাতছাড়া করব না।" স্বপনদার দুর্জয় পণ।

মানসের মনটা উদাস হয়ে যায়। সেও কি পারবে তার ছেলেমেয়েদের হাতছাড়া করতে? কিন্তু দূর হোক সে চিন্তা! বিয়ে তার সুখেরই হয়েছে। কেউ কাউকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারে না। এই যে দু'দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে মানস এর মধ্যেই ফিরে যাবার জন্যে পিছুটান শুরু হয়েছে।

"ও প্রসঙ্গ থাক।" স্বপনদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "মুকুলের বিশ্বাস ধর্মের প্রেরণা থেকেই মহৎ আর্টের উদ্ভব। সেইজন্যে সে পণ্ডিচেরী গিয়ে শ্রী অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তবে বিরজা হোম করে সন্ন্যাসী হয়নি। মুকুল সাধু নয়, সাধক। আর তার বন্ধু কৃষ্ণপ্রাণ সাধক তথা সাধু। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না যে ধর্মের সাধক হলেই সঙ্গীতের সাধনাতেও মহত্তর সিদ্ধিলাভ ঘটে। কই, বেঠোভেনের জীবনে ধর্মের প্রভাব কোথায়? মানছি, সেটা ছিল বাখ্-এর জীবনে। অনেকের মতে তিনি বেঠোভেনের চেয়েও বড়ো। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালে মহৎ সৃষ্টি যাঁরা করেছেন তাঁদের কেই বা ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত? আমার কাছে একরাশ রেকর্ড আছে। শুনবে?"

"জুলিদের ওখান থেকে ফিরে এসে শোনা যাবে রাত্রে।" মানস কথা দেয়।

ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনসের পেছনের সারির একটি বাংলায় থাকেন সকন্যক মিসেস সিন্‌হা ও তাঁর এক সম্পর্কীয়া দিদি মিসেস নন্দী। জুলির মা ও মাসিমা। জুলির বাবার সম্পত্তি। রাতের বেলাটা জুলিকে এইখানেই পাওয়া যায়। দিনের বেলা সে নিখোঁজ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা স্বপন আর মানস সেখানে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা পায়। জুলি তখনো বাড়ী ফেরেনি। তার মা ও মাসিমা ওদের দু'জনকে দু'পাশে বসিয়ে কুশলপ্রশ্ন করেন ও বেয়ারাকে ডেকে পানীয়ের ফরমাস দেন। দু'জনেই বিধবা।

"তোমাকে আমার বেশ মনে আছে, মানস। একবার আমাকে তুমি ছাতা ধরে টিউব স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলে। সে কি আজকের কথা! কেটে গেছে বছর

এগারো বারো। দুলাল তখন বেঁচে। আহা, বেচারা দুলাল!" বিনীতা সিন্‌হা রুমালে চোখের জল মোছেন।

"হ্যাঁ, আমারও মনে আছে, মিসেস সিন্‌হা।" মানস স্মরণ করে।

"আবার মিসেস সিন্‌হা কেন? তখন তো মাসিমা বলতে। দুলাল ছিল তোমার প্রাণের বন্ধু। তা হলে তার শাশুড়ী কেমন করে তোমার পর হয়?" অকাট্য যুক্তি।

"এখন মনে পড়ছে, মাসিমা।" মানস শুধরে দেয়।

"কিন্তু তোমাকে তো ওদেশে দেখেছি বলে মনে হয় না, স্বপন। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো?" বিনীতা বিনীতভাবে বলেন।

"না, মিসেস সিন্‌হা। তুমি না বলে আপনি বললেই কষ্ট পাব। আপনার মেজ জামাই আমার দাদার মতো। একসঙ্গে কত মামলায় লড়েছি। কখনো কখনো বিপক্ষেও। আপনি আমার পূজনীয়।" স্বপনদা মিসেস নন্দীর দিকে চেয়ে বলেন, "আপনিও।"

"তা হলে শোন, বাবা স্বপন। তুমি আমাকে মাসিমা বলে ডাকতে পারো। আর আমার শোভনা দিদিকেও। তোমাদের দু'জনকে দেখে আমরা যে কত খুশি হয়েছি তা কি বলবার? কিন্তু তোমাকে কি আমি আগে কোথাও দেখেছি? কবে দেখেছি, বলতে পারো? চেনা চেনা ঠেকছে কেন?" বিনীতা মাসিমা সুধান।

"আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু আপনারা যে সময় বিলেত যান তার আগেই আমি ইউরোপ ছাড়ি। আমার চার বছরের মেয়াদ পার হয়। বেশীর ভাগ সময় থাকতুম কন্টিনেন্টে। মাঝে মাঝে লণ্ডনে গিয়ে টার্ম রাখতুম। তা হলে আপনাকে আমি দেখেছি আরো আগে কিংবা আরো পরে। কিন্তু কোথায় ও কবে?" স্বপনের জিজ্ঞাসা।

"আচ্ছা, তুমিই বিশবছর আগেকার সেই তরুণ চিত্রকর স্বপন নাগ না? ফোর আর্ট'স ক্লাবের বৈঠকে প্রায়ই যোগ দিতে। চেহারা বদলে গেলেও চেনা যায়।" বিনীতা মাসিমা বলেন।

"আপনি যার কথা বলছেন তার নাম গোকুল নাগ। আমরা তো নাগ নই, গুপ্ত। আর আমি তো চিত্রকর নই, সাহিত্যিক।" স্বপনদা শুধরে দেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কী যেন একটা নভেল লিখে খুব নাম করেছিলে। কিন্তু তার পরে তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে। ক্লাবটাও উঠে গেল। এখনো আমি ভুলতে

পারিনি সেই শক্। বুঝলে, দিদি। এরা ক'জন মিলে যে চমৎকার ক্লাবটা গড়ে তুলেছিল তার সুযোগ নিয়ে লীলাখেলা শুরু করে দেয় অন্য কয়েকজন। তারা বয়সে বড়ো! বিবাহিত বিবাহিতা। ছেলেমেয়ের বাপ মা। একদিন শোনা গেল ক্লাবের প্রাণপ্রতিমা সুষি চাটার্জী ও প্রবীণ সদস্য শিবু গোস্বামী ইলোপ করে উধাও। এদের বয়সী কুমার কুমারী হলে কেউ শক্ পেতো না। কিন্তু দু'জনেরই ঘরে বৌ আছে, বর আছে, ছেলেমেয়ে আছে। কী ঘেন্না। এর পরে কি ক্লাব চলতে পারে? সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করে। কার মনে কী আছে কে জানে! তোমার কি সেসব কথা মনে আছে, স্বপন?" জুলির মা সুধান।

"আছে বইকি, মাসিমা। কিন্তু ক্লাবের কল্যাণে কয়েকটি ভালো বিয়েও তো হয়েছিল। যেখানেই কিছু ভালো সেখানেই কিছু মন্দ, এটাই তো দুনিয়ার রীতি। আমাদের ক্লাবও তার ব্যতিক্রম নয়। এ রকম ঘটনা কোথায় না ঘটছে, কবে না ঘটছে? সেকালের সবচেয়ে সুন্দরী যে হেলেন আর সব চেয়ে সুপুরুষ যে পারিস তাঁরাও তো ইলোপ করে উধাও হয়ে যান। তাই নিয়ে বেধে যায় ট্রয়ের যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধ নিয়ে অমর কাব্য ইলিয়াড রচনা করেন হোমার। ওঁরাও ছিলেন বিবাহিতা নারী ও বিবাহিত পুরুষ। ওঁদের বয়স হয়েছিল। সন্তানও ছিল হেলেনের। লোহা টানে চুম্বককে আর চুম্বক টানে লোহাকে। ওটা মেণ্টাল নয়, এক প্রকার এলিমেণ্টাল আকর্ষণ। মানুষ অসহায়।" স্বপনদা ব্যাখ্যা করেন।

"সব চেয়ে সুন্দরী না হোক, সুন্দরী ছিল বটে সুষি। শুধু কি সুন্দরী, ওর মতো শক্তিমতী করুণাময়ী কল্যাণময়ী ক'জন? আর শিবুও ছিল তেমনি শিবতুল্য স্বামী, শুধু সুপুরুষ নয়। সেইজন্যেই ওদের পদস্খলন সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। বিলেতে গিয়ে ওরা নাকি খ্রীষ্টীয় মতে বিয়ে করে। জানিনে কেমন করে দু'জনে ডিভোর্স পায়। শুনেছি ওদের নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরে ফেরার পথ বন্ধ। শিবু নাকি বিলেতেই থেকে গেছে। আর সুষি নাকি মুসৌরিতে না কোথায় হোটেল খুলে বসেছে।" মাসিমা যতদূর জানেন।

তাঁর দিদি এতক্ষণ মুখ খোলেননি। আর চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, "বড়লোকের মেয়ে বলে সুষি ধরাকে সরা জ্ঞান করত। শিবু ছিল শিবের মতোই গরিবের ছেলে। বুটো আভিজাত্যের মোহে পড়ে আপনি মজেছে আর লঙ্কা মজিয়েছে। হি ইজ আ ব্রোকেন ম্যান।"

"তা যদি বলেন, মাসিমা, তো গোস্বামী সাহেবের প্রথম পক্ষ বনেদী জমিদার বংশের কন্যা। আভিজাত্যের মোহ এক্ষেত্রে অবান্তর নয় কি?" মানস প্রতিবাদ

করে। "তার চেয়ে স্বীকার করা ভালো যে গোস্বামী সাহেবের প্রথম বিবাহটারই ব্রেকডাউন ঘটেছিল। তেমনি মিসেস চ্যাটার্জির প্রথম বিবাহটারও। সারাজীবন দুঃখবহন না করে তাঁরা চেয়েছিলেন নতুন সাথীর সঙ্গে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে। এটাও একটা মোহ। নতুন যখন পুরনো হয়ে যায় তখন মোহভঙ্গ ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু কারো কারো বেলা প্রথম বিবাহের ব্যর্থতাটাই দ্বিতীয় বিবাহের সার্থকতার সোপান। এদেশে না হোক ওদেশে তো এসব ঘটনা আকছার ঘটছে। দেখেশুনে মনে হয় নতুন করে জীবন আরম্ভ করার সব চেয়ে বড়ো অন্তরায় প্রথম বিবাহের সন্তান। এটা আরম্ভের সময় খেয়াল থাকে না। পরে একটু একটু করে হুঁশ হয়। তখন অনুশোচনা জন্মায়। আবার সন্তান হলে, আবার জড়িয়ে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। আরো বড়ো দুঃখবহন করতে হয়। বিশেষত নারীকে। আপনি হলে বলতেন, শী ইজ আ ব্রোকেন উওম্যান।"

স্বপনদা কী জানি কেন আহত বোধ করেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয় তিনি বাণবিদ্ধ। বেয়ারা এসে পানীয় পরিবেশন করলে তিনি হুইস্কির গ্লাস টেনে নিয়ে জোরে চুমুক দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যের ফোয়ারা খুলে যায়।

"ওটা একটা শাশ্বত সমস্যা, মানস। ওর থেকে এসেছে সেকালে ইলিয়াড। একালে আনা কারেনিনা।" পারি তো আমিও তেমনি একখানা ক্লাসিক লিখব। যার পরিণতি বেদনাদায়ক। হ্যাঁ, পুরুষের পক্ষেও।" স্বপনদা সংশোধন করেন।

স্বপনদা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢোকে জুলি আর তার দুই কমরেড, বাবলী সেন ও চাঁহু লাহিড়ী। ভালো নাম অপরাজিতা ও প্রণব। পরিচয়পর্ব সারা হলে জুলি বলে, "স্বপনদা, বাবলীর বহুদিনের সাধ তোমার সঙ্গে আলাপ। তোমার জন্যেই ওর আসা।"

"আমার সঙ্গে!" স্বপনদা আশ্চর্য হন। "মহিলাদের কাছ থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকি। আর বিপ্লবীদের কাছ থেকে সহস্রহস্ত দূরে। তবে এমন একদিন ছিল যখন আমার কাহিনীর নায়িকা হবার জন্যে কত মেয়েই না আসাযাওয়া করত। সেই যে ফোর আর্টস ক্লাবের দিন, যার কথা একটু আগে হচ্ছিল মাসিমাদের সঙ্গে।"

তা শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে বাবলী আর জুলি। বাবলী বলে, "তখন মডেলের জন্যে আপনাকে আর কারো দিকে তাকাতে হতো না। ঘরে বসেই পেয়ে যেতেন মডেল। কী মজা!"

"মডেল!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। "না, কাউকে মডেল করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ছবি আঁকার পদ্ধতি অন্যরকম। মডেল সামনে রেখে আমি

আঁকিনে। আপনি ধরে নিতে পারেন যে আমার নায়িকারা অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা। আমি বাস্তববাদী নই, তবে যা আঁকি তা অবাস্তবও নয়।”

“আমার তো মনে হয় সব সত্যি, একটুও কল্পনা নয়। এক একখানা উপন্যাস যেন এক একটা আর্ট গ্যালারি!” বাবলী বলে, “এখন আমি কৈফিয়ৎ দাবী করি, আপনি লেখা বন্ধ করে দিলেন কেন?”

স্বপনদা গলে গিয়ে জবাব দেন, “লেখা তো আমার পেশা নয়, আমার নেশা। পেশার জন্য অন্য কিছু করতে হয়, তার আগে শিখতে হয়। গেলুম বিদেশে ব্যারিস্টারি পড়তে। লেখায় ছেদ পড়ে গেল। ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করলুম। জানো তো, ল ইজ আ জেলাস মিস্ট্রেস। আইন একটি ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। লক্ষ্মী দেবী সরস্বতী দেবীকে সহ্য করবেন না। সরস্বতীই বা সহ্য করবেন কেন? তিনিও তেমনি ঈর্ষাপরায়ণা। একে তো দেবীতে দেবীতে ঈর্ষা, তার উপর মানবীতে মানবীতে। এর জন্যে আপনিও কৈফিয়ৎ দাবী করেন নি, আমিও কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নই। আমি জানি যে আমার কাছে পাঠকরা অনেক প্রত্যাশা করে, কিন্তু এইসব দেবী আর মানবী মিলে আমাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। আর প্র্যাকটিসও যে জমাতে পারলুম তাও নয়। সেখানেও জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমি তো মুখচোরা মানুষ। দাঁড়াতে গেলেই স্টেজ ফ্রাইট। ওই জুনিয়র হয়েই বারো বছর কেটে গেল। আমিই খেটে খুটে ব্রীফ তৈরি করে দিই, লড়াই করেন যখন যিনি সীনিয়র। সিংহের ভাগ তাঁরই পেটে যায়। ছেড়ে দেবার কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু তা হলে আমার পেশা কী হবে? নেশাটাকেই পেশা করতে পারলে এ প্রশ্নের উত্তর মিলে যায়, কিন্তু তাতে অন্তরের সায় নেই। সে কাজে সফল হয়েছিলেন প্রভাত মুখুজ্যে। কিন্তু শরৎ চাটুজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবেন কেন? আমিও কি তাঁর সঙ্গে বা তাঁর সগোত্রদের সঙ্গে পারতুম? আমার গোত্রই আলাদা। আমি সব দিক থেকে হেরে গেছি, ব্যর্থ হয়েছি, বাবলী ভাই।”

বাবলী তা শুনে গদগদ হয়ে বলে, “না, না, আপনি আবার উঠবেন, দাদা। আমরাই আপনাকে টেনে তুলব। আপনার কাছে আমরা একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। আপনিই আমাদের টুর্গেনিভ। আপনিই, একমাত্র আপনিই লিখতে পারেন আর একখানা ‘ভার্জিন সয়েল’। জুলি যা বলে বলুক, বিপ্লবের ঢের দেরি। তার আগে জমি চষতে হবে। অহল্যা জমি। টুর্গেনিভ না হলে, গোর্কি না হলে লেনিন হয় না। টুর্গেনিভের খোঁজ পেয়েছি, কিন্তু গোর্কি নিখোঁজ।”

স্বপনদা অভিভূত। ওদিকে জুলি মানসের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। হঠাৎ

নিজের নাম শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে জানতে চায়, "আমার নামে কী চুকলি কাটছিস্, বাবলী?"

"চুকলি নয়, বলছি তোর মতে বিপ্লবের আর দেরি নেই, আমার মতে ঢেব দেরি। এটা কি ঠিক নয়?" বাবলী সাফাই দেয়।

"দেশটা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসে আছে। যে কোনো দিন লাভাবর্ষণ হতে পারে। তারই নাম বিপ্লব। কী বলিস্, চানু? তুই তো আমাদের থিয়োরিটিসিয়ান।" জুলি চানুকে সালিশ মানে।

চানু চাণক্যের মতো মহাধূর্ত। জুলিকেও চটাবে না, বাবলীকেও না। হিসেব করে কথা বলে। "বিপ্লবের আর দেরি নেই এটাও যেমন ঠিক ওটাও তেমনি ঠিক যে বিপ্লবের সিগনাল আসবে কমরেড স্টালিনের কাছ থেকে কমরেড রজনী পাম দত্তের কাছে, তার পর রজনী পাম দত্তের কাছ থেকে কমরেড ডাঙ্গের কাছে, তার পর কমরেড ডাঙ্গের কাছ থেকে আমাদের কাছে। দিনক্ষণ স্থির করার ভার কমরেড স্টালিনের উপরে! কারণ তিনিই সব চেয়ে অভিজ্ঞ। সব চেয়ে বিচক্ষণ।"

জুলি অধৈর্য হয়ে সুধায়, "কিন্তু সেই দিনটি কবে?"

"যে কোনো দিন। ছ'মাস পরেও হতে পারে ছ'বছর পরেও হতে পারে।" চানু ছেলেটি ঝানু। একবার এর মুখের দিকে তাকায়, একবার ওর মুখের দিকে।

সালিশের রায় শুনে দু'জনেরই চক্ষু স্থির। বাবলী বলে, "ছ'মাস পরে যদি হয় তবে স্বপনদাকে দিয়ে 'ভার্জিন সয়েল' লেখানো যাবে না। কী আফসোস!"

জুলি বলে, "ছ'বছর দেরি হলে গান্ধী বুড়ো কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? বামপন্থীদের উপর দক্ষিণপন্থীরাই টেক্কা দেবে।"

বিনীতা মাসিমা বিনীতভাবে প্রশ্ন করেন, "আগ্নেয়গিরিটা তো ভারতের মাটিতে। লাভাবর্ষণটাও মস্কো থেকে সহস্র যোজন দূরে। তবে সিগনালটা কী করে আসবে কমরেড স্টালিনের কাছ থেকে? তাও বিলেত ঘুরে? ওদেশের ইংরেজরা ওটা ইণ্টারসেপ্ট করবে না?"

বাবলী এর উত্তরে বলে, "সেইজন্যেই বামপন্থীদের কতক এখন সুভাষ বোসের দিকে ঝুঁকছে। কতক এম. এন. রায়ের দিকে। স্টালিন যাদের কাছে অভ্রান্ত তাদের কতক আবার বিলেতের দিকে তাকাতে নারাজ। আমরা কি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই বিলেতের মুখাপেক্ষী? বিপ্লবের ব্যাপারেও? আমাদের মধ্যে যারা সরাসরি মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে চাই তারা বিলেতকে বাদ দিতে চাই।"

"মরণ!" শোভনা মাসিমা মন্তব্য করেন, "বিলেতকে বাদ দিয়ে কিছুই কি

হবার জো আছে এদেশে? রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে সংস্কারকরা সবাই বিলেতমুখো। মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে কবিরা সবাই বিলেতমুখো। স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনও হয় আমেরিকামুখী, নয় বিলেতমুখী। তোমার নরমপন্থী চরমপন্থী সব কটি নেতাই তো বিলেতে পড়াশুনা করেছেন বা বিলেতে গিয়ে স্বরাজের জন্যে তদ্বির করেছেন। বিলেতফের্তা না হলে কেউ আজকাল নৃত্য গীত অভিনয়েও পাত্তা পায় না।"

বাবলী তা শুনে ক্ষুণ্ণ হয়। সাহেব খুন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পাঁচটি বছর জেলখানায় কাটিয়েছে। সেই সুবাদে সে সর্বত্র সমীহ পায়। কিন্তু তা নিয়ে সে গর্ব বোধ করে না। কেউ বন্দনা করলে বলে, "সাহেব বেঁচে গেছে, আমিও বেঁচে গেছি। সাহেব মারা গেলে আমিও মারা যেতুম। তোমরা শহীদ বলে পূজো করতে জানি। কিন্তু আমার জীবনে আরো মহৎ কাজ আছে।"

বাবলীর মুখভাব দেখে জুলি ত্রস্ত হয়ে বলে, "মাসিমা, বাবলী বিলেত যায়নি বলে ওর কি কম খাতির?"

"খাতির যা দেখছিস্ সেটাও ওই সাহেব মারতে যাওয়ার জন্যেই। নেটিভ মারতে গেলে অত খাতির পেতো না।" মাসিমা উত্তর দেন।

বাবলী বেচারির মুখ চুণ। জুলির মা সেটা লক্ষ করে দিদিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বলেন, "আমরা বুড়ীরা যদি এখানে থাকি ওঁরা যুবাবয়সীরা প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে সঙ্কোচ বোধ করবে। চল, দেখি গিয়ে রান্নার কতদূর কী হলো।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়া বদলে যায়। বাবলীকে উৎফুল্ল দেখায়। জুলিও কলরব বাধায়। চান্নুকে নড়েচড়ে বসতে দেখা গেল। ওদের ফুর্তি বেড়ে যায় যখন আরো এক মূর্তির আবির্ভাব হয়। জুলির সন্ধানে সৌম্য চৌধুরীর।

পরিচয়পর্বের পর সৌম্যকে ঘিরে আলোচনা জমে ওঠে। সবাই জানতে চায় গান্ধীজী কী ভাবছেন। কংগ্রেসের ভিতরের খবর কী। বিপ্লবের প্রসঙ্গ তলিয়ে যায়।

সৌম্য যা শুনেছে তার মর্ম, গান্ধীজী বামপন্থীদের কাজকর্মে বাধা দিতে চান না। তারা যা ভালো মনে করে করুক। শুধু কংগ্রেসকে বা তাঁকে না জড়ালেই হলো। তিনি এ যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না, কংগ্রেস যদি করে তবে তাঁকে বাদ দিয়েই করবে। ওরা স্বাধীন, উনিও স্বাধীন। যখন সত্যাগ্রহের লগ্ন আসবে তখন তিনি কারো জন্যে অপেক্ষা করবেন না। একাই এগিয়ে যাবেন।

"কিন্তু সেটা কবে?" সৌম্যদার পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জুলি সুধায়।

"যে কোনো দিন। লগ্নের কোনো ঠিক ঠিকানা আছে নাকি? তবে আমার যতদূর অনুমান সেটা খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয়।" সৌম্যর অনুমান।

"মিলে যাচ্ছে।" চানু খুশি হয়ে বলে, "আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"কিন্তু তোমারটা তো বিপ্লব। ওঁরটা তো সত্যাগ্রহ।" বাবলী একটার সঙ্গে আরেকটার তুলনা করে।

"আর সিগনালটা তো একই উৎস থেকে নয়।" জুলি ছিদ্র ধরে।

"আসুন, সৌম্যবাবু, আমরা হাত মেলাই।" চানু হাত বাড়িয়ে দেয়। "আমাদের উপর নির্দেশ হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে মোর্চা গঠন করে বিপ্লব ঘটানো। অবশ্য আমাদের মধ্যেও কতক লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস গান্ধী ও কংগ্রেস জনগণের কেউ নন, সাম্রাজ্যবাদের বা ধনতন্ত্রবাদের বর্ণচোরা মিত্র। এটাও একপ্রকার গোঁড়ামি। ইংরেজ যতদিন আছে তার বিরুদ্ধে আপনারা ও আমরা একজোট হয়ে লড়ব। তার পরে একসঙ্গে কাজ করা অসম্ভব হলে জোট ভেঙে দেওয়া যাবে।"

সৌম্য হেসে বলে, "প্রস্তাবটা তো ভালোই, কিন্তু আপনাদের যে আবার প্রতি ছ'মাস অন্তর থীসিস পালটে যায়। একদিন হয়তো শুনব ইংরেজ আপনাদের মিতা, কারণ রাশিয়ানরা ইংরেজদের মিতা। আমরা লড়ব একটা মরাল ইস্যুতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধেই আমাদের যুদ্ধ। মিলিটারিজম তো রাশিয়াতেও ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। আর স্টেট ক্যাপিটালিজমও তো আরেক রকম ক্যাপিটালিজম। ভারতের জনগণকে আমরা যে কেবল ইংরেজদের কবল থেকে উদ্ধার করতে চাই তা নয়, যুদ্ধবাজ ও যন্ত্রবাজ স্বদেশীয় প্রভুদের হাত থেকেও।"

স্বপন আর মানস ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠছিল। বাড়ী ফিরে বেঠোভেন শুনতে হবে। কিন্তু কোথায় ডিনারের লক্ষণ! এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দেয় খানা তৈয়ার। ডাইনিং রুমে গিয়ে যে যার নামের কার্ড চিনে নিয়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করে।

টেবিলের দুই মাথায় বিনীতা সিন্‌হা আর শোভনা নন্দী। মিসেস সিন্‌হার বাঁ দিকে স্বপন আর ডান দিকে মানস। মিসেস নন্দীর বাঁ দিকে সৌম্য আর ডান দিকে চানু। স্বপন আর মানসের মাঝখানে বাবলী। সৌম্য আর চানুর মাঝখানে জুলি। সৌম্যর জন্যে নিরামিষ তরকারি ছিল। বিধবারাও নিরামিষ খান। জুলিও তাদের তালিকায় পড়ে। তবে সে কট্টর নিরামিষাশী নয়। পাঁচজনের খাতিরে নিয়মভঙ্গ করে।

জুলি জিজ্ঞাসা করে সৌম্যকে, "ওসব তো বাইরের কথা। ভিতরের কথা কী শুনেছ? যা কোথাও বেরোয়নি।"

"গান্ধীজীর কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই। তাঁর তাসগুলো সকলের সামনে মেলে ধরা। যেটা গোপনীয় সেটা হচ্ছে কংগ্রেস নেতাদের পলি'সি। তাঁরা স্থির করে ফেলেছেন যে দরজা সব সময় খোলা রাখবেন। কোনো অবস্থায় বন্ধ করবেন না। তার মানে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা ভিতরে ভিতরে চলছে ও চলতেই থাকবে। গ্রহণযোগ্য ফরমূলা এখনো পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেই ওঁরা সদলবলে যুদ্ধে ঝাঁপ দেবেন। কারো মানা মানবেন না। মহাত্মারও না। বাপু এখন ভীষণ নিঃসঙ্গ। তাঁর তো আলাদা কোনো দল নেই। ওই কংগ্রেসই তাঁর দল। নতুন একটা দল তৈরি করার মতো বলও নেই, বয়সও নেই। মনে মনে প্রার্থনা করছেন, সবকো সন্মতি দে, ভগবান। বাঘ হরিণ মেরে তার মাংস ফেলে রেখে এসেছে। ফিরে গিয়ে ভূরি ভোজন লাগাবে। অর্থাৎ মন্ত্রীরা খালি রেখে আসা গদীতে বসবেন। সুভাষচন্দ্র তো রাগ করবেনই, কিন্তু গ্রহণযোগ্য একটা ফরমূলা যদি পাওয়া যায় আর মন্ত্রীরা যদি মসনদে ফিরে যান কী করে তিনি তাঁদের তাড়াবেন? কংগ্রেসে তাঁদেরই তো ভোটবল বেশী। আর কংগ্রেস চলে ভোটের জোরে। যুদ্ধে যোগদান-কারীদের গায়ের জোরে হটানো যাবে না। তাঁদের হাতেই অস্ত্রশস্ত্র। কংগ্রেসের ভাঙন অনিবার্য, ইংরেজ যদি তাকে ডেকে নিয়ে কেন্দ্রের শাসন পরিষদে ক্ষমতার সিংহভাগ দেয়। সেক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহ কোনো কাজেই লাগবে না, অথচ খুব কাজে লাগবে জিন্না সাহেবের বিদ্রোহ। গান্ধীজী আশা করছেন যে বড়লাট পেছিয়ে যাবেন। তাঁর কাছে যেটা আশার কথা কংগ্রেস নেতাদের কাছে সেটাই আশঙ্কার কথা। তাঁরা এখন ভাবছেন কী দিয়ে জিন্নাকে তোষণ করা যায়। তাঁর আপ্ত বাক্য হচ্ছে মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র দল। কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগের কলমা না পড়ে তবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলবেন না। আর বড়লাট যদি প্রকারান্তরে স্বীকার না করেন তো বড়লাটের সঙ্গেও না। সবাই ভেবে অবাক হচ্ছে জিন্নার এতখানি তেজ আসে কোন্‌খান থেকে। গান্ধীজী বলেছেন, জিন্না সকলের উপর ডিকটেটরি করবেন, শাসকদের উপরেও। কংগ্রেস তার দরজা খোলা রাখলে কী হবে, লীগ তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে! আর লীগের দরজা বন্ধ মানে বড়লাটের দরজাও বন্ধ।

মানস মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করে, 'তাই যদি হয় তবে যুদ্ধে সকলের সহযোগিতা চাওয়া কেন? কেন্দ্রে রদবদল না হলে কেই বা রাজী হবে সহযোগিতা করতে?"

জুলি চেঁচিয়ে ওঠে, "না একো রুপেয়া, না একো জওয়ান। মরুক ব্যাটারা বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রে।"

ওর মা বাধা দেন। "ও কী বলছিস্, জুলি! কেউ যদি রিপোর্ট করে তোর শ্বশুরের পেনসন বন্ধ হয়ে যাবে।"

"এই, তোমরা কেউ রিপোর্ট করবে নাকি?" জুলি চুপসে যায়।

"ক্ষেপেছিস্? আমরা কেউ কখনো অমন কাজ করতে পারি!" বাবলী অভয় দেয়। চানুও। স্বপনদা ওকে সতর্ক করে দেন। দেওয়ালের কান আছে।

মিসেস সিন্‌হা কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "এ মেয়ে আমাকে পাগল করে ছাড়বে। এরই জন্যে কোন্ দিন না আমাকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে যায়। বিপ্লব, আগ্নেয়গিরি, লাভাবর্ষণ এসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা।"

স্বপনদা তাঁকে আশ্বাস দেন। "ওদের বিপ্লব তো ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এখন বেকার। আবার যেদিন মন্ত্রীরা মসনদে ফিরে যাবেন আবার আগ্নেয়গিরির লাভাবর্ষণ হবে, অবশ্য সমস্তটাই মুখে। ওদিকে জিন্না সাহেবেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ কংগ্রেস মন্ত্রীদের তিনি মসনদে ফিরে যেতে দেবেন না। যেতে দিলে তিনিও অগ্নিবর্ষণ করবেন। তার মানে দেশ জুড়ে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। একদিকে বিপ্লব, আরেকদিকে দাঙ্গা, এ যেন সেই হোমার বর্ণিত সীলা আর ক্যারিবডিস। এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে জাহাজ চালাতে হবে স্বাধীনতার পাইলটকে। কী করে তা সম্ভব তা জানেন একমাত্র গান্ধীজী। কিংবা তিনিও জানেন না। জানে আমাদের নিয়তি। যাকে বলে হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম। মানুষ তো নিমিত্তমাত্র।"

ডিনারের পর সকলের সঙ্গে করমর্দন করে স্বপনদার সঙ্গে মানসেরও বিদায়। সৌম্যও উঠতে যাচ্ছিল, জুলি তাকে উঠতে দেয় না। বাবলীরাও সেবাগ্রামের ভিতরের খবর শুনতে চায়। কিন্তু সৌম্য নিজে জানলে তো? গান্ধীজীর মুখ বন্ধ।

বাড়ী ফিরে গ্রামোফোনে বেঠোভেনের 'এরোইকা' চড়িয়ে স্বপনদা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে শোনেন। তার পর বলেন, "তুমি বোধ হয় জানো না যে এই হীরোর নাম নেপোলিয়ন। তখনো তিনি সম্রাট হননি, অথচ দিগ্বিজয়ী। বেঠোভেনের মনে হয়েছিল তিনি শুধু ফরাসী বিপ্লবের নয় বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের বীর। সুতরাং সকলের শ্রদ্ধেয়। পরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তাই বলে তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রত্যাহার করেন না বা তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন না। একবার যেটা সৃষ্ট হয়েছে সেটা বরাবরের জন্যে

সৃষ্ট হয়েছে। নেপোলেয়িনের সাম্রাজ্য হাওয়ার সঙ্গে উড়ে গেছে, কিন্তু 'এরোইকা'র সমাদর এখন জগৎ জুড়ে। ধর্মের পরে আর্টই চিরজীবী।"

তন্ময় হয়ে শোনে মানস। বলে "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মতো এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও একদিন হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে। কিন্তু কোথায় আমাদের বেঠোভেন, কোথায় তাঁর 'এরোইকা'! আমাদের এই দুই শতাব্দীর কোন্ সৃষ্টি আজি হতে শতবর্ষ পরে দেশ বিদেশের মানুষের অন্তরে এমনি দোলা দেবে!"

প্রশ্নটা স্বপনদাকেও ভাবিয়ে দেয়। তিনি বলেন, "বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান ও কবিতা। হয়তো শ্রী অরবিন্দের 'সাবিত্রী'।"

" তা হলে তুমিই তোমার আর-সব কাজ ছেড়ে 'এরোইকা'র সঙ্গে তুলনীয় কিছু সৃষ্টি করো, স্বপনদা।" প্রস্তাব করে মানস।

স্বপনদা চমকে ওঠেন। "আমি! আমি কি বেঠোভেনের সঙ্গে তুলনীয়! তবে আমারও একটা মহৎ কল্পনা ছিল, এখনো আছে, রূপ দিতে পারলে ক্লাসিক পর্যায়ে ঠাঁই পেতো। কিন্তু বকুল কি আমাকে লিখতে দেবে! সে এখন পরের ঘরণী। পূর্ব প্রেমের উপাখ্যান তাকে বিষম বিব্রত করবে। সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষার ভয়ে সে অস্থির। ভয়টা অমূলক নয়। যা সমাজ আমাদের! আমার আশা ছেড়ে দাও, মানু। আমি ফেল। পারো তো তুমিই একখানা ক্লাসিক লেখো।"

"আমি!" মানস অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "আমার কাছে প্রথম কথা হচ্ছে ঠিকমতো বাঁচা। তার পরের কথা ঠিকমতো লেখা। জীবন ঠিক না হলে আর্ট ঠিক হবে কী করে!"

"ওখানেই তোমার ভুল। আর্ট হচ্ছে পঙ্কজ। দান্তে, গ্যেটে, টলস্টয়, টুর্গেনিভ কারই বা জীবন অকলঙ্ক চন্দ্র! অথচ জ্যোৎস্না তো ফিনিক ফুটেছে।" স্বপনদা বলেন।

॥ তেইশ ॥

দুই বন্ধুর নৈশ সংলাপ গভীর থেকে গভীরতর ও গাঢ় থেকে গাঢ়তর স্তরে পৌছয়। ওদিকে রাত্রিও গভীরতর ও অন্ধকারও গাঢতর হয়।

"তোমাকে কেমন করে বোঝাব, স্বপনদা, আমার কী যন্ত্রণা, কী বিষাদ! বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কত বড়ো বড়ো ঘটনার অভিনয় চলছে, আমি শুধু নীরব দর্শক। আমাকে সমস্তক্ষণ দগ্ধ করছে আমার এই অসহায় দশা, এই ইম্‌পোটেন্স। আমার বিয়ে সুখের হয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু আমরা দু'জনে সুখী হলে কী হবে কোটি কোটি মানুষ এই যুদ্ধের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবে। তাদের পারিবারিক সুখ নষ্ট হবে। কোন্ অধিকারে আমরা সুখী হব? আমি তো মনে মনে অপরাধী বোধ করছি।" মানস এলিয়ে পড়ে।

"একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।" স্বপনদা কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেন, "নাও, খাও দাও ফুর্তি করো। আজ বাদে কাল কী হবে তার ঠিক নেই, যুদ্ধ যে কতদূর গড়াবে তার স্থিরতা কী? এই কলকাতা শহরই যুদ্ধের অঙ্গন হতে পারে আর আমিও এয়ার রেডের শিকার হতে পারি। নীরব দর্শক না হয়ে সরব অংশীদার হয়েই বা আমার সার্থকতা কী? পারব কি আমি আগুন নেবাতে? আমিও হব আর-একটি পতঙ্গ। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কত বড়ো বড়ো ঘটনার অভিনয় হচ্ছে সেটা দর্শন করাও তো একটা করণীয় কর্ম। দর্শন না করলে ব্যাস কখনো মহাভারত রচনা করতে পারতেন না। বাল্মীকি কখনো রামায়ণ রচনা করতে পারতেন না। বেশীর ভাগ কল্পনা হলেও খানিকটা তো সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা।"

"তা হলে আমাদের ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট হয়ে ফ্রণ্টে যেতে হয়, স্বপনদা। আমাদের ভূমিকা সঞ্জয়ের ভূমিকা।" মানস বলে।

"ফ্রন্ট কি একটা? ফ্রন্ট ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পৃথিবী জুড়বে। একদিন এই বাংলাদেশেই হবে অন্যতম ফ্রন্ট। যদি না যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। অসম্ভব নয়। একপক্ষ আত্মসমর্পণ করলেই যুদ্ধ থেমে যাবে।" স্বপনদা স্বপ্ন দেখেন।

"অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভবপরও নয়।" মানস বলে। "জার্মানরা সেবার আত্মসমর্পণ করেছিল সৈনিকদের খোরাকের অভাবে। এবার যাতে খোরাকে টান না পড়ে তার জন্যে তারা প্রথমেই দখল করে নিচ্ছে পোলাণ্ড। তার অসামান্য শস্য-ভাণ্ডার। একদিন না একদিন উক্রাইন আক্রমণ করবে। দখল করতে পারলে অফুরন্ত শস্যভাণ্ডার। হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া এরাও শস্য জোগাবে, যদি পদানত হয়। এবারকার যুদ্ধ সেবারকার মতো খোরাকের অভাবে থামবে না, স্বপনদা। নাৎসীরা যেমন নিষ্ঠুর, ওরা নাকি সৈনিকদের জন্যে খোরাক বাঁচাবে অসুস্থ ও রুগ্‌ণ মানুষদের বাঁচাতে না দিয়ে। তার পরের ধাপটা ইহুদী ও জিপ্‌সী জাতির বিনাশ। তারও পরের ধাপ স্লাভ জাতির নিকাশ। ওদের ওই সর্বনেশে জাতিতত্ত্ব বিংশ শতাব্দীতে অভাবনীয়। ওদের নিরস্ত করতে হলে পরাস্ত করতেই হবে, কারণ ওরা আত্মসমর্পণ করবে না বলে বদ্ধপরিকর।"

স্বপনদা স্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। যুদ্ধে হেরে যাবার গ্লানি ওরা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায়নি। রাতকে ওরা দিনে পরিণত করবে। হারকে জিতে পরিণত করবে। ওই ম্যাণ্ডেট নিয়েই হিটলার নেতৃত্বে নাৎসীরা এসেছে। কেবল ইংরেজ ও ফরাসীদের উপর জিতলে চলবে না, রাশিয়ানদের উপরেও জিততে হবে। তা না হলে ওদের জয় অসপত্ন হবে না। তার পরে আমেরিকার উপরেও জিততে হবে। নইলে জয় অসমাপ্ত থেকে যাবে। নেপোলিয়নের পরে হিটলারের মতো উচ্চাভিলাষী আর জন্মায়নি। কিন্তু নেপোলিয়নের পেছনে ছিল ফরাসী বিপ্লবের বিরাট পটভূমিকা। বিপ্লবের সার্বজনীন বাণী। নেপোলিয়ন নিজেও ফরাসী ছিলেন না। আর এই হিটলার জার্মান ভিন্ন আর কারো প্রাণে আশার সঞ্চার করেন না। এঁর যে বাণী তা বিপ্লবের নয় প্রতিবিপ্লবের। তুমি তো জানো জার্মানদের প্রতি আমার কী পরিমাণ ভালোবাসা। তা বলে কি আমি ফরাসীদের কিছু কম ভালোবাসি? আমার দেশকে স্বাধীন হতে, সমান হতে দিচ্ছে না বলে ইংরেজদের উপর রাগ থাকলেও অনুরাগ কিছুমাত্র কম নয়। এ যুদ্ধে ওদের হার হোক এটা আমি চাইনে। তা হলে দাঁড়ায় এই যে আমি এবারকার যুদ্ধে নিরপেক্ষ। তবে ইংরেজরা যদি বিনা শর্তে আমার দেশকে স্বাধীনতা দেয় আমিও নেহরুর মতো মিত্রপক্ষে যোগ দেব। কিন্তু জার্মান জাতিকে আমি লাঞ্ছিত হতে বা তাদের দেশকে বিধ্বস্ত হতে দেব না।

এবারকার সন্ধিটা সেবারকার মতো অন্যায় সন্ধি হলে আমি বাধা দেব। অর্থাৎ ভারত বাধা দেবে।"

মানস প্রীত হয়ে বলে, "তোমার সব কথা আমার না হলেও মোটের উপর আমারও সেই কথা। জার্মানদের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়ে দিতে হবে, যাতে ওরা তৃতীয়বার যুদ্ধ বাধাতে না চায়। কিন্তু সেটা বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। হিটলার যাদের সর্বনাশ করবে তারা তার প্রতিশোধ নেবে গোটা জার্মান জাতিরই উপর। যদি না গোটা জার্মান জাতিই সময় থাকতে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। আর তার নাৎসীদের চরম শাস্তি দেয়। জার্মান জাতির সহানুভূতি না থাকলে কি ওরা পরের সর্বনাশ করতে পারে! দণ্ড যখন আসবে তখন জার্মানীর উপরেই আসবে। এটা কি ওরা বোঝে না? তবে এ দুর্মতি কেন?"

স্বপনদার সেই বাঁধা উত্তর। "হিস্টরিকাল ডিটারমিনিজম। ঐতিহাসিক নিয়তি। জার্মানীতে যত জ্ঞানীগুণী আছেন তত আর কোন্ দেশে? বিবেকী পুরুষেরও অভাব নেই। ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে। যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এক অপ্রতিরোধ্য নিয়তি জার্মানদের জ্ঞানীগুণী বিবেকীদেরও এই বলে ভুলিয়েছে যে হিটলার তো জার্মান ভিন্ন আর কারো দেশ আত্মসাৎ করার কথা বলছেন না। সারল্যাণ্ড জার্মানীর একাংশ, অস্ট্রিয়াও জার্মানীর একাংশ, বোহেমিয়ার জার্মানভাষী অঞ্চলও জার্মানীর একাংশ, পোলাণ্ডের একাংশও জার্মানভাষী। তাঁদের ধারণা হিটলার ওখানেই দাঁড়ি টানবে। সেটা নিয়তিকে চোখ ঠারা। হিটলার এখন বাঁচবার মতো জায়গার ধুয়ো ধরেছেন। আর জায়গা না পেলে নাকি জার্মান জাতি বাঁচবে না। তা হলে যাদের জায়গা কেড়ে নেবেন তারা কি বাঁচবে? তাদের অপরাধ তারা জার্মান নয়। জার্মানীর জ্ঞানীগুণীরা বিবেকীরা চেঁচিয়ে বলছেন না যে এটা তাদের প্রতি অন্যায়। এই ইস্যুতে তারা জেলে যেতে পারতেন। অসিয়েটস্কি ছাড়া আর কেউ জেলে গেছেন বলে শোনা যায় না। তিনি তো জেলেই দেহরক্ষা করেছেন। নিয়তি! নিয়তি! নিয়তিই জার্মানদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কুরুক্ষেত্র অভিমুখে। তাদের প্রতিবেশীদেরও। কেন এরকম হলো? আমার মনে হয় সারা ইউরোপটাই টোমাস মানের "ম্যাজিক মাউন্টেনে'র সেই স্যানিটারিয়াম। যেখানে সকলেই অসুস্থ। অথচ সকলেই চালাক চতুর, ভোগসুখে রত। সভ্যতাই যেন একটা ব্যাধি। ইউরোপ সভ্যতার ব্যাধিতে ভুগছে, ডেথ উইশ কাজ করছে। যুদ্ধই ইউরোপের নিয়তি। যুদ্ধের করোলারি বিপ্লব। বিপ্লবও তার নিয়তি। যদিও তৎক্ষণাৎ নয়।"

এর পরে যে যার ঘরে শুতে যায়।

মানসের পুরাতন সতীর্থ বিজন বর্ধন সাত ঘাটের জল খেয়ে কলকাতায় বদলী হয়েছে। সে এখন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়াটে কোন্ একটা ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। তার বাসগৃহ পায়ে হেঁটে গেলে দশ মিনিটের পথ। মানস পরের দিন স্বপনদাকে একা রেখে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয় আধ ঘণ্টার জন্যে। বিজনকে একটা চমক দেয়। সে তখন ড্রেসিং গাউন পরে তার বাসগৃহের লন্‌এ পায়চারী করছে। সেটাই তার একমাত্র ব্যায়াম। মানসকে দেখে ছুটে এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানি দেয়।

"কবে এলে? কই, আমাকে তো খবর দাওনি? কোথায় উঠেছ? কী উপলক্ষে আসা? যূথিকাকেও সঙ্গে এনেছ নাকি? তোমার তো এখন বদলীর কথা নয়। কে যেন বলছিল তুমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছ। পাগল!" এক নিঃশ্বাসে বলে যায় বিজন আর মানসকে ধরে যায় নিয়ে ড্রয়িং রুমে। মানস উত্তর দিতে দিতে যায়।

একটু পরে গৃহকর্ত্রী উদিতার উদয়। যথারীতি চায়ের আয়োজন। পারিবারিক কুশলপ্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন। ওরা ওদের একমাত্র সন্তান সুজনকে দার্জিলিং এর সেণ্ট পল্‌সে ভর্তি করে দিয়ে এখন ঝাড়া হাত পা। যেখানে খুশি যতবার খুশি বদলী করুক সরকার। ওরা সবসময় তৈরি।

ওদের বিয়েতে মানসেরও একটা ভূমিকা ছিল। কনে দেখার জন্যে জহুরী হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যান বিজনের বাবা বর্ধন মশায়। মানস প্রশংসা করে। কর্তা নাকি ইতিমধ্যে তিনশোটি মেয়ে দেখে নাকচ করেছিলেন।

ওদিকে মানসের বিয়েতেও বিজনের একটা ভূমিকা ছিল। বিয়ের আগে ততটা নয়, পরে যতটা। দুই বন্ধুর যৌথ গৃহস্থালীর ভার বিজন যূথিকাকেই ছেড়ে দেয়। আর নিজের বিয়ের তারিখ ছ'মাস এগিয়ে দিতে তৎপর হয়।

এইসব পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর হাসাহাসি করতে করতে আধঘণ্টা কেটে যায়। তখন বিজন তার ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী বার করতে হুকুম দেয়।

কথায় কথায় ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের প্রসঙ্গ ওঠে। বিজন বলে "এখানকার ইউরোপীয়ানদের সকলের ধারণা এই যুদ্ধে গান্ধীজী একজন ডিফিটিস্ট। তিনি নাকি প্রকাশ্যেই সন্দেহ ব্যক্ত করছেন যে এযাত্রা ইংরেজদের জয় অনিশ্চিত। এমন লোকের সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে শাসকদের আন্তরিক আপত্তি। তবে গান্ধীজীর উপর আস্থা

না থাকলেও কংগ্রেস নেতাদের উপরে তাঁদের ভরসা আছে। তাঁরা সহযোগিতায় রাজী, যদি সরকার তাঁদের শর্ত অনুসারে পুনর্গঠিত হয়। এটা একটা নেগোশিয়েবল ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তাঁদের উপরে মিস্টার গ্যাণ্ডার অপরিসীম প্রভাব। তাঁরা কি তাঁর মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন? ইতিমধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পাইকারী পদত্যাগ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের সম্ভাবনার পথে কাঁটা দিয়েছেন। প্রদেশগুলিতে যদি কোয়ালিশন না হয় তবে কেন্দ্রে কোয়ালিশন হবে কী করে? একই দল কি কেন্দ্রে শাসক পক্ষ হবে, প্রদেশে বিরোধী পক্ষ হবে? কিংবা প্রদেশে শাসক পক্ষ, কেন্দ্রে বিরোধী পক্ষ? যুদ্ধকালে এই গণ্ডগোল ডেকে আনার চেয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই শ্রেয় নয় কি? গান্ধীজী তাঁর মুঠো আলগা করলেও জিন্না সাহেব নাছোড়বান্দা।"

মানস স্বীকার করে। তাঁর মন্তব্য শুধু এই যে, "লণ্ডনের নিউ স্টেটসম্যানের মতে গান্ধীজী একজন রেভোলিউশনারি ডিফিটিস্ট। যেমন ছিলেন লেনিন। গত মহাযুদ্ধে। ভারতেও তেমনি কিছু ঘটতে পারে, সম্রাট যদি যুদ্ধে হেরে যান।"

মানসকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে তার সঙ্গে এক বাক্স খাবার দেয় উদিতা। বলে, "দীপক আর মণির জন্যে তাদের মাসিমার স্নেহের নিদর্শন।"

"স্বজনকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো", বলে মানস বিদায় নেয়।

স্বপনদা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মানসকে দেখে বলেন, "এই তোমার আধ ঘণ্টা! জানি ওরা চা না খাইয়ে ছাড়বে না। এখন ব্রেকফাস্টের জন্যে সবুর করতে হবে। নতুন কথা কী শুনে এলে বর্ধনের ওখানে?"

"গান্ধীজী এই যুদ্ধে ডিফিটিস্ট বলে সরকার ওঁর সঙ্গে নেগোশিয়েট করবে না। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে করবে, যদি ওঁরা গান্ধীজীর মুঠো থেকে বেরোন। তার মানে নদীর মাঝখানে ঘোড়া বদল করেন।" মানস ব্যাখ্যা করে।

"প্রশ্নটা হচ্ছে কে কার পেছনে ধাওয়া করবে। বড়লাট গান্ধীজীর পেছনে না গান্ধীজী বড়লাটের পেছনে। যুদ্ধে সহযোগিতাটা কার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সরকারের পক্ষে না গান্ধীজীর পক্ষে। আমি শুনেছি যে গান্ধীজীর শিবির থেকে কংগ্রেস নেতাদের ভাঙিয়ে নেবার একটা চেষ্টা চলেছে। কয়েকজন বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী জুটেছেন, তাঁরাই এ ব্যাপারে সচেষ্ট। বৃথা চেষ্টা। গান্ধী ওঁদের উপর নির্ভর করেন না, ওঁরাই করেন গান্ধীর উপর নির্ভর। কংগ্রেস নেতারা কখনো গান্ধীজীকে অমান্য করবেন না, যদিও ক্ষমতার জন্যে ছটফট করবেন। যুদ্ধ একটা ছেলেখেলা নয়। ভারত যদি এতে জড়িয়ে পড়ে তা হলে মানুষের দুঃখকষ্ট বেড়ে

যাবেই। অভিশাপটা পড়বে নেতাদের উপরে, যদি তাঁরা ক্ষমতার ভাগী হন। আবার উল্টো দিক থেকেও বিচার করতে হবে। ভারত যদি সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য না করে ইংরেজ একা লড়তে পারবে না। গুর্খা শিখ আর পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য তার চাইই চাই। কিন্তু এদের সাহায্য পেতে হলে কংগ্রেসকে ক্ষমতার ভাগ না দিলেও চলে। গান্ধীজীর তো এদের সঙ্গে যোগাযোগই নেই। কেন তা হলে সরকার কংগ্রেসের পেছনে বা গান্ধীজীর পেছনে ধাওয়া করবে?" এই পর্যন্ত বলে স্বপনদা আবার কী মনে করে বলেন, "তবে হ্যাঁ, লড়াই যদি চার পাঁচবছর গড়ায় তবে দেশের লোক খেতে পরতে পাবে না, তখন দেশের নেতাদের ডাক পড়বে দায়িত্বের ভাগ নিতে। বড়লাট ধাওয়া করবেন নেতাদের পেছনে। গান্ধীজীব পেছনে। অপেক্ষা করতে গান্ধীজী প্রস্তুত। কিন্তু নেতারা প্রস্তুত নন! এঁদের মুখ চেয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ করতেই হবে তাঁকে। জানিনে কবে ও কী আকারে।"

"ব্যাপক আকারে নিশ্চয়ই।" মানস ধরে নেয়।

"ব্যাপক আকারে করলে কি বেশী লোক সাড়া দেবে? এই যে বাংলাদেশ এর অর্ধেক লোক তো মুসলমান। তাদের একজনও কি কংগ্রেসী আন্দোলনে ঝাঁপ দেবে? বাকী অর্ধেক লোক যদিও হিন্দু তাদের অধিকাংশই এখন গান্ধীবিমুখ, সুভাষ অভিমুখ। অহিংসার উপরে তাদের লেশমাত্র বিশ্বাস নেই। গান্ধীজীব আন্দোলনের আড়ালে ওরা হিংসাত্মক কাণ্ড কারখানা করে যাবে। ফলে সরকার হবে আরো নিষ্ঠুর। যুদ্ধকালে কেউ দয়ামায়া দেখায় না। কোর্ট মার্শাল করে ঝুলিয়ে দেয়। এর দায়িত্ব কি গান্ধীজীর উপরেও অর্শাবে না? একই কথা খাটে পাঞ্জাব সম্বন্ধেও। সেখানেও অর্ধেক মুসলমান। কেউ ঝাঁপ দেবে না। অর্ধেক হিন্দু-শিখ। অধিকাংশই অহিংসাবিমুখ। মার্শাল রেস বলেই তাদেব গর্ব। বাকী থাকে সিন্ধু প্রদেশ। সেখানে মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুর জান অতিষ্ঠ। আন্দোলনটা মাঠে মারা যাবে।" স্বপনদা আফসোস করে বলেন, "সেই যে একটা কথা আছে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। গান্ধীজীর দশা হয়েছে তাই। বিশবছর আগে তাঁর যে অথরিটি ছিল, এমন কী দশবছর আগেও যে অথিরিটি ছিল, সে অথরিটি আজ নেই। তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। আগে তাঁকে তাঁর অথরিটি পুনরুদ্ধার করতে হবে। তার পরে ব্যাপক আন্দোলন।" স্বপনদার অনুমান।

ব্রেকফাস্টের মাঝখানে আচমকা দুই কন্যার আবির্ভাব। জুলী আর বাবলী। স্বপনদা শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "চা না কফি? পরিজ না ফোর্স? অমলেট না পোচ? না, বেকন আমার এখানে চলে না। আমার মুসলমান বাবুর্চির শুচিবাতিক আমাকে মানতে হয়।"

"আমরা কিন্তু খেতে আসিনি, স্বপনদা।" জুলি তাঁর একপাশে বসে, বাবলী তাঁর অপর পাশে। আমাদের অনুরোধ—আবদারও বলতে পারো—ছোটবোনদের আবদার—তোমাকে টুর্গেনিভের মতো আর একখানা 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে হবে। তুমি 'না' বলতে পারবে না। এটা তোমার ঐতিহাসিক দায়িত্ব।" জুলির অনুনয়।

স্বপনদা মানসের দিকে তাকিয়ে কপট ভয়ে বলেন, "তুমি তো জজ না ম্যাজিস্ট্রেট। তুমি আমাকে এই দুই বিপ্লবী নায়িকার হাত থেকে উদ্ধার করো।"

"আমিও তো ওদেরি পক্ষে। তোমাকে দিয়ে জোর করে না লেখালে তুমি কি কোনো কালে লিখবে?" মানস জুলিকে ও বাবলীকে উস্কে দেয়।

"আপনার উপর আমরা জোর জুলুম করব না, দাদা। আপনি আপনার খুশিমতো লিখবেন। আমরা যদি জেলের বাইরে থাকি মাঝে মাঝে আপনাকে তাগাদা দেব। কী লিখলেন, কতখানি লিখলেন চেয়ে নিয়ে দেখব।" বাবলী বলে মিষ্টি করে।

"এই দুটি নাবালিকা কিশোরীকে নিয়ে উপন্যাস জমানো যায় না। এদের নিয়ে বড়জোর রূপকথা লেখা যায়!" স্বপনদা বলেন মানসকে। "এই যে জুলি, এর নাম মিস ক্যারামেল। আর এই যে বাবলী এর নাম মিস চকোলেট। এদের দু'জনের অ্যাডভেঞ্চার লিখলে সেটাও একটা অমর কীর্তি হবে। যেমন 'অ্যালিস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা যারা হবে তাদের জীবনে চাই আরো বেশী ম্যাচিওরিটি। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স না হলে, দু'তিনবার প্রেমে না পড়লে বা বিবাহের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে না গেলে তাদের নিয়ে যা লেখা হয় তা নেহাৎ পান্‌সে বা প্যানপ্যানে। তার জন্যে আমাকে কলম ধরতে হবে কেন? দেশে কি কলমগীরের অভাব? না উপন্যাসের অভাব?"

বাবলী আর জুলি প্রথমটা খুশি হয় নাবালিকা কিশোরী কমপ্লিমেণ্ট পেয়ে। পরে রেগে যায় প্রেমের ও বিবাহের উল্লেখ শুনে। তার পর প্রকৃতিস্থ হয়।

"আমরা কি বলেছি যে আমাদের নিয়েই নভেল লিখতে হবে?" বাবলী তর্ক করে। "আমাদের বাদ দিলেই আমরা কৃতার্থ হব, দাদা। কিন্তু 'ভার্জিন সয়েলে'র বৈশিষ্ট্য হলো বিপ্লব শুধু পুরুষদের ব্যাপার নয়। নারীরও তাতে সক্রিয় ভূমিকা। আর নারীর উপর টুর্গেনিভের যত দরদ তত তাঁর আগে আর কারো নয়। অনেকটা আপনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সেইজন্যেই তো আপনার উপর পক্ষপাত।"

স্বপনদা আপ্যায়িত হয়ে বলেন, "পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। অ্যাঁ! আমি অবাক হচ্ছি হে, মানু, কী করে এরা আমাকে খুঁজে বার

করল। কেমন করে এরা টের পেলো যে আমার জীবনেও একজন মাদাম ভিয়ার্দো আছেন, যাঁর জন্যে আমিও আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি, বিনা প্রতিদানে। হ্যাঁ, তিনিও দেশবিখ্যাত গায়িকা। ইতিহাস একদিন বলবে যে তিনি গানের জগতে যত বড়ো আমি সাহিত্যের জগতে তার চেয়েও বড়ো। তা না হলে আমাকে বিয়ে না করে তিনি আরেকজনকে বিয়ে করলেন কেন? টুর্গেনিভের সঙ্গে মিল আমার ওইপর্যন্তই। ওর বেশী নয়। তাঁর মতো আমার কোনোও অবিবাহিতা পত্নী বা প্রাকৃতিক কন্যা নেই।"

হঠাৎ যেন বোমার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে বাবলী আর জুলি। মুখদুটি ফ্যাকাসে দেখায়। লক্ষ করে মানসও তটস্থ।

মেয়েরা চুপ মেরে যায়। স্বপনদা মৃদু হেসে বলেন, "তোমরা যখন আরো বড়ো হয়ে বিশ্বসাহিত্য পড়বে তখন জানবে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকরা কেউ সামাজিক মানুষ ছিলেন না। সামাজিক মাপকাটি দিয়ে তাঁদের বিচার হয় না। হয় সাহিত্যিক মাপকাঠি দিয়ে। সেদিন থেকে টুর্গেনিভ অনেক উঁচুতে। আর আমি অনেক নিচুতে। 'ভার্জিন সয়েল' লিখতে পারি তেমন অভিজ্ঞতা কি আমার আছে!"

"আমাদের পাঁচজনের অভিজ্ঞতা আপনার কাছে আমরা তুলে ধরব, স্বপনদা, আপনার যদি অরুচি না থাকে।" বাবলী বলে সসঙ্কোচে।

"তোমরা যদি পূর্ণ সত্য বলো তবে তা দিয়ে একটা মূল্যবান দলিল তৈরি করতে পারি, কিন্তু দলিলকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করব কী করে? মিথ্ ও লেজেণ্ড দিয়ে তাকে সাধারণের আকর্ষণীয় করা যায়, কিন্তু তা হলে সে টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর পর্যায়ে উন্নীত হবে না। চাই প্রেম, চাই করুণা, চাই দুই বিবদমান পক্ষের বিচিত্র মানবিক গুণাগুণ। কেবলমাত্র হিংসাদ্বেষকে অবলম্বন করে তো মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস হয় না। যেখানে বিষ আছে সেখানে অমৃতও আছে, এটা যদি রূপায়িত করতে না পারি তবে আমি ব্যর্থ হব, বোন।" স্বপনদা আবেগের সঙ্গে বলেন।

"আমরা মাঝে মাঝে আসব, যে যা জানি শোনাব। তার থেকে আপনি যা নিতে পারেন নেবেন। যদি কিছু মিশোল দিতে চান দেবেন। আমরা যে পুরোপুরি নির্দোষ তা তো নয়। আমাদের বিবেকের দংশন আছে। আমি তো ক্ষমা করতে পারিনি আমার কৃতকর্মকে। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী, এই যা সান্ত্বনা। না, আমি হীরোইন নই! হতেও চাইনে। আমাকে যে শক্তি চালিত করেছিল সে শক্তির নাম হিংসাদ্বেষ নয়, তা দেশপ্রেম। সে শক্তি আর কিন্তু আমাকে সেই পথে

চালিত করে না। তার জায়গা নিয়েছে আরো এক শক্তি। এর নাম সামাজিক ন্যায়।" বাবলী আপনার কথা বলে যায়।

গতস্য শোচনা নাস্তি। যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে।" স্বপনদা আশ্বাস দেন। "কিন্তু যেটা ঘটাতে চাও সেটা একটা মায়া। একটা মরীচিকা। তুমি যতই তার দিকে এগোবে সে ততই দূরে সরে যাবে। একদিন দেখবে যে দেশে বিপ্লব বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। শুধু তুমিই ওল্ড মেড হয়েছ। আর তুমিও।" এই বলে স্বপনদা জুলির দিকে তাকান।

মানস ও বেচা রুদের পক্ষ নিয়ে বলে, "ওরা কেন ওল্ড মেড হবে, তুমিই হবে ওল্ড ব্যাচেলর। যদি না তোমরা ওই মাদাম ভিয়ার্দোর জাদুমন্ত্র কাটাও। তোমরা মেয়েরা যদি নাছোড়বান্দা হও স্বপনদা তোমাদের একজনকে বিয়ে করবেন, আর নয়তো তোমাদের এড়াবার জন্যে আর একজনকে।"

"দূর! আমরা কি বিয়ের জন্যে এসেছি না আসতে চাই? অমন কথা বললে আর আমরা আসব না কিন্তু।" জুলি ঠোঁট ফোলায়।

"বিয়ে আমাদের জন্যে নয়। আমরা বিপ্লবের কাছে অর্পিত হয়ে রয়েছি। বিপ্লবের পরে যদি সুযোগ পাই বিপ্লবী কমরেডের সঙ্গেই বিয়ে হবে। বুর্জোয়া বরের সঙ্গে নয়। কোন্ বুর্জোয়া বরই বা আমাদের বিয়ে করতে রাজী হবে! বিয়ে করে পুলিশের নেকনজরে পড়বে!" বাবলী উদাসীন!

"এই দুই উদাসিনী রাজকন্যাকে নিয়ে দিব্যি একখানা উপন্যাস লেখা যায়, মানু। তা তোমরা তোমাদের গুপ্তকথা আমাকে জানাতে পারো, বাবলী আর জুলি। উপন্যাসটা কিন্তু বৈপ্লবিক হবে না। হবে রোমান্টিক।" স্বপনদা কথা দেন।

বাবলী ভুরু কুঁচকে বলে, "তাতে কি বিপ্লবের দিন ত্বরান্বিত হবে, দাদা? তা যদি না হয় তবে কাজ কী অমন রোমান্টিসিজমে? আমরা চাই ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা। ফুল নয়, ফল আমাদের লক্ষ্য।"

"ত্বরান্বিত!" স্বপনদা ফোঁস করে ওঠেন। "সম্ভব হলে বিলম্বিত করতুম। যারা প্রাদেশিক সরকার চালাতে গিয়ে দুটো বছরও টিকতে পারল না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করে যুদ্ধের অজুহাতে পদত্যাগ করল, তাদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকার পড়লে খেয়োখুয়ি করে ছ'মাসের মধ্যেই নতুন এক অজুহাতে আবার দৌড় দেবে। বিপ্লব হলে দেশকে সামলাবে কিনা এদের চেয়ে আরো অনভিজ্ঞ আরো বয়ঃকনিষ্ঠ বামপন্থী দল। বিপ্লব কি ছেলেখেলা না জেলেপাড়ার সঙ্! বোনেদের সামনে বলতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলে উপায় নেই যে, বিপ্লব হচ্ছে দেশের বা সমাজের

প্রসবযন্ত্রণা। যার থেকে নবজন্ম হয়। আর সেই প্রসবযন্ত্রণারও পূর্বে থাকে শতাব্দী-কালের গর্ভযন্ত্রণা। ফ্রান্সের ইতিহাস পড়েছ? রাশিয়ার ইতিহাস পড়েছ? পড়ে না থাকলে আমার লাইব্রেরীতে এসে পড়তে পারো। আমি পড়াব। এর কোনো শর্টকাট নেই, বোন। বিপ্লব হঠাৎ একদিন হয়, সেকথা সত্যি। কিন্তু সেই হঠাতের পেছনে থাকে বহুকালের পটভূমিকা। গোটাকয়েক সাহেব মেরে যেমন রাষ্ট্রবিপ্লব হয় না, তেমনি হাজার কয়েক জমিদার মহাজন ব্যবসাদার বধ করেও সমাজবিপ্লব হয় না। যেটা হবার নয় সেটার জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে চাও তো করো, কিন্তু তার আগেই তোমরা ওল্ড মেড হয়ে ব্যর্থ হবে, বাবলী আর জুলি, আমার দুটি প্রিয় বোন।" স্বপনদার স্বর কাঁপে।

ওরা দু'জনে নির্বাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কী যেন বলার আছে, অথচ ভাষা ফোটে না।

"আমি জানি তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ।" স্বপনদা বলেন ধরা গলায়, "কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে চাই বৃহৎ প্রস্তুতি। চুরি করে, ডাকাতী করে, খুন করে, ফেরার হয়ে কি বৃহৎ কোনো প্রস্তুতি হয়? মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত বীরত্বের পূর্বাভাষ কোথায় ও কতটুকু? বিপ্লব কি ভারতের মাটিতে কখনো এর আগে হয়েছে? তার ঐতিহ্যই আমাদের জনমানসে নেই। বিদ্রোহ মাঝে মাঝে ঘটেছে, সিপাহী বিদ্রোহও তেমনি এক ঘটনা। সব চেয়ে বড়ো। কিন্তু ফরাসী বা রুশ বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে তেমন বিপ্লব যদি চাও তো ত্বরান্বিতের আশা ছেড়ে দাও। বরং বিলম্বিতের জন্যেই মনটাকে তৈরি করো। তা হলে অযথা আত্মত্যাগ করতে হবে না। তোমাদের মতো মেয়েদের ভাববিহ্বল আত্মত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে, কিন্তু বেদনায় অভিভূত করে তার চেয়ে বেশী। তাই তোমাদের দুর্ভোগ নিয়ে আমি ফলাকাঙ্ক্ষী রচনা লিখতে পারিনে। লিখলে রোমান্টিক রচনাই লিখব। কিন্তু এখন নয়। এখন আমার উপরে ক্লাসিক সৃষ্টির বরাত। যতদিন না লিখতে পারছি ততদিন আমার শান্তি নেই, বোন। তার আগে না যুদ্ধ এসে পড়ে। তা হলে আমার ঘরবাড়ী লাইব্রেরী সামলানোই দায় হবে। এ যুদ্ধ যে কতকাল গড়াবে, কতদূর গড়াবে তা কে ব'তে পারে!"

জুলি ফরফর করে বলে, "ওটা ইংরেজদের ব্যাপার। আমাদের নয়।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ইংরেজরা যদি হেরে যায় আর তাদের শত্রুরা এদেশে এসে হানা দেয় তবে আমাদের ব্যাপারও হতে পারে।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "কিন্তু, স্বপনদা, বাবলী আর জুলি কচি খুকি নয়, এরা জেলফেরং বীরাঙ্গনা, আর বাবলী তো

জলখানায় বসে এম. এ. পাশও করেছে। তুমি এদের পড়াবে কী! এরা সব ড়েছে।"

স্বপনদা তাঁর দুই বোনের পিঠে দুই থাপ্পড় দিয়ে মাপ চান। "এর পরে আবার যদিন আসবে সেদিন এক বাক্স ক্যারামেল আর এক বাক্স চকোলেট পাবে। মামার চোখে তোমরা নাবালিকা কিশোরী ছাড়া আর কিছু নও। তোমাদের জন্যে গাটা দুই রূপকথা লিখব কি না ভাবছি। রূপকথার শেষে কী থাকে জানো তো? দ ম্যারেড অ্যাণ্ড লিভ্ড হ্যাপিলি এভার আফটার।' তোমরা যদি গুপ্ত কথা শানাতে চাও শুনব, কিন্তু গুপ্ত চক্রান্তের মধ্যে আমি নেই। নীতিহিসেবে ওটা বন্ধ্যা। ঢতা মাফ কোরো, ওর মধ্যে সমাজের বা সমষ্টির না আছে গর্ভযন্ত্রণা, না প্রসবযন্ত্রণা। বজন্মের জন্যে আমিও ব্যাকুল। কিন্তু যা নেই তাকে নিয়ে আর একখানা 'ভার্জিন য়েল' লিখতে পারিনে। অন্য কেউ যদি পারেন তাঁকে আমি শিরোপা দেব। বাবলী মার জুলি, আমার আদরের দুটি বোন, তোমরা গুপ্ত পন্থার চোরাগলি ছেড়ে দাও। াজপথ দিয়ে চলো, তা হলে হয়তো একদিন আমি 'এরোইকা'র মতন কিছু লিখতে প্ররণা পাব।"

বিদায়ের পূর্বে জুলি সুধায়, "মানসদা কি আজকেই ফিরে যাচ্ছ? সৌম্যদা কিন্তু মারো দিনকয়েক থাকছে। গান্ধীজী নাকি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বেরোবেন। তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। একদল নাকি ক্ষেপেছে তাঁকে মারতে। আপনিও কছু করবেন না, আর-কাউকেও কিছু করতে দেবেন না। বসে বসে চরকা কাটবেন। লোকে তো যা তা বলবেই। সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ধনতন্ত্রের দালাল, মনি কত কথা। আমরা এদিকে হাঁ করে বসে আছি কবে উনি গণসত্যাগ্রহের ংকেত দেবেন। আগ্নেয়গিরি লাভা বর্ষণ করবে। তা নয়, উনি কিনা চললেন দ্মানদীর জলযানবিহারে।"

"অমন কথা মুখে আনতে নেই, জুলি।" মানস ব্যথা পায়। "অনেকদিন মাগে থেকেই স্থির হয়ে রয়েছে যে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন এবার ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের স্বগ্রামে বসবে। গান্ধীজীর যোগদান একান্ত আবশ্যক। কী যেন এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বোধহয় যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে গঠনকর্মীদের নীতিনির্ধারণ। এসব দায়দায়িত্ব চুকিয়ে না দিয়ে কি আন্দোলনের ডাক দেওয়া যায়? এতই যদি তোমাদের তাড়া তবে তোমাদের বামপন্থী নেতারা তাঁর অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?"

বাবলীই এর জবাব দেয়। "নেতায় নেতায় গুরুতর মতভেদ। কেউ বা তাকিয়ে

আছেন গান্ধীজীর দিকে, কেউ বা কমরেড স্টালিনের দিকে। সুভাষচন্দ্রের ভক্তেরা তৃতীয় একদিকে। এম এন রায়ের শিষ্যরা চতুর্থ একদিকে।"

স্বপনদা মুচকি হেসে বলেন, "আর জনগণের দিকে তাকিয়ে আছেন কে?" উত্তর না পেয়ে নিজেই মন্তব্য করেন, "শ্রমিক শক্তি যদি তৈরি না থাকে, কৃষক শক্তি যদি প্রস্তুত না থাকে, সৈনিক শক্তি যদি স্বপক্ষে না থাকে তবে বিপ্লব দূর অস্ত্। গান্ধীজী যদি বিপ্লব চাইতেন তা হলে তিনিও অক্ষম হতেন। তিনি চান বিপ্লব নয়, স্বরাজ। যেটা রাশিয়ায় ছিল, ভারতে নেই। স্বরাজই হচ্ছে প্রথম ধাপ, একে ডিঙিয়ে বিপ্লবের ধাপে পা রাখা যায় না। স্বরাজের জন্যেও জনগণ সব রকম কষ্ট সইতে প্রস্তুত নয়। ইংরেজ কি ঘাড় মটকে না দিয়ে ঘাড় থেকে নামবে? সব চেয়ে যেটা খারাপ সেটার জন্যেও জনগণকে তৈরি করে নিতে হবে। বামপন্থী নেতারা বরাবরই গান্ধীজীর আড়াল থেকে লড়েছেন, তাই তাঁদেব দায়িত্ববোধ জন্মালে টের পাবেন যে কুম্ভকর্ণকে অকালে জাগাতে নেই। জাগলে নিশ্চিত পরাজয়।"

জুলি জলে ওঠে। "তার মানে কি এই যে, যুদ্ধের সময় বিপ্লবের সময় নয়?"

স্বপনদা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করেন, "হতেও পারে, না হতেও পারে। কে জানে কোন্‌টা আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি! গান্ধীজীও কি জানেন?"

॥ চব্বিশ ॥

বিদায় নিতে গিয়ে বাবলী বলে, "দাদা, আপনি কিন্তু আমাদের হাতে মোয়া ...রিয়ে দিয়ে নিরাশ করলেন।"

স্বপনদা স্মিত মুখে বলেন, "আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, এদেশের মাটিতে সত্যি-...ার বিপ্লব যেদিন ঘটবে সেদিন আমি যদি বেঁচে থাকি ও আমাকে যদি লিখতে ...দেওয়া হয় তবে আমি সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করব। কিন্তু ...াম না জন্মাতে রামায়ণ রচনা আমার দ্বারা হবে না। তাতে করে তোমাদের ...বিপ্লবেরও তেমন কোনো সুরাহা হবে কি না সন্দেহ। উল্টে আমাকেই দেশ ছেড়ে ...ালিয়ে গিয়ে প্যারিসে আশ্রয় নিতে হবে। তোমরা কি মনে করেছ টুর্গেনিভ ও বই ...রাশিয়ায় বসে লিখেছিলেন?"

জুলি মানসকে বলে, 'ফিরে গিয়ে যুথিকাকে আমার প্রীতি জানাবেন আর দীপক ও মণিকাকে ভালোবাসা। চিঠি আমি ইচ্ছে করেই লিখিনে, লিখলে সে চিঠি ...পুলিশের হাতে পড়বে! যুথিকাও সন্দেহভাজন হবে।"

মানস তাকে অভয় দেয়। আমি তো স্বেচ্ছায় রাজকর্ম থেকে অপসরণ করতে ...যাচ্ছি। ওটা না হয় একটু ত্বরান্বিত হবে।"

"ত্বরান্বিত!" স্বপনদা তেড়ে আসেন, "বিলম্বিত বলো। সুখে থাকতে ভূতে ...কিলোয়! কী করতে পারো তুমি দেশের ও বিশ্বের এই সঙ্কটে? অসি তোমার ...আমার জন্যে নয়। মসীই আমাদের হাতিয়ার। কিন্তু এ দিয়ে যুদ্ধও করা যায় না, ...যুদ্ধ নিবারণও করা যায় না, আমরা অক্ষম। আমাদের পক্ষে শ্রেয় আমাদের যেখানে ...ক্ষমতা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকা। অর্থাৎ সাহিত্যের অন্দরমহলে।"

"কিন্তু," মানস আপত্তি জানায়, "এই বাবলী জুলিদের সাজা দিতে কি আমার হাত উঠবে? বিবেকে বাধবে না? আর এরাও কি আমাকে সাজা না দিয়ে ছাড়বে? এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে কে?"

"কী যে বলো, মানসদা," জুলি প্রতিবাদ করে। "আমরা ধরা পড়লে তে
তুমি আমাদের সাজা দেবে? এবার আমরা হুঁশিয়ার হয়ে গেছি।"

বাবলী আশ্বাস দেয়, "আর যদি ধরা পড়ে সাজা পাই তো অনিচ্ছুক বিচারকদে
আমরা বাঁচতে দেব। ওঁরাও তো নিমিত্তমাত্র।"

ওদের বিদায়ের পর স্বপনদা বলেন, "ওদের থীসিসটাই ভুল। কিন্তু কী ক
ওকথা ওদের মুখের উপর বলি? ওদের ধারণা ক্ষমতা চলে আসবে মধ্যবিত্তদে
ডিঙিয়ে সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। গণতন্ত্র এড়িয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের হাতে
সেটা হবার নয়। হবার যেটা সেটা দুই দফায় হবে। প্রথমে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। ত
পরে শ্রমিক সমাজতন্ত্র। মাঝখানে হয়তো ত্রিশ চল্লিশ বছর ব্যবধান। অসম
কুম্ভকর্ণকে জাগাতে নেই। জাগাতে গেলে যেটা হবে সেটা ফাসিজম বা নাৎসিজ
ইউরোপে চারবছর থেকে এটাই আমি দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এদের শিক্ষা (
পুঁথিগত। মার্ক্স বলো এঙ্গেলস বলো লেনিন বলো কেউ কি ফাসিজম
নাৎসিজমের সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলেন? তাঁদের শাস্ত্রে এই পর্বটি বাদ গেছে
এবারকার যুদ্ধে ক্যাপিটালিজম খতম হবে না, সেটা একটা ভ্রান্তি। খতম হ
ইম্পীরিয়ালিজম। সেবারকার যুদ্ধে গোটা চারেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল
রাশিয়ান, জার্মান, অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান, টার্কিশ। এবারেও গোটা পাঁচেক সাম্রা
ভেঙে পড়তে পারে। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়ান, ডাচ, পর্টুগীজ। হয়তে
জাপানীজও। তার মানে সাম্রাজ্যবাদের যুগ যাবে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের যুগ সেইস
যাবে না।"

"আমাদের কর্তব্য তা হলে কী?" মানস জানতে চায়।

"ব্রিটেনকে রক্ষা করা, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নয়। ফ্রান্সকে রক্ষা করা, কি
ফরাসী সাম্রাজ্যকে নয়। ব্রিটেনকে ও ফ্রান্সকে আমরা ভালোবাসি, কিন্তু তাদে
সাম্রাজ্যকে নয়। সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে আমরা প্রাণ দিতে নারাজ, ধন দিতে নারা
ওই জুলি পাগলীর ভাষায়, না একো রুপেয়া না একো জওয়ান। ওদের সাম্র
যদি ওরা মানে মানে গুটিয়ে নেয় তা হলে হিটলারের হাত থেকে ব্রিটনকে বাঁচানো
জন্যে, ফ্রান্সকে বাঁচানোর জন্যে, আমরা যে যা পারি তা করতে ছুটে যাব। তু
আমি, জবাহরলাল, এমন কী, গান্ধীজী—আমরা সবাই ইংরেজদের ভালোবাসি, f
চাপরাশি খানসামার মতো নয়। চাপরাশি খানসামার সঙ্গে আমরা রাজভ
প্রতিযোগিতায় নামতে পারব না। বড়লাট যদি আমাদের তাঁর সঙ্গে এক টেবি
বসে খানা খেতে ডাকেন তা হলে আমরা সমান মর্যাদার সঙ্গে বসব, খিদমদগা

মতো তফাতে দাঁড়িয়ে থেকে সাহেবলোকের খানা জুগিয়ে দেব না। আমাদেরও তো মানসম্মান আছে। কী দরকার, বাবা, লাটবাড়ীর তল্লাট মাড়াবার? সেখানকার খানার টেবিলে বসবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করাও হীনতা। কেন আমরা বড়লাটের নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করব? না গেলে কুস্তি শুরু করে দেব? সংঘর্ষের ভিতরে একটা ঘৃণার ভাব আছে। এমন কী, অহিংস আন্দোলনও ঘৃণামুক্ত নয়। ব্যাটাদের হাতে না মেরে ভাতে মারব, গলাধাক্কা দিয়ে না তাড়িয়ে ধোপানাপিত বন্ধ করে তাড়াব, এটাও তো ঘৃণার অভিব্যক্তি। যাদের আমি ভালোবাসি তাদের আমি ঘৃণা করি কী করে? গান্ধীজী না হয় পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বাধীন জনগণ কি অত সূক্ষ্ম বিচার করতে পারে? ওদের যদি তাতিয়ে তোলা হয়, মাতিয়ে তোলা হয়, ইংরেজদের সবাইকে ওরা ঘৃণা করবে। এই যুদ্ধের মাঝখানেও তাদের বিব্রত করবে, আশ্চর্য হব না যদি গায়ে হাত দেয় বা দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। আগুন নিয়ে খেলার সময় এটা নয়। তবে সরকার যদি জোর করে টাকা আদায় করে, যুদ্ধের জন্যে জওয়ানদের ধরে নিয়ে যায়, আগুন আপনি জ্বলে উঠবে। আমরা কেউ নেবাতে যাব না। তোমার ডিউটি, তুমি যেতে বাধ্য, আমি কিন্তু নীরব দর্শক।"

"আমি যাতে বাধ্য না নই সেইজন্যেই তো আগে থেকে চাকরি ছাড়তে চাই, স্বপনদা। শোনা যাচ্ছে চেম্বারলেনের বদলে চার্চিল নাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওঁর এমন অহঙ্কার যে গান্ধীজী যখন রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে রাজ অতিথি হয়ে বিলেত যান তখন উনি তাঁকে ইন্টারভিউ পর্যন্ত দেন না। তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলে গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হবার নয়। অথচ চার্চিল প্রধানমন্ত্রী না হলে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলা সহজ হবে না। আমি তো চোখে আঁধার দেখছি, স্বপনদা। সাম্রাজ্য পাশ দৃঢ় করাই চার্চিলের লক্ষ্য। সাম্রাজ্য পাশ ছিন্ন করাই গান্ধীজীর লক্ষ্য। কী করে দু'পক্ষের মতের মিল হবে? মতভেদ থেকে পথভেদ। পথভেদ থেকে সংঘর্ষ। ঘৃণা এড়াতে পারবে ক'জন! ঘৃণার ভাব প্রবল হলে ভালোবাসার ভাবও দুর্বল হবে। আমরা যারা ব্রিটেনকে ভালোবাসি, ফ্রান্সকে ভালোবাসি, তারা একদিন কোণঠাসা হব। দুই পক্ষই আমাদের ভুল বুঝবে। একপক্ষ ভাববে রাজদ্রোহী, অপরপক্ষ ভাববে দেশদ্রোহী। আমার মনের শান্তি যাবে। আমি কি বেঠোভেনের মতো বধির যে সেই গোলমালের মধ্যেও নিবিষ্ট চিত্তে সৃষ্টির কাজ কাজ করতে পারব? না, চাকরি থেকে বেরিয়ে এলেও না। নীরব দর্শক হওয়া আমার স্বভাবে নেই। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।"

স্বপনদা সব শুনে বলেন, "ওয়েট অ্যাণ্ড সী।"

কথাটা মানসের মনে ধরে। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। ওদিকে যুদ্ধ যাদের মাথার উপরে তাদের তো মাথাব্যথার লক্ষণ নেই। যত মাথাব্যথা কি ভারতের রাজনীতিক তথা ভাবুকদের? তাছাড়া যুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীনতাকে বন্ধনীভুক্ত কি না করলেই নয়? আর স্বাধীনতার সঙ্গে বিপ্লবকেই বা বন্ধনীভুক্ত করা কেন? তলে তলে চলেছে পাকিস্তানের উদ্যোগ, যাতে স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে দশ কোটি মুসলমানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায়। ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পরে হিন্দুরাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধের পরেও টিকে যেতে পারে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি ইতিমধ্যেই ধোঁয়া হয়ে যাবে।

স্বপনদা তা শুনে বলেন, "আমিও একদা ভাবপ্রবণ ছিলুম মানু। কিন্তু চার বছর ইউরোপে বাস করে ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হই। দেশ যতদিন পরাধীন থাকে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম মানুষকে মহৎ হবার প্রেরণা দেয়। আদর্শবাদী নরনারীতে শিবির ভরে যায়। কিন্তু যেই স্বাধীনতা অর্জিত হলো অমনি ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি। সেই আদর্শবাদীদেরই কুৎসিত এক চেহারা। যারা শহীদ হলো তারা যদি বেঁচে থাকত তারাও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অংশ নিয়ে মহত্ত্ব খোয়াত। অতদূর যেতে হবে কেন, এই ভারতেরই আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গঠিত হবার পর থেকে আদর্শবাদীদের চরিত্র বদলে গেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তাঁদেরও চেহারা মলিন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার হলে পরে দেখবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাঁদের চরিত্রভ্রষ্ট করবে। তখন তাঁদের চেহারা দেখে তুমি শিউরে উঠবে। কংগ্রেস যদি আবার সংগ্রামে নামে তা হলে তার ইমেজ কতকটা ফিরে পাবে। কিন্তু সে সংগ্রাম যদি দীর্ঘমেয়াদী না হয়, যদি তার আগেই দম ফুরিয়ে যায়, যদি ক্ষমতার ছিটেফোঁটা পেয়েই দক্ষিণপন্থীরা রণে ভঙ্গ দেয় আর বামপন্থীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে না লড়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ে তা হলে তোমারও মোহভঙ্গ হবে। ইংরেজীতে আরো একটা বচন আছে। 'থিঙ্গ্স আর নট হোয়াইট দে সীম'। এই যুদ্ধে ইংরেজ বা ফ্রান্স ধোয়া তুলসী পাতা নয়। জার্মানীও নয় গুয়ে গ্যাদালপাতা। চেম্বারলেনও নন দেবতা। হিটলারও নন অসুর। যুদ্ধটা যে ডেমোক্রাসীর ইস্যুতে ডিকটেটরশিপের সঙ্গে হচ্ছে এটাও উপর থেকে দেখতে, আসলে তা নয়। স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত। তুমি আমি কেন এতে জড়িয়ে পড়তে যাই? তবে এটাও আমি বলব যে ইংরেজদের হেরে যেতে দেখলে আমি গভীর ব্যথা পাব, ফরাসীদের বেলাও তাই। না, আমি এদের পরাজয় চাইনে।"

"আর জার্মানদের হেরে যেতে দেখলে?" মানস জেরা করে।

"ছাখ, জার্মানদের বিশবছর ধরে খোঁচানো হয়েছে। জখমী বাঘকে বার বার খোঁচালে সে তো মরীয়া হয়ে মরণকামড় দেবেই। তা হলেও তাকে হারানো সহজ হবে না, যদি না রাশিয়া বা আমেরিকা বা উভয়েই তার শত্রু হয়। এখন থেকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। ওয়েট এণ্ড সী। শেষপর্যন্ত যদি জার্মানী হেরে যায় তবে তার জন্যে আমিও গভীরভাবে ব্যথিত হব। বাখ আর বেঠোভেন, গ্যেটে আর শিলারের জাতির পরাজয় কত বড়ো একটা ট্রাজেডী! একে নিবারণ করতে পারলেই সভ্যতার প্রতি যথাকর্তব্য করা হতো। কই, পারলেন কি কেউ নিবারণ করতে? ইউরোপে কি মহান ব্যক্তিত্বের অভাব? রলাঁ আর রাসেলপর্যন্ত এবারকার যুদ্ধে শান্তিবাদী নন। একমাত্র শান্তিবাদী গান্ধীজী। কিন্তু তাঁর পেছনে যদি রাজশক্তি না থাকে তবে তিনি কেমন করে মধ্যস্থতা করতেন বা করবেন? আর তাঁর নিজের সেরকম অভিপ্রায় থাকলেও তাঁর সহকর্মীদের সে মনোভাব কোথায়?" স্বপনদা সংশয় প্রকাশ করেন।

মানস বিষণ্ণ মুখে বলে, "মহাত্মার পক্ষে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এর সম্মুখীন হতে তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু অন্তত একটি নেশনকে নিরস্ত্র হয়ে দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে যে নিরস্ত্র হয়েও আত্মরক্ষা করা যায়। সেই নেশনটি ভারত ভিন্ন আর কে? তাঁর শিষ্যদের হাতে ক্ষমতা এলে তাঁরা কি দেশকে নিরস্ত্র করতে রাজী হবেন? একজন কি দু'জন হয়তো গুরুর মুখ চেয়ে সম্মতি দেবেন, কিন্তু অধিকাংশেরই তাতে অমত। হিটলার, চার্চিল, স্টালিন কেউ কর্ণপাত করবেন না। কেউ ঝুঁকি নেবেন না। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস যে অস্ত্রপরীক্ষায় তিনিই জিতবেন, তাঁর প্রতিপক্ষ পরাস্ত হবে। মহাত্মাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট থাকলে তাঁকেও। যুদ্ধরত সব ক'টা নেশনই তো খ্রীস্টান। জাপান যদি যোগ দেয় সেও তো বৌদ্ধ। অথচ একটিরও অন্তঃপরিবর্তন সম্ভবপর নয়। এ যুদ্ধ চলছে, চলবে, দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাবে। কে হারবে, কে জিতবে, সেটা এখন থেকে বলা যায় না। যদি হিটলার হারে তবে স্টালিনকে রুখবে কে? বিপ্লবের রক্তস্রোতে সারা জার্মানী লাল হয়ে যাবে। তার পরে সারা কন্টিনেন্ট। আর হিটলার যদি জেতে তবে ফরাসী বিপ্লবের মতো রুশ বিপ্লবও স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। তুমি কি খুশি হবে?"

"খুশি হব!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। "না, মানু। জার শাসিত রাশিয়ার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না, তাই বিপ্লবই ছিল উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তা বলে সব দেশেই বিপ্লব হবে, কোথাও আর কোনো পথ খোলা নেই, এটা একটা

কুযুক্তি। ক্যাথলিকদের মতো কমিউনিস্টদের এটাও একটা ডগমা। গোটা পৃথিবী দূরের কথা গোটা ইউরোপও পুরোপুরি ক্যাথলিক হয়নি, যারা পুরোপুরি ক্যাথলিক হয়েছিল তাদের একভাগও পরে একদিন প্রটেস্টান্ট হয়ে যায়। মার্কসবাদীদেরও সেই দশা হবে। ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদেরও একটা সুযোগ দেবে, যাতে তারা শোষিত বঞ্চিত জনগণকে বিনা বিপ্লবেই বিপ্লবের সুফল জোগাতে পারে। সেইজন্যেই আমি বিপ্লবকে বিলম্বিত করতে চাই। ত্বরান্বিত করতে নয়। কে না জানে যে বিপ্লব মানে মহতী বিনষ্টি? রাশিয়ায় কত লক্ষ মানুষ মরেছে, কত লক্ষ মানুষ উৎখাত হয়েছে, কত লক্ষ মানুষ বন্দীশালায় বেগার খাটছে, খবর রাখো? আমি সেটা এড়াতে পারলেই খুশি হব। কিন্তু ইতিহাস যাদের একটা সুযোগ দেবে তারা যদি তার সদ্ব্যবহার না করে তবে বিপ্লব ভিন্ন আর কোন্ পথ খোলা থাকবে, তুমিই বলো?"

মানস চিন্তা করে। বলে, "যে দেশের রেনেসাঁস হলো না, রেফরমেশন হলো না, এনলাইটেনমেণ্ট হলো না, সে দেশে রেভোলিউশন হবে, এটাও কতকগুলো ধাপকে ডিঙিয়ে যাওয়া। রেভোলিউশন হলে তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বেশীদিন লাগবে না। গুরু পুরোহিত মোল্লা মৌলভীরাই ঘুরিয়ে দেবে। আমি চাই ধাপে ধাপে এগোতে। শেষ ধাপটা হয়তো রেভোলিউশন। ওটাকে আমি অসম্ভব বলব না, অবশ্যম্ভাবীও বলব না। সব দেশেই রেভোলিউশন ও ভায়োলেন্স সমার্থক হয়ে গেছে। ভারতেও যদি হয় তবে আশ্চর্য হব না। যদি না হয় তা হলেই বরং আশ্চর্য হব। গান্ধীজীর শিক্ষা জনগণের অন্তর জয় করলে বিপ্লবের দিন তারা অহিংস থেকে ইতিহাসে এক আশ্চর্য নজির সৃষ্টি করবে। সেদিন হবে এক নবযুগের সূচনা। আমি যে গান্ধীজীর উপর আশাভরসা রাখি তার কারণ ভারতের জনগণকে তিনি নতুন একটা পথে চালিত করছেন, যে পথের একটি ধাপ পরাধীনতামুক্তি, আরেকটি ধাপ শোষণমুক্তি। নতুন বলতে বোঝায় অহিংস উপায়ে। কিন্তু সেইসঙ্গে রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেণ্টও চাই। তিনি যে এসব বিষয়ে অচেতন বা নিষ্ক্রিয় তা নয়। কেউ যদি ভগবান না মানে, কিন্তু সত্যকে মানে তা হলেও সে তাঁর প্রিয় হতে পারে, কারণ তাঁর বিচারে সত্যই ভগবান। এদিক থেকে তিনি একজন ধর্মসংস্কারক। সমাজসংস্কারেও তিনি তৎপর। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত অভিযান। স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিবাহেও তাঁর আশীর্বাদ আছে। এই তো সেদিন সেরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার অমিল সেটা হচ্ছে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র। সেক্ষেত্রে গান্ধীপন্থীদের গতি সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত। শৃঙ্খলা সেক্ষেত্রে

শৃঙ্খলের নামান্তর। তবে তাঁর চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। সেদিক থেকে তিনি রেনেস্‌াঁসের ধারাবাহক।"

স্বপনদা যথাসময়ে মানসকে ট্রেনে তুলে দেন। বলেন, "আবার এসো। ক্লাবটার একটা হিল্লে করতে হবে। লিকুইডেশনে আমার মন সায় দিচ্ছে না। যে বৃক্ষ আমি স্বয়ং রোপণ করেছি সে যদি বিষবৃক্ষও হয় তবু তার মূলোচ্ছেদ করতে মায়া করে। ভাবছি ওটাকে ক্রমে ক্রমে ফোর আর্টস ক্লাবে রূপান্তরিত করলে কেমন হয়। হ্যাঁ, মহিলারাও আসবেন, স্ক্যাণ্ডাল দুটো একটা হবে, কিন্তু বিয়ে যাঁদের হচ্ছে না বিয়েও তো তাঁদের হতে পারে।"

মানস ফিক করে হেসে বলে, "যেমন তোমার। যেমন বাবলীর, জুলির। যদিও ওরা আর্টের ধার ধারে না তবু ওদের গেস্ট করে নেওয়া যেতে পারে। অমনি করে ওরা আর্টের সমজদার হবে। কী বলো, স্বপনদা?"

স্বপনদা হাসেন। "না, ওদের মতো বিপ্লবী নায়িকাদের আসতে দেওয়া হবে না। ওরা ঘরে ঘরে বিপ্লব ঘটাবে। বিবাহিত পুরুষদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেবে। তাঁদের সহধর্মিণীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে। সেবারকার অভিজ্ঞতার ফলে আমি হুঁশিয়ার হয়েছি। সাবধানের মার নেই। পঞ্চশরের শরে।"

স্বস্থানে ফিরে গিয়ে মানস যুথিকাকে সব কথা জানায়। জুলির সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার বান্ধবী বাবলীর সঙ্গেও, ঘটনাচক্রে সৌম্যদার সঙ্গেও। আপাতত কেউ জেলে যাচ্ছে না, জেল এড়াবার জন্যে পাতাল প্রবেশ করছে না। কলকাতার রাজনীতিক আবহাওয়া থমথমে। বুদ্ধিজীবী যাঁদের বলা হয় তাঁদের বেশীর ভাগই নাৎসীদের বিপক্ষে। কিন্তু হিটলারের পক্ষেও একভাগ আছেন। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা ব্রিটেনের পরাজয় কামনা করেন। কিন্তু এসব ডিফিটিস্ট তো গান্ধীপন্থী নন। গান্ধীজীকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তিনি এঁদের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত না হন। তাঁকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হবে।

"তারপর তোমার স্বপনদার সমাচার কী?" যুথিকা কৌতূহলী হয়। তোমার মুকুন্দদার কী খবর? ওই দুই চিরকুমার কি ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? তা হলে দেশের কুমারীদের কী ভবিষ্যৎ? ওরা কি বরের অভাবে চিরকুমারী হবে?"

"স্বপনদা এখন কবি য়েটসের মতো পরিতাপ করছেন। এত বয়স হলো, এখনো পিতৃঋণ শোধ করা হলো না। য়েটসের জীবনে যেমন মড গন্ স্বপনদার জীবনে তেমনি বকুল চক্রবর্তী। কী চোখে যে ওঁকে দেখেছেন আর কোনো মেয়ের চোখে লাগে না। মডের মতো বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে কবে। মডের মতো।"

ফিরে তাকান না। রোমান্সের ঘোর তবু কাটে না। জীবনে দ্বিতীয় এক রোমান্স ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! না ঘটলে উনি বিয়ে করবেন না। ওই প্রথম প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন। তা নিয়ে একটা ক্লাসিকও লিখবেন। কিন্তু কোনোদিক থেকেই সফল হচ্ছেন না। পেশার দিক থেকেও না। কেবলি হা হুতাশ করছেন। 'আমি ফেল'।" মানস বলে যায়।

যুথিকা দুঃখিত হয়। "আর মুকুলদা?"

"মুকুলদার কেসটা বিপরীত। তাঁকে ভালোবাসেন এক বিবাহিতা মহিলা। পতিপরিত্যক্তা। কিন্তু হিন্দু মতে ডিভোর্সের উপায় নেই। সুতরাং পুনর্বিবাহেরও আশা নেই। এই হতাশাকে দু'জনেই মহিমান্বিত করেছেন। নিষ্কাম সাধনায়। মানবিক প্রেম পরিণত হয়েছে ভাগবত প্রেমে। মুকুলদার তেমন কোনো অভাববোধ নেই। গানের মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের অর্থ পাচ্ছেন। সংসারী মানুষের মতো তাঁর অর্থচিন্তা নেই। আশ্রমে বাস করেন। আশ্রমই তাঁকে চালায়। গান করে যদি কিছু মেলে তবে তা নিজের নামে নয় আশ্রমের নামে গ্রহণ করেন। অথচ তিনি সন্ন্যাসী নন। মুকুলানন্দ স্বামী বললে তিনি রাগ করেন। সবাই তাঁকে ডাকে মুকুলদা বলে। তাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর সঙ্গে দেখলুম দুই গোরা সন্ন্যাসী। কৃষ্ণপ্রাণ আর হরিপ্রাণ। হিমালয়ে তাঁদের আশ্রম। নিবেদিত আত্মা।"

যুথিকা রসিকতা করে। "আরো দুটি ওল্ড মেড সৃষ্টি করা হলো!"

এর পরে মানস জানতে চায় তার অনুপস্থিতিতে নতুন কিছু ঘটেছে কি না। বাড়ীতে·কিংবা শহরে।

"ক্যাপটেন মুস্তাফী এসেছিলেন মিলির চিঠি নিয়ে। বেডফোর্ড নাকি ওকে পরের বছর ভর্তির আশা দিয়েছে। যুদ্ধের জন্যে কারো মনে এতটুকু আতঙ্ক নেই। বরং সকলেই দেশের জন্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে চায়। মিলির গায়েও ত্যাগের বাতাস লেগেছে। রোমে এলে রোমানদের মতো আচরণ করতে হয়। মিলিও এখন একজন রোমান। ভারতের স্বাধীনতার নিরিখে ইংলণ্ডকে বিচার করতে তার ইচ্ছে করে না। যতই অন্যায় করে থাকুক না কেন এখন ওরা বিপন্ন। বিপন্নকে বিব্রত করা উচিত নয়। ওদের একদিন সুমতি হবে। তার জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়। এ কী কথা শুনি আজ মালতীর মুখে! লঙ্কায় যেই যায় সেই রাক্ষস হয়। মিলির এই অধঃপতন কি তার বিপ্লবী বান্ধবীরা সুনজরে দেখবে? জুলি কী মনে করবে? সৌম্যদা কী মনে করবেন? তবে আমার কথা যদি বলো আমি মিলির এই পরিবর্তন সঙ্গত মনে করি। যে দেশে ওকে বাস করতে হবে সে দেশের বিপদে ওরও

তো বিপদ। যে ডালে বসেছে সে ডাল কাটা গেলে ওরও তো পতন। ভারতের স্বাধীনতার ভাবনা ভারতবাসীদের। ব্রিটেনবাসিনীর নয়। ক্যাপটেন মুস্তাফীরও সেই মত। দর কষাকষি যদি করতে হয় দেশের রাজনীতিকরা করবেন। মিলির কাজ বিনা শর্তে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করা। সেবা প্রতিষ্ঠানে তালিম পেয়েছে, সেবার কাজটাও তো সে করতে পারে। অস্ত্র যদি ধরতে হয় তো সুকুমার ধরবে।" যুথিকা শোনায়।

"বিলেতে থাকলে আমিও তাই করতুম। তুমিও।" মানস মন্তব্য করে।

"অগত্যা। কিন্তু প্রথম সুযোগেই আমি দেশে চলে আসতুম ও বিলেত সম্বন্ধে দায়মুক্ত হতুম। মিলি বেচারি সবে ওদেশে গেছে। ফেরারও পথ বন্ধ। টর্পেডোর ঘায় জাহাজডুবি হবে। এদেশে থাকলে জেলে যেতে হতো। মনে করো ওটাও ওর কারাবাস। কয়েদীর মতো খেটে মরতে হবে।" যুথিকা আপসোস জানায়।

"আমি হলে উদ্দীপনা বোধ করতুম, জুঁই। এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী। মিলি যদি উপন্যাস লেখে চাইকি আর একটা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' লিখতে পারবে। আমি তো পারব না। আমি ওকে ঈর্ষা করি। ওকে আমার অভিনন্দন জানিয়ো। সুকুমারকেও, সেও যদি অস্ত্র হাতে নেয়।"

দিনকয়েক পরে সৌম্য এসে হাজির। বলে, "সব ঠিক। বাপু তোমার জন্যে বিশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা পনেরো মিনিট সময় নির্দিষ্ট করেছেন। এখন সেই পনেরো মিনিটের জন্যে তোমাকে রাত একটার ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন থেকে নেমে স্টীমার। স্টীমার থেকে নেমে মাইল খানেক পদযাত্রা। তার পরে গান্ধী কুটীর। দুপুরে তুমি সেবাসঙ্ঘের অতিথিশালায় পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসবে। তারপর আবার পদযাত্রা। আবার স্টীমার। আবার ট্রেন। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা। আমি যাবার বেলা তোমার সহযাত্রী হব, কিন্তু আসবার বেলা নয়। আমাকে সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে হবে। গান্ধীজীর প্রস্থানের পর আমারও প্রস্থান। সিদ্ধান্ত কী হলো জানা আমার দরকার। গুরুতর সঙ্কট।"

মানস সৌম্যর সঙ্গে যাবে, এটা তো একরকম আগে থাকতেই স্থির ছিল। কবে, কখন, কেমন করে আগে জানত না, এখন জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইংরেজী মতে যেদিন রওনা হবে সেইদিনই ঘুরে আসবে। একটা পুরো দিনও লাগবে না। গান্ধী-জীকে তো আর কখনো এত নিভৃতে পাওয়া যাবে না। মানস রাজী হয়। "গুরুতর সঙ্কট।" শুনে তার কৌতূহল বেড়ে যায়।

"সঙ্কট কি গণসত্যাগ্রহ নিয়ে?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

"না, ভাই। সেটা গান্ধীজীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কাউকে তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না কবে, কোন্ ইস্যুতে গণসত্যাগ্রহ ঘোষণা করবেন বা আদৌ করবেন না। সেটাও তো একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের নৈতিক বিকল্প। একপ্রকার বিপ্লবও বলতে পারো। বিপ্লবের নৈতিক বিকল্প। নীতিগতভাবে সেটা ঠিক কি ভুল এ বিচার তাঁরই সাজে, আর কারো নয়। আমরা কেউ তাঁর উপর চাপ দিতে চাইনে। এই অধিবেশনটা গান্ধী সেবাসঙ্ঘের ঘরোয়া ব্যাপার। আমরা যারা তার সদস্য তাদের উপর চারদিক থেকে আক্রমণ আসছে এই বলে যে আমরা নাকি আমাদের নতুন খ্রীস্টের নামে নতুন এক খ্রীস্টীয় চার্চ পত্তন করেছি। গান্ধীয়ান চার্চ। একদিন এই গান্ধীয়ান চার্চ ইণ্ডিয়ান স্টেটকে নিজের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করবে। এর যিনি পোপ হবেন তিনিই হবেন ভারতভাগ্যবিধাতা। রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করবেন তিনিই। কংগ্রেস হবে তাঁরই পরোক্ষ প্রভাবাধীন। ইউরোপের ইতিহাসে এ নিয়ে যে অনর্থ ঘটে গেছে এদেশেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আমরা এই আক্রমণের উত্তর দিতে মিলিত হচ্ছি। কিন্তু কী উত্তর দেব তা নিয়ে আমাদের মন ভারাক্রান্ত।" সৌম্যকে চিন্তান্বিত দেখায়।

"আমি তো এর একটা আভাস দিয়েছি তোমাকে," মানস মনে করিয়ে দেয়। "রাষ্ট্রের বাইরে তোমরা একটা চার্চ গঠন করছ, চার্চই হবে রাষ্ট্রের নিয়ন্তা। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কথা ভেবেই ওকথা বলেছি, সেবাসঙ্ঘের কথা ভেবে নয়। সেবাসঙ্ঘ তো একটা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।"

"যথার্থ। আরম্ভটা সেইভাবেই হয়েছিল।" সৌম্য ব্যাখ্যা করে, "কিন্তু কংগ্রেস যখন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম নিয়ে মেতে ওঠে তখন কংগ্রেসের বামপন্থী পক্ষ দক্ষিণ-পন্থী পক্ষের সঙ্গে সেবাসঙ্ঘকেও অভিন্ন মনে করে। আসলে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গেও আমাদের আসমান জমিন ফারাক। ওঁদের কাছে অহিংসা একটা পলিসি। আমাদের কাছে অহিংসা একটা প্রিন্সিপ্ল। কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তার দরজা খোলা। যে-কোনো ব্যক্তি চার আনা পয়সা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য হতে পারে। ভোটের অধিকারী হতে পারে। অধিকাংশের ভোটে কংগ্রেস একদিন পলিসি হিসাবেও অহিংসা বর্জন করতে পারে। তার মানে গান্ধীকে বিসর্জন দিতে পারে। ছলে বলে কৌশলে যে-কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করা বাম দক্ষিণ কারো পক্ষে মূলনীতিবিরুদ্ধ নয়, এর পূর্বাভাষ লক্ষ করে গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের থেকে স্বতন্ত্র একটি সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা গান্ধীজীকে বিসর্জন

দেবেন না, অহিংসা ও সত্য বর্জন করবেন না। ক্ষমতার উপরে তাঁদের লোভ নেই, সেটার উপরে অঙ্কুশ প্রয়োগ করাই তাঁদের কাম্য। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ প্রথম দিকে বেশী লোকের ব্যাপার ছিল না, কিন্তু কংগ্রেস যেদিন থেকে পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করে সেদিন থেকে এই সঙ্ঘের ভিতরেও বেনো জল প্রবেশ করে। কাউকে আমরা বহিষ্কারও করতে পারিনে, কারো উপর নিষেধাজ্ঞাও জারী করতে পারিনে। ভদ্রতার ফল হয়েছে এই যে আমরাও পার্লামেণ্টারিয়ানদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছি। লাভ তাঁদেরই হয়েছে, আমাদের হয়েছে বদনাম। পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে, কিন্তু জড় রয়ে গেছে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা গদী ছেড়েছেন, কিন্তু আইন সভার কংগ্রেস সদস্যরা আসন ছাড়েননি। ইংরেজদের সঙ্গে ফয়সালা হলে কংগ্রেস যে-কোনো দিন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রাম পুনরারম্ভ করতে পারে। তখন সেবাসঙ্ঘে আরো বেনোজল ঢুকবে। অর্থনীতিক্ষেত্রে যেমন গ্রেশামের আইন ধর্মনীতিক্ষেত্রেও তেমনি একটা অলিখিত আইন আছে। মেকী টাকাই আসল টাকাকে তাড়াবে। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন। সেবাসঙ্ঘ থেকেও নাম কাটিয়ে নেবেন। তা হলে কাকে নিয়ে আমরা থাকব? কী নিয়ে আমরা থাকব?"

মানসের সময় লাগে ব্যাপারটাকে অনুধাবন করতে। সে বলে, "তোমরা তোমাদের মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাও। অথচ স্বতন্ত্র হয়েও স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারছ না। লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তা হলে তাকে লবণত্ব দেবে কে? গান্ধীজী কি চিরায়ু? তা তোমরা বেছে বেছে সদস্য কর না কেন?"

"আমরা গঠনকর্মে বিশ্বাসী দেখলেই সদস্য করি। সাধারণত তাঁরা সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁদের কেউ যদি কংগ্রেসী মন্ত্রী বা বিধায়ক হন তাঁদের বাধা দেব কী করে? আর যাঁরা মন্ত্রী বা বিধায়ক তাঁরা যদি সেবাসঙ্ঘের সদস্য হতে চান তাঁদেরই বা ঠেকিয়ে রাখি কী বলে? যদি তাঁদের গঠনকর্মে রুচি থাকে। তাঁরা কি মদ্যপান নিবারণ করেননি? খাদির প্রসারে সাহায্য করেননি? সবাইকে নিয়ে কাজ করাই গান্ধীজীর অভীষ্ট। অথচ ভেকধারী ভণ্ড সাধুও তো বিস্তর। কংগ্রেসে বেনো জল ঢুকলে কংগ্রেস সামলে নেবে। রাজনীতি জিনিসটাই ঘোলা জল। কিন্তু সেবাসঙ্ঘ হলো সাধুজনের শাসিত মঠবাড়ীর মতন। এখানে মেজরিটির ভোট খাটে না। এখানে মঠাধ্যক্ষেরই অথরিটি। অথচ তা যদি বলবৎ হয় সঙ্ঘ ভেঙে যায়।"

যূথিকা মানসকে বলে, "তুমি যে বাপুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ সরকার এর জন্যে

জবাবদিহি তলব করতে পারে। তুমি সৌম্যদার মতো স্বাধীন নও। যেতে চাও তো মনঃস্থির করে যাও যে সরকার অসন্তুষ্ট হলে মানে মানে পদত্যাগ করবে।"

"মনঃস্থির কি আমি করিনি, জুঁই? দেশ যদি দুই শিবিরে বিভক্ত হয় আমি সৌম্যদার বিপরীত শিবিরে থাকব না। তাকে জেলে পুরব না। তবে স্বপনদা যা বলেছেন সেই কথাই শিরোধার্য। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। যুদ্ধকালে ইংরেজকে বিব্রত না করলে ইংরেজও বিরক্ত করবে না। একটা ফয়সালাও হয়ে যেতে পারে।"

"তুমি আমাকে জেলে পুরলে আমি একটুও দুঃখিত হব না, মানস। বরং না করলেই দুঃখিত হব। আমরা তো দেশের জন্যে দুর্ভোগ সইতেই চাই। না সওয়াটাই তো কাপুরুষতা। তবে মরতে এখনো মনঃস্থির করিনি।" সৌম্য হাসে।

পঁচিশ

স্টীমার থেকে নামতেই দূর থেকে আওয়াজ কানে আসে। "গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক।" "গো ব্যাক, গান্ধী।" "উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট গান্ধী।" কখনো ইংরেজীতে, কখনো বাংলায়।

"মহাত্মা এখন আর বাংলাদেশে স্বাগত নন। এখন তিনি মহাত্মাই নন।" সৌম্য আফসোস করে। "তাঁকে ওরা আসতে বারণই করেছিল, ভয়ও দেখিয়েছিল। কিন্তু না এলেও লোকে ভাবত তিনি ভীরু, তিনি দুর্বল।"

মানস আফসোস করে। "বাংলাদেশ এমনি করে আপনাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে। বাঙালীর যেমন সেণ্টিমেণ্ট আছে আবঙালীরও তেমনি সেণ্টিমেণ্ট আছে। সেবাসঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিরা কী মনে করছেন! খবরটা যখন সারা ভারতে রটে যাবে তখন বাঙালীও কি অন্যত্র স্বাগত হবে?"

সৌম্য সেবাসঙ্ঘের শিবিরের অভিমুখে এগোতে এগোতে বলে, "তবু ভালো যে ওরা গান্ধীকে ধ্বংস করতে চায় না, তাঁর মতবাদকেই ধ্বংস করতে চায়। ওরা কি বোঝে ওঁর মতবাদটা কী? আমাদের কর্তব্য ওদের বোঝানো। আমরা যারা বাপুজীর সহকর্মী ও সেবাসঙ্ঘের সেবক।"

"তোমরাও কি পারবে বোঝাতে? তোমরা কেবল 'চরকা', 'খদ্দর', 'স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম' ইত্যাদি নিয়েই আছ। এই যদি হয় গান্ধীবাদ তো এই কলকারখানার যুগে গান্ধীবাদ তো আপনা থেকেই ধ্বংস হচ্ছে।" মানস সহানুভূতির সঙ্গে বলে।

সৌম্য তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে! "দ্যাখ, মানস, পৃথিবীতে ইভিল যতদিন থাকবে তার সঙ্গে লড়াইও ততদিন চলবে। কিন্তু লড়বে যে সে নিজেই যদি হয় ইভিল আর যে হাতিয়ার নিয়ে লড়বে সেটাও যদি হয় ইভিল তা হলে পৃথিবীতে ইভিলই

জয়ী হবে। গান্ধীজী এই শিক্ষা দিতে পৃথিবীতে এসেছেন যে ইভিলের সঙ্গে লড়াই নিশ্চয়ই চলবে, কিন্তু চালাবে যারা তারা নিজেরা হবে না ইভিল আর তাদের হাতিয়ারও হবে না ইভিল। তুমি যদি নাৎসীদের সঙ্গে লড়তে চাও এই কারণে যে ওরা ইভিল তা হলে তোমাকেও হতে হবে ইভিল থেকে মুক্ত আর তোমার হাতিয়ারকেও করতে হবে ইভিল থেকে বিযুক্ত। সেটা যদি তুমি না করো তবে তোমার জয়ও ইভিলের জয়। বড় জোর দাবী করতে পারো যে তোমারটা কম ইভিল। তোমার সঙ্গে আমার এই তফাৎ যে আমারটা আদৌ ইভিল নয়।"

"কিন্তু তুমি তো নাৎসীদের সঙ্গে লড়তেই চাইছ না। ওদের পথ ছেড়ে দিচ্ছ। ওরা এবার পশ্চিমমুখো হয়ে হলাণ্ড, বেলজিয়াম ফ্রান্স আক্রমণ করবে। ফ্রান্সের ভিতরে নাকি ওদের পঞ্চম বাহিনী সক্রিয়। এটা কেবল নেশনে নেশনে যুদ্ধ নয়, মতবাদে মতবাদে যুদ্ধ। কমিউনিজম বনাম ফাসিজম। ফ্রান্সে যেমন একদল ফাসিস্ট সক্রিয় তেমনি একদল কমিউনিস্টও। ফাসিস্টরা নাৎসীদের পথ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে, কমিউনিস্টরা কোতল হবে। এমন পরিস্থিতিতেও ভারত লডাইতে নামবে না। নামবে, যদি ব্রিটেন কংগ্রেসের শর্তে রাজী হয়। যাট মণ ঘি পুডবে, তারপর রাধা নাচবে।" মানস সৌম্যকে খোঁচায়।

"কংগ্রেস নাচবে, কিন্তু গান্ধীজী নাচবেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব সময়ে নিজস্ব উপায়ে নিজস্ব প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়বেন। লডবেন তিনি ঠিকই, কিন্তু এখন নয়, বন্দুক হাতে নয়, জার্মানদের সঙ্গে নয়।" সৌম্য বুঝিয়ে বলে. "কংগ্রেস ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়ে সমান শর্তে স্বাধীন মিত্রের মতো লডতে পারে। তিনি কিন্তু নৈতিক সমর্থনের চেয়ে বেশী কিছু দেবেন না।"

"কেন?" মানস বিস্মিত হয়। "তিনি কি দেশেব স্বাধীনতার চেয়েও আরো বেশী কিছু চান?"

"না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে তাঁর দাবী ওর চেয়ে বেশী বা কম নয়। কিন্তু তিনি কি কেবল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী? তার চেয়েও বেশী কিছু নন? তিনি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অহিংসার প্রয়োগে বিশ্বাসী শান্তিবাদী। যুদ্ধ জিনিসটারই তিনি বিপক্ষে। সেটাকে ছডাতে দিতে নয়, থামিয়ে দিতেই তিনি চান। এটাই তাঁর জীবনের মিশন।" সৌম্য তার বক্তব্য পরিষ্কার করে।

মালিকান্দায় সেদিন পাঁচখানা গ্রামের হিন্দু মুসলমান সমবেত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেবাসঙ্ঘ সদস্যদেরও সুবৃহৎ সমাবেশ। মানসকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম

কক্ষে বসতে বলে গান্ধীজীকে সংবাদ পাঠায় সৌম্য। একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে দুই বন্ধুকে তাঁর পর্ণকুটীরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

"বাপুজী," সৌম্য মানসের পরিচয় দিয়ে বলে, 'মাসকয়েক আগে আমার বন্ধুর পুত্রবিয়োগ হয়। শোকে সান্ত্বনার জন্যে তিনি অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু কোথাও পান না সেই রহস্যের নিরসন যার জন্যে নচিকেতা হয়েছিলেন যমরাজের অতিথি। একালে এ জগতে আপনার চেয়ে বড়ো সত্যদ্রষ্টা কে? তাই আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।" কথাবার্তা ইংরেজীতেই হয়।

মহাত্মা অন্তরের অতলে তলিয়ে যান। তাঁর চোখে ফুটে ওঠে এক অসাধারণ দ্যুতি। চোখের তারা যেন আকাশের তারা। অনেকক্ষণ মৌন থেকে করুণাঘন কণ্ঠে বলেন, "মৃত্যুর উপরে কার হাত আছে? ইজ দেয়ার এনি হেল্‌প?"

মানস উপলব্ধি করে যে তিনিও তার সহানুভবী। বেদনায় তাঁর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। সান্ত্বনার বাণী তাঁর কণ্ঠে নেই। মনে হয় তিনি একজন স্টোইক। দুঃখশোক অকাতরে বহন করতে অভ্যস্ত। কিংবা গীতাকথিত স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখ দুঃখ দুই তাঁর কাছে সমান। যেন মূর্তিমান বুদ্ধ। মানবমহিমায় অবিচলিত।

মানস তাঁকে একমনে নিরীক্ষণ করে। তার হয়ে সৌম্যই আবার বলে, "দেশ যখন দুই বিপরীত শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ইংরেজের আর কংগ্রেসের, তখন আমার বন্ধু বিপরীত শিবিরে থেকে দমননীতির ভাগী হতে অনিচ্ছুক। তাই সরকারী চাকরি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন।"

গান্ধীজী খোঁজ করেন মানস এখন কোন্ পদে অধিষ্ঠিত। তার উত্তর শুনে শুধু তার উক্তির পুনরুক্তি করেন। নিজের মতামত ব্যক্ত করেন না।

মানসের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার এইখানেই ইতি। সে আর মহাত্মার সময় নষ্ট করতে চায় না। শুধু জানিয়ে দিতে চায় যে তারও হিংসার উপর বিশ্বাস টলেছে। "মহাত্মাজী, ব্রিটেনের কী হবে জানিনে, কিন্তু ফ্রান্স তো মনে হচ্ছে চিৎ হবে। ভায়োলেন্স কোন কাজে লাগল!"

"আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করি। ভায়োলেন্স কোন্ কাজে লাগল!" তিনি মানসের উক্তির পুনরুক্তি করেন। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখায়।

সে কুটীরে আরো একজন ছিলেন। তিনি বাপুর সহধর্মিণী কস্তুরবা। তিনি বসেছিলেন ঘরের এক কোণে। দেখতে যেন কনে বউটি। সম্পূর্ণ নির্বাক। আর বাপু বসেছিলেন দেয়ালের দিকে পিঠ করে একটি নিচু ডেস্কের সামনে মেজেতে মাদুরের উপর। সৌম্য ও মানসের মুখোমুখি।

যূথিকা মানসকে মানা করেছিল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে। তা হলেও একটা কথা তার মাথায় ঘুরছিল। পনেরো মিনিট কেন, দশ মিনিট না হতেই সৌম্যর ইঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে সবিনয়ে নম্রভাবে নিবেদন করে, "মাহত্মাজী, আমার অন্তরের প্রার্থনা আপনি আরো সাত আট বছর বেঁচে থেকে ফেডারেশনটা হাসিল করে দিয়ে যান।"

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে মৃদু হেসে হাত যোড় করেন। মানস আর সৌম্য তাঁকে ও কস্তুরবাকে প্রণাম করে কুটীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। গান্ধী দর্শন যেন গঙ্গায় অবগাহন। দেহমন পবিত্র হয়।

সৌম্য এর পরে মানসকে আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাঁদের একজন সর্দার বল্লভভাই পটেল। প্যাটেল নয়। তেল মেখে গামছা কাঁধে পদ্মাস্নানে যাচ্ছেন। খুবই নম্র ও বিনীতভাবে মানসের সঙ্গে কথা বলেন। দেখে মালুম হয় না যে আটটি প্রদেশের হর্তাকর্তা ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কেমন যেন চুপসে গেছেন। মনে হয় যেন মাটির মানুষ।

"স্ট্রিক্ট শুধু নয়, স্ট্রিক্টলি অনেস্ট।" সৌম্য আড়ালে গিয়ে বলে, "বাপুর দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু পার্লামেণ্টারি ব্যাপারে। সে ব্যাপার তো আপাতত শিকেয় তোলা। কমসে কম সাতবছরের জন্যে। এবার যে পর্ব আসছে তাতে তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত নন। সত্যাগ্রহের তো শুধু বারডোলি তালুকায় নিবদ্ধ থাকবে না। ভারতময় প্রসারিত হবে। দক্ষিণ হস্ত যিনি হবেন তাঁকে হতে হবে কট্টর অহিংসাবাদী ও নীতিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী। এর কোনোটাই দক্ষিণপন্থীরা নন। বামপন্থীরা তো ননই। বৃথাই দু'পক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

এর পরে ওরা ভোজনশালায় গিয়ে হাজার জনের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে। মানসের এপাশে একজন চাষী মুসলমান, সৌম্যর ওপাশে একজন চাষী নমশূদ্র। জাত ধর্মের বিচার নেই। পুরীর শ্রীক্ষেত্রের চাইতেও উদারতর মিলনক্ষেত্র। পরিবেশকরা কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, হরিজনও তাদের মধ্যে আছে। তেমনি পাচকদের মধ্যেও। তবে আহার্য বলতে খিচুড়ি ও ঘোঁট, সঙ্গে একটা চাটনী। সমস্তটাই নিরামিষ।

খেতে খেতে সৌম্য জিজ্ঞাসা করে, "বাপুজীকে কেমন দেখলে?"

"আর একটি ধ্যানীবুদ্ধ। দশ মিনিটের মধ্যে সাত মিনিট কি আট মিনিটই নীরব শ্রোতা। বাক্য উচ্চারণ করেছেন সবসুদ্ধ চারটি কি পাচটি। এটা কি শুধু আমাদেরই বেলা না সকলের বেলা?" মানস উত্তর দেয়।

"ক্রমেই তিনি ভিতর থেকে ভিতরে সরে যাচ্ছেন। যে যা বলে মন দিয়ে শোনেন। কিন্তু ধরাছোঁয়া দেন না। হ্যাঁ, ধ্যানীবুদ্ধ। এবার আসছে তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষা। হিংসা যখন তুঙ্গে তখন তিনি অহিংস থাকতে পারবেন কি না। দেশকে, দেশের লোককে অহিংস রাখতে পারবেন কি না। ভারতের বৈশিষ্ট্য তো এই অহিংস নীতিতেই। ভারত যদি তার বৈশিষ্ট্য হারায় তবে তাঁর জীবনের মিশন ব্যর্থ। তিনি সাত আট বছরও বাঁচবেন না মানস, দেশ যদি হিংসায় উন্মত্ত হয়। ফেডারশন এখন বিশ বাঁও জলের তলে। রাজন্যরা চান না, লীগপন্থী মুসলমানরা চান না, কংগ্রেসের বামপন্থীরা চান না, দক্ষিণপন্থীরাও যে চান তাও নয়। আমরা এখন ওসব তর্ক কন্‌স্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির উপর ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছি। যা স্থির হবে তা উপর থেকে স্থির হবে না, নিচের থেকে স্থির হবে। সর্বসাধারণের ভোটে। সর্বসাধারণ একটি শব্দই বোঝে। সে শব্দটি স্বরাজ। ফেডারেশন বললে ওদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। ওটা আপাতত ধামাচাপা থাক। ইতিমধ্যে ওরই প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান বলে আরো একটি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া থাকে। ফেডারেশন থাকলে পাকিস্তান। একটাকে ধামাচাপা দিলে অপরটাকেও ধামাচাপা দেওয়া হয়। স্বরাজ ছাড়া আমাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই। সত্যাগ্রহ ছাড়া আমাদের আর কোনো সংগ্রামপদ্ধতি নেই। গান্ধী ছাড়া আমাদের আর কোনো নেতা নেই। কিন্তু আমরাই তো সমগ্র দেশের সমূহ জনগণ নই। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হলে তারা যেখানে থাকে সেইখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করতে হবে, কাজ করতে হবে।" সৌম্য মানসকে স্টীমারে তুলে দিয়ে সভায় যায়।

বাড়ীতে ফিরতে রাত এগারোটা। যূথিকা খাবার নিয়ে বসে আছে, নিজেও খায়নি। ছেলেমেয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

"কেমন দেখলে বাপুকে ?" যূথিকা সুধায়।

"ছাই ঢাকা আগুন। আবার জ্বলে উঠবে। ওঁর ভিতর একটা শক্তির রিজার্ভ রয়েছে। সেটা কায়িক নয়, মানসিক ও আত্মিক। এটাও আরেক রকম ইস্পাত। সামনে আসছে ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের ঠোকাঠুকি। একপক্ষে ইংরেজ, অপর পক্ষে কংগ্রেস।" মানস যতদূর দেখতে পায়।

"ঠোকাঠুকির সময় তুমি কোন শিবিরে থাকবে, এ নিয়ে তোমার নৈতিক সঙ্কটের কথা বলেছিলে ?" যূথিকা জানতে চায়।

"সৌম্যদাই আমার হয়ে বলে। বাপু তা শুনে খোঁজ নেন আমি কোন্ পক্ষে

অধিষ্ঠিত। জেনে নিয়ে নীরব থাকেন। বোঝা গেল না তাঁর কী মত। চাকরি ছাড়ব কি ছাড়ব না।" মানস উত্তর দেয়।

"তার মানে তিনিও চিন্তা করছেন ঠোকাঠুকি আদৌ বাধবে কি না। ফয়সালা হয়ে যেতে পারে। দক্ষিণপন্থীরা বেঁকে বসতে পারেন। তোমাকে 'হ্যাঁ' বললেও ধরাছোঁয়া দেওয়া হতো, 'না' বললেও তাই। তাঁর সিদ্ধান্তটা তিনি হাতে রেখেছেন। সেটাও এক অর্থে রিজার্ভড।" যূথিকা এই বোঝে।

দিন পনেরো ষোল বাদে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে যাবার মুখে সৌম্য মানসের সঙ্গে আবার দেখা করে। বিষণ্ণ বদন।

"অত বিমর্ষ কেন! মুখে নাই হর্ষ কেন!" মানস সুকুমার রায়ের নাটকের ভাষায় কৌতুক করে। "তোমাকে তো কখনো এমন বিরস দেখিনি।"

"গান্ধীবাদ ধ্বংস হয়নি, গান্ধী সেবাসঙ্ঘেরই কার্যত বিলোপ ঘটেছে। বাপুর ইচ্ছায় নয় জন বাদে আর সকলের সদস্যপদ গেছে। ধরে নেওয়া হয়েছে তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। আমিও। এতদিন ধরে যেটা আমরা সবাই মিলে গড়ে তুললুম সেটা এখন থেকে শুধু অহিংসা তত্ত্ব নিয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা করবে। পরিচালনা করবেন নয় জন নৈকষ্য কুলীন। নির্বাচিত নয়, মনোনীত। গান্ধীর সব চেয়ে আস্থাভাজন। রাজনীতির নিরিখে নয়, ইডিওলজির নিরিখে। অহিংসায় যাঁদের অটল ও অগাধ প্রত্যয়। এঁরা পরে নিয়ম কানুন তৈরি করে আরো সদস্য নিতে পারবেন। এঁদের নীতিপরীক্ষায় নিকষে আমি উত্তীর্ণ হব কি না কে জানে!" কণ্ঠস্বরে বিষাদ।

"আমি যতদূর অনুমান করতে পারছি এটা একপ্রকার পার্জ। এর দ্বারা সঙ্ঘের ভিতর থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে বল্লভভাই ও তাঁর গোষ্ঠীকেও সুকৌশলে অপসরণ করা হলো। এতে গান্ধীবিরোধীদের গায়ের জ্বালা মিটবে। তাঁরা আর আওয়াজ তুলবেন না যে গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক। গান্ধীসঙ্ঘ ভাঙল, কিন্তু গান্ধীবাদ বাঁচল। তোমার তো খুশি হবারই কথা।' মানস সান্ত্বনা দেয়।

যূথিকা হেসে বলে, "যিনি সুভাষচন্দ্রকে একভাবে কংগ্রেস থেকে সরিয়েছেন তিনিই বল্লভভাইকে আরেকভাবে সেবাসঙ্ঘ থেকে সরালেন। বামপন্থীদের দাবার বিনিময়ে দক্ষিণপন্থীদের দাবা খোয়া গেল।"

"এসব কথা আমার মাথায় আসেনি," সৌম্য আশ্চর্য হয়। "বাপু যে কী ভেবে কোন্ চাল দেন তা তিনিই জানেন।"

"আমি এই ভেবে খুশি হচ্ছি যে এর পরে তাঁকে কেউ পোপ বলে অপবাদ দেবে না। আর তাঁর সঙ্ঘকে চার্চ বলে।" মানস তাঁর প্রশংসা করে।

সামনে রামগড কংগ্রেস। সেখানে কী হয় না হয় তা নিয়ে সৌম্যর মন ভারাক্রান্ত। সুভাষপন্থীরাও ঠিক সেইখানেই আপসবিরোধী সম্মেলন বসাবেন। দুই পক্ষে হাতাহাতি না বেধে যায়।

সৌম্য সেদিন তাড়াতাড়ি ওঠে। রামগড থেকে ফিরে আবার আসবে। ওর ধারণা এইবার একটা এস্‌পার কি ওস্‌পার হয়ে যাবে। ভারত ব্রিটেনকে যুদ্ধের সময় কী দেবে না দেবে। কংগ্রেস সহযোগিতা করবে না সংগ্রাম করবে। গান্ধীজী সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক হবেন কি হবেন না।

'দ্যাট ওল্‌ড ম্যান,'' শেফার্ড একদিন মানসকে বলেন, ''কংগ্রেসের পিঠ থেকে নাগবেন না। যেমন সিন্ধবাদ নাবিকের পিঠ থেকে সেই বৃদ্ধ। সব চেয়ে আফসোস হয় নেহরুর জন্যে। এরই মধ্যে তিনি উল্টো সুরে গাইতে শুরু করেছেন। সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম, নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানেই তো জার্মানীর পক্ষে সংগ্রাম। শত্রুর শত্রু মানেই তো মিত্র।''

মানস আশা করেছিল ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট হবে। তাতে জবাহরলাল তো থাকবেনই, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজগোপালাচারীও থাকবেন। কয়েকটা পদ না হয় ইংরেজদের জন্যে সংরক্ষিত, সেসব তাঁরা অভিজ্ঞ বলে। কয়েকটা অবশ্য লীগপন্থীদেরও প্রাপ্য। কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁদেরও তো ভোটবল আছে। কিন্তু ঘটনার স্রোত ক্রমে ব্রিটেনের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালে ব্রিটেন কেন্দ্রীয় সরকারে বড়োরকম রদবদল করতে নারাজ। যুদ্ধের পরেও যে ভারতকে তার কনস্টিটিউশন রচনা করার অধিকার দেবে তাও নয়। ওদিকে মুসলিম লীগও শোর তুলেছে যে নতুন কোনো কনস্টিটিউশন রচনা করলে মুসলিম 'নেশনের' জন্যে ভারতের দুই প্রান্তে দুটো হোমল্যাণ্ড বানিয়ে দিতে হবে। সেখানে তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট কি সম্ভব? ইংরেজ মন্ত্রীরা কি নেশনের অন্তর্গত? লীগ মন্ত্রীরা কি নেশনের বহির্ভূত? না ওটা তিন নেশনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক? যার একমাত্র যোগসূত্র যুদ্ধকালে ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের যোগদান। কংগ্রেসকেই তো জনসাধারণের ঠেলা সামলাতে হবে। সৈন্যসংগ্রহে বিরোধিতা, অর্থসংগ্রহে বিরোধিতা, রসদসংগ্রহে বিরোধিতা। কংগ্রেস ভেঙে চৌচির হয়ে যেতেও পারে।

শেফার্ড একদা কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন, কিন্তু এখন কংগ্রেসের উপর তাঁর আস্থা জন্মেছে। কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে যে সে দায়িত্বশীলভাবে শাসনকার্য চালাতে

পারে। বিশেষত রাজাজী আর গোবিন্দবল্লভ পন্তের উপর তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। তা বলে তিনি লীগপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ চান না। নাজিমউদ্দীনকে তাঁর বিশেষ পছন্দ। আর সিকন্দর হায়াৎ খান্ তো তাঁর মনের মানুষ। যদিও তিনি লীগপন্থী নন, ইউনিয়নিস্ট। জিন্না সাহেব তাঁর নিজের দলটিকে একমাত্র মুসলিম দল বলে দাবী করলেও শেফার্ডের কাছে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলটিও ফেলনা নয়। যুদ্ধকালে তারও গুরুত্ব আছে। মোট কথা ইংরেজ রাজনীতিকরা কংগ্রেসের খাতিরে লীগকে বেহাত করবেন না। তা হলে কি তাঁরা কংগ্রেসকে বেহাত করবেন? না, সেটাও তাঁদের মনের বাসনা নয়, কিন্তু রাগটা তাঁদের মিস্টার গ্যাণ্ডীর উপরেই। কোথায় অহিংসা! কে মানে অহিংসা! একজন কংগ্রেসীও অহিংসা মানে না। কংগ্রেস আমলে গুলীও চলেছে, দাঙ্গাও বেধেছে।

"আমাকে বিশ্বাস করুন," শেফার্ড একদিন মানসকে অন্তরালে বলেন, "আমি কংগ্রেসের বন্ধু। কিন্তু ওই 'অসহযোগ' আর 'সত্যাগ্রহ' আর সাম্রাজ্যের বাইরে 'স্বাধীনতা' আমি ভালো মনে করিনে। আমরা যে চিরকাল কর্তৃত্ব করতে চাই এটা ঠিক নয়, আমরা তো ইতিমধ্যেই প্রদেশগুলোর উপর কর্তৃত্ব শিথিল করেছি। কেন্দ্রের উপর শিথিল করার জন্যেই তো ফেডারেশন পরিকল্পনা। কিন্তু তার জন্যে চাই কংগ্রেস, লীগ, রাজন্য এই ত্রিপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিলে মিশে কাজ করার আগ্রহ। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ নয়। তার কিন্তু কোথাও কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনে। সেটা দেখবার জন্যেই আমরা থাকছি। সেটা দেখতে পেলেই চলে যাব। কিন্তু চলে যাবার সময় জেনে যাব যে ভারত কখনো ব্রিটেনের সঙ্গে শত্রুতা করবে না, ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না, ব্রিটেনের শত্রুদের ঘরে ডেকে আনবে না, ঘাঁটি দেবে না। অপর পক্ষে ব্রিটেনও ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। গৃহযুদ্ধে দেশ বিদীর্ণ হলেও আমরা ছুটে আসব না। দেশ আক্রান্ত হলে অবশ্য অন্য কথা। সেক্ষেত্রে আমাদের ছুটে আসতেই হবে, নয়তো রাশিয়া বা জাপান এদেশ গ্রাস করবে। আত্মরক্ষা করতে পারবেন ততখানি ক্ষমতা কি কংগ্রেস বা লীগ নেতাদের বা রাজরাজড়াদের আছে? স্বাধীনতার পরেও কি থাকবে? ব্রিটেনের সঙ্গে ডিফেন্স প্যাক্ট করতেই হবে। আমরা আসব আপনাদের পক্ষে লড়তে। আপনারা যাবেন আমাদের পক্ষে লড়তে। হ্যাঁ, আমাদেরও চাই গুর্খা, ডোগরা, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য। আমাদের সদর দরজার নাম বেলজিয়াম। সেখানে ওরাই দারোয়ান হবে। যুদ্ধের সময়, অন্য সময় নয়। এসব কথা এখন কংগ্রেস নেতাদের বোঝায় কে? দ্যাট ওল্ড ম্যান, মিস্টার গ্যাণ্ডী,

এঁদের মাথা খেয়েছেন।"

মানস তর্ক করে না। কথাগুলো তো অযৌক্তিক নয়। নেতারা যে বোঝেন না তাও নয়। কংগ্রেস তো সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়িয়েই রয়েছে। দিল্লী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও। গান্ধীজী যে অমন চিন্তাকুল তার মূল কারণও তো এই।

'আপনি যদি কিছু না মনে করেন," মানস বলে, "সব কিছু নির্ভর করছে আপনাদেরই উপরে। ফেডারেশন কবে হবে, আদৌ হবে কি না তার জন্যে অপেক্ষা না করে আজকের এই সঙ্কটের ক্ষণেই বড়লাটের শাসনপরিষদের রদবদল করা হোক। যাতে লোকের ধারণা জন্মায় যে ওটা তাদের নিজেদের ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। সেটা যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট হবে এমন কথা কেউ বলছেন না। তবে সেখানে বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ, জবাহরলাল নেহরুকে আসন দিতে হবে। এঁরা কেউ ছোট মাপের নেতা নন যে প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব পেলেই হাতে স্বর্গ পাবেন। ভুলটা তো হচ্ছে এইখানে যে, এঁদের উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না। তাই এঁরা গান্ধীজীর চার দিকে ঘুর ঘুর করছেন। তিনিই বা এঁদের কী দিয়ে ব্যাপৃত রাখবেন? অসহযোগ আর সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কী আছে তাঁর ভাণ্ডারে?"

"কিন্তু ওই চারজনকে শাসন পরিষদে নিতে হলে মুসলিম লীগ থেকেও দু'জনকে নিতে হয়। জিন্না আর লিয়াকৎ আলী। শিখদের একজনকেও নিতে হয়। তা হলে বাকী থাকে একটিমাত্র আসন। সেটি তো জঙ্গীলাটকে দিতেই হবে। আইনে তার নির্দেশ আছে। তা হলে আই. সি. এসদের বেবাক বাদ দিতে হয়। আহা, আমরা কেন তাতে রাজী হব? হোম ডিপার্টমেন্ট আমরা ছাড়া আর কে চালাতে পারবেন? আর মুসলিম লীগের নেতারা কি কংগ্রেস মুসলিমকে সহ্য করবেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর পেলেই বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদের রদবদলের কথা ভেবে দেখবেন।" শেফার্ড আশ্বাস দেন।

এর পর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। শেফার্ড মানসকে চাকরি ছাড়তে বারণ করেন।

রামগড় থেকে ফিরে সৌম্য আবার দেখা করতে আসে। তার মুখ উজ্জ্বল। "কংগ্রেস এখন একটি সুসম্বদ্ধ সেনা। তার সেনাপতি—একমাত্র ও একচ্ছত্র সেনাপতি—এখন বাপুজী। সবাইকে তাঁর ডিসিপ্লিন মেনে নিতে হবে। নয়তো সেনা থেকে সরে যেতে হবে। এটাও একপ্রকার পার্জ। কংগ্রেস কমিটিমাত্রেই হবে সত্যাগ্রহ কমিটি। তার কাজ হবে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি চালানো। ডাক আসবে একদিন, যদি তার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন না-ও হতে পারে। কে জানে,

ব্রিটেনের যদি মুমূর্ত্তি হয়! যুদ্ধকালে ব্রিটেনকে বিব্রত করতে আমাদের সকলেরই অনীহা। তা বলে আমাদের সংগ্রাম আমরা শিকেয় তুলে রাখতে পারিনে। সংগ্রাম বাধবেই এমন কথা বললে ভুল হবে, কিন্তু যদি বাধে তা হলে সে সংগ্রাম ততদিন চলবে যতদিন বিটেনের অন্তঃপরিবর্তন না হয়। কে জানে, হয়তো সাত আটবছর। আমি আপাতত বিশ্রামে। গঠনের কাজই আমার নিত্যকর্ম। ক্ষমতার রাজনীতি আমার জন্যে নয়। মুসলিম লীগ তো ক্ষমতা ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। কংগ্রেসও যে আর কিছু বোঝে তা নয়। তাই কংগ্রেসকে নিয়ে হয়েছে আমাদের মুশকিল। ক্ষমতা হাতে পেলে কংগ্রেস যা গড়ে তুলবে তা ওই ব্রিটিশ ধাঁচের সোনার ঠাকুর মাটির পা। শক্তিশালী কেন্দ্র, দুর্বলতম গ্রাম। বিত্তশালী শিল্পপতি শ্রেণী, দীনতম ক্ষেতমজুর শ্রেণী। যুদ্ধকালে কংগ্রেসের সহযোগিতা মানেই ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব করা। কংগ্রেসকে নিবৃত্ত করাই হচ্ছে সমস্যা। ব্রিটেন এতে সহায়তা করছে কংগ্রেসের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে। জিন্না সাহেব সহায়তা করছেন কংগ্রেস মর্যাদেব ফিরতে দেবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে। বামপন্থীরাও সহায়তা করছে আপসহীন বিরামবিহীন সংগ্রামের জন্যে রামগড়েই পালটা কনফারেন্স করে। আমরা এখন সোনার ঠাকুর হস্তান্তরের কথা ভুলে মাটির পায়ের দিকেই দৃষ্টি ফেরাব। মাটির পা'কেই পাথরের পা করতে হবে।"

মানস হেসে বলে, "আর সোনার মাথাকে কিসের মাথা করবে? সোনার অঙ্গকে কিসের অঙ্গ? বড়লাটের শাসন পরিষদ, গভর্নরদের মন্ত্রীমণ্ডল, এসব যদি পুরোপুরি কংগ্রেসের হয় কংগ্রেস কি এসব ঢেলে সাজবে? যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়? কিন্তু থাক ওসব কথা। তোমরা মৌলানা সাহেবকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করে এ কী কাণ্ড করলে? এ যে এক ঢিলে দুই পাখী মারা। জিন্না সাহেব কোনোদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন না। জিন্নার ভয়ে বড়লাটও না। তা হলে কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট হবে কী করে? শাসন পরিষদের রদবদল হবে কী করে? না, সেটা তোমাদের অভিপ্রেত নয়? তোমরা যুদ্ধকালে অসহযোগ করবেই।"

সৌম্য অবাক হয়! "না, না। আমাদের তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই। আমরা শুধু এইটুকুই বোঝাতে চাই যে কংগ্রেস মুসলমানদেরও আপনার প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেসের সংগ্রামে মুসলমানদেরও যোগ দেওয়া উচিত। ওরা যেন সংগ্রাম থেকে সরে না দাঁড়ায়। যেটা ব্রিটিশ রাজের পলিসি। তথা মুসলিম লীগেরও পলিসি। তাস খেলার টেবিলে বড়লাট ও জিন্না দু'জনে দু'জনের পার্টনার। একই পলিসি দুই পার্টনারের। দুনিয়াকে ওঁরা দেখাতে চান যে কংগ্রেসের সংগ্রামটা কেবল

হিন্দুদেরই সংগ্রাম। মুসলমানদের নয়। মৌলানা সাহেবকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করে আমরাও দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে আমাদের সংগ্রাম হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের সকলের সংগ্রাম। স্বাধীনতা সকলেরই লক্ষ্য। মৌলানা সাহেবের মতো অত বড়ো একজন মুসলিম শাস্ত্রবিদ্‌কে কাফের বলার ধৃষ্টতা কার হবে? আর কেউ না দিক সীমান্তের মুসলমানরা সাড়া দেবে ঠিক।"

কংগ্রেসের রামগড় প্রস্তাবের কালি শুকোতে না শুকোতেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। প্রস্তাবক ফজলুল হক সাহেব। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। একটি উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি উত্তর-পূর্বে। পাকিস্তান নামটি অনুল্লিখিত। তবু পাকিস্তান নামটিই প্রচারিত।

খোন্দকার জাফর হোসেনের মুখে চোখে হর্ষ। "ফেডারেশন হবে না, মল্লিক। হতো, যদি রাজন্যরা যোগ দিতে রাজী হতেন। যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও লীগের ব্যালান্স রাখতেন। তাঁরা বিমুখ না হলে লীগও বিমুখ হতো না। ব্যালান্স রক্ষার জন্যেই অত্যাবশ্যক হিন্দু নেশনের জন্যে হিন্দুস্থান আর মুসলিম নেশনের জন্যে পাকিস্তান। নইলে ইংরেজকেই চিরকাল থেকে যেতে হয়। নো পার্টিশন, নো ইণ্ডিপেনডেন্স।"

মানসের চোখে মুখে বিষাদ। "পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদেরই জয় হয়েছিল, খ্রীস্টানদের নয়। তাদের রাজত্বকে লোকে ইংরেজ রাজত্ব বলেই জানে, খ্রীস্টান রাজত্ব বলে নয়। ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হলে ভারতীয় বলেই পরিচয় দিতে হয়, হিন্দু বা মুসলমান বলে নয়। দুই শতাব্দী ধরে আমরা এই লাইনেই ভেবেছি, কাজ করেছি। ইংরেজ চলে গেলে আমরা দুই শতাব্দী পেছিয়ে যেতে পারিনে। সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। পাকিস্তান প্রস্তাব হচ্ছে মধ্যযুগে ফিরে যাবার প্রস্তাব। লীগপন্থীরা মধ্যযুগের সম্মোহনে মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু মুসলমানরা সবাই তো লীগ-পন্থী নন। কংগ্রেসপন্থী আছেন, ইউনিয়নিস্ট আছেন, কমিউনিস্ট আছেন। তাঁরা তো আধুনিক যুগেই থাকতে চান, রাজপরিবর্তনকে তাঁরা মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন মনে করেন না। পাকিস্তান হলে সেটা হবে এঁদের গোরস্থান। এঁদের অনুগামীরা কি রাজী হবেন, হোসেন?"

নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে মানস অস্থির হয়ে উঠেছিল। আপাতত চার মাসের ছুটিতে যাবে, শান্তিনিকেতনে গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করবে ছুটির পরে চাকরি ছাড়বে না রাখবে।

"সেই ভালো।" সৌম্য তা শুনে সমর্থন করে। "অত বড়ো একটা ব্যাপারে

মনঃস্থির কি পরিণাম চিন্তা না করে করা উচিত। আমরাও কি পারছি মনঃস্থির করতে? এ যাবৎ আমরা যতবার লড়েছি একটি ফ্রন্টেই লড়েছি। আবার যদি লড়তে হয় তো লড়তে হবে দুটি ফ্রন্টে। ব্রিটিশ ফ্রন্টে তথা মুসলিম লীগ ফ্রন্টে। লাহোর প্রস্তাবের তাৎপর্যই হলো দ্বিতীয় ফ্রন্টের হুমকি। আমরা যদি ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিই তবে ইংরেজ রাজত্ব থেকে গেল। তখন কোথায় স্বাধীনতা আর কোথায় পার্টিশন! যদি ভয় না পেয়ে সংগ্রামে নামি তবে শুধু রাজশক্তির সঙ্গে নয়, মুসলিম জনতার সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হবে। মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেসকে মুসলিমশূন্য করতে। বকশিস, ওদের জন্যে সেপারেট ইলেকটোরেট। এবার তার ভূমিকা কংগ্রেসের সংগ্রামকে মুসলিমবর্জিত করা। বকশিশ, ওদের জন্যে সেপারেট স্টেট বা স্টেটস। বাপু তো বলছিলেন একমাসের মধ্যেই সংগ্রামের ডাক দেবেন। এখন বলছেন তার আগে হাজারবার ভাববেন। আমরাও তাই কূলে বসে ঢেউ গুনছি। ডাক এলেই ঝাঁপ দেব।"

"তা হলে জুলির কী হবে, দাদা?" যুথিকার সেই একই ভাবনা।

"জুলি যদি আমার হয়ে থাকে তবে আমার অনুব্রতা হবে। কিন্তু ওর দাদাদের যা মতিগতি ওঁরা বোধ হয় এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ওঁদের কথায় জুলিও।" সৌম্য একটু থেমে আবেগের সঙ্গে বলে, "যুদ্ধকালে বিপ্লবীদের বিচার তো ফৌজদারী আদালতে হয় না। হয় সামরিক আদালতে। তারপরে ফাঁসী কি দ্বীপান্তর।"

"না। না। না।" যুথিকা কাতর স্বরে অনুনয় করে। তুমি ওর হাত চেপে ধরো, সৌম্যদা।"

প্রথম পর্ব শেষ